কি যেন এক অজ্ঞাতপ্রকৃতি ক্ষীণ অথচ মৃদু-উন্মাদক নবীন ভাব জাগিয়া উঠিল। মঞ্জুলার উৎফুল্ল মুখ ঈষৎ উন্মনা হইল।

চঞ্চলা বলিয়াছিল, উৎপলা পরমসুন্দরী। মঞ্জুলা দেখিল উৎপলার দুর্লভরূপ। উৎপলার দেহে বেশভূষা বা অলঙ্কারের কোন পারিপাট্য নাই, প্রায় সম্পূর্ণনিরাভরণা উৎপলার রূপ-বৈভব অতুল। সীমন্তশোভী একমাত্র সিন্দুর-বিন্দু যেন সেই অতুল রূপরাশি উদ্ভাসিত, অপূর্ব্ব লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তখন তাহার নিজদেহে মণিরত্ন অলঙ্কারের ছটা তাহার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর এবং দৈন্যৈ-শ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র বোধ হইল। মঞ্জুলার চক্ষু লজ্জায় নত হইল।

অবশেষে উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া আর এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে প্রশস্ত বৃহৎ শয্যা, শয্যার উপর এবং প্রাচীরের গায়ে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র—বেণু, বীণা, বংশী, মন্দিরা মৃদঙ্গ। দেখিয়া মঞ্জুলার চক্ষু স্মিত বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা বলিল—

"আপনার গৃহে এত যন্ত্র, গীতবাদ্যে আপনার অভ্যাস নাই ?"

উৎপলা হাসিলেন, বলিলেন

"আমার অভ্যাস! তোমার 'পরম সুহৃদ' কোন কোন দিন গান করিয়া থাকেন, এবং আমোদ করিয়া আমাকে শিখাইতে চাহেন।"

"তবে আপনিও গাহিতে পারেন ?"

"কিছু না।"

"অভ্যাস করিতেছেন ?"

"তুমিই আমার সে বিপদের মূল।"

"আমি !"

"এবার বসন্তোৎসব হইতে ফিরিয়া অবধি গীতের চর্চ্চা অধিক হইতেছে। আমাকে না শিখাইয়া ছাড়িবেন না। এই কাককণ্ঠ হইতে পঞ্চম বাহির হইবে! সে কথা থাকুক, শুনিয়াছিলাম তুমি অপূর্ব্ব রূপবতী—"

মঞ্জুলা লজ্জায় মুখ নত করিল। উৎপলা অতি আদরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আজ স্বচক্ষে দেখিলাম তোমার রূপের তুলনা নাই চক্ষু সার্থক হইল। শুনিয়াছি, গীতবাদ্যেও তোমার অসীম ক্ষমতা—"

"আপনি কাহার নিকট এত অলীক কথা শুনিয়াছেন ?"

"অতি বিশ্বস্ত লোকের মুখেই শুনিয়াছি!' —সহাস্যে—"সেই দুর্য্যোগ দিনে সাক্ষাৎ হইতে তোমার অপূর্ব্ব রূপের, আর বসন্তো-সবের দিন হইতে তোমার গীতের কথা প্রতি দিন শুনি! অমন মিষ্ট স্বর, অমন সুন্দর গীত না কি তিনি আর কখনো শুনেন নাই।"

'আপনি আমার অতি-প্রশংসা শুনিয়া-ছেন আমি তাহার উপযুক্ত নই।"

"অতি প্রশংসা-যে নয় তোমার রূপ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার গীত যে অতি মধুর হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।—একটা গান শুনাইতেই হইবে।"

মঞ্জুলা মহা বিপদে পড়িল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। উৎপলার সঙ্গে আজই প্রথম দেখা। প্রথম দিনেই গীতবাদ্য, আমোদ-প্রমোদ প্রকৃত-প্রগল্‌ভা মঞ্জুলার নিকটও চঞ্চলতা বলিয়া বোধ হইল। দেশ-কাল পাত্র-ভেদে মুখরাও মূক হইয়া পড়ে। উৎপলা

বীণাটী তুলিয়া লইয়া মঞ্জুলার হাতে দিলেন। শেষে মঞ্জুলা বলিল ;—

"আজ ক্ষমা করিবেন আমার মুখে আজ গীত আসিবে না। আরও ত কতদিন আসিব, আর একদিন শুনাইব।"

"তোমার মুখের গীত শুনিবার বড় সাধ ছিল। ভাল, শুধু একটুকু বাজাও।"

বাধ্য হইয়া মঞ্জুলা বীণা লইয়া তাহার তার চড়াইয়া নামাইয়া সুর বাধিতে লাগিল এবং দ্বারের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। বুঝিতে পারিয়া উৎপলা হাসিয়া বলিলেন,—"কোন ভয় নাই এখানে কেহ আসিবে না।

কম্পিত হস্তে মঞ্জুলা বীণাতে ঝঙ্কার দিয়া স্বর তুলিতে লাগিল। এমন সময় মাধবী আসিয়া জানাইল, প্রমীতসেন আসিতেছেন। প্রমীত কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া একটুকু সরিয়া বসিল।

প্রমীত বলিলেন ;—"আমি বাধা দিলাম! আমি যাই।"

মঞ্জুলা বলিল,—"না, আপনি যাইবেন না। বেলা গিয়াছে, আপনি অনুমতি করুন, আমি এখন বিদায় হইব।"

"এখনি যাইবে?"

"হাঁ, আপনি অনুমতি করুন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

উৎপলা বলিলেন ;—"তবে আজ আর হইল না। আর এক দিন আসিয়া গীত শুনাইবে?"

মঞ্জুলা মৃদু মৃদু বলিল,—"শুনাইব।"

প্রমীত বলিলেন ;—"আমার প্রার্থনা, সেদিন আমিও উপস্থিত থাকিব।"

মঞ্জুলার লজ্জা বিজড়িত সুন্দর মুখ স্মিত-বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা প্রমীতসেনকে নমস্কার করিয়া উৎপলাকে প্রণাম করিল।

গন্ধপুষ্প-মালাভারে বরিতা মঞ্জুলা বিদায় হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

মঞ্জুলাকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রমীত পুনরায় উৎপলার কক্ষে ফিরিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন —

"কেমন দেখিলে?—মঞ্জুলা রূপসী নয়?"

"অপূর্ব্ব রূপসী, অমন রূপবতী আমি আর দেখি নাই।"

"আমিও—" বলিতে বলিতে প্রমীত থামিয়া গেলেন।

"কি বলিতেছিলে?"

"না,—আবার কবে তাহাকে আনাইবে?"

"লজ্জায় মঞ্জুলা আজ গীত শুনাইতে পারে নাই—"

"শীঘ্রই আর একবার তাহাকে আনাইও; দেখিবে, সে কেমন সুকণ্ঠ!"

"শীঘ্রই আনাইব।—একটা কথা, মঞ্জুলা বসন্তোৎসবে প্রকাশ্যে এত লোকের সম্মুখে গীত গাহিল, আর আজ এই নিরিবিলী অন্তঃপুরে আমার কাছে গাহিতে অত লজ্জা বোধ করিল?"

"তোমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, ক্রমে লজ্জা যাইবে। মঞ্জুলা প্রায় তোমার সমবয়সী, অল্প দিনেই তোমাদের মনের মিল হইবে।"

"মঞ্জুলা আজও অবিবাহিতা কেন? অমন শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনশালিনীর বর জুটে না?"

"বর জুটে না!—অভাব কি! কতলোক ত তাহার বিবাহপ্রার্থী। বোধ হয়, মঞ্জুলার

মনোমত বেহ এতক জুটে নাই। দেবী কাক-বকী স্বয়ংমঞ্জুলার অভিভাবিকা; যে সৌভাগ্য-বান মঞ্জুলাকে লাভ করিবে সে ত রূপ গুণ ধন সম্পদ—আকাঙ্ক্ষার সমস্ত বস্তু একাধারে লাভ করিবে!"

স্মিতমুখে উৎপলা বলিলেন:—

"লোভ হয় কি?—দোখও উপকৃত হই বা শেষে বাঞ্ছিতা হয়!"

প্রমীত হাসিয়া উঠিলেন; উৎপলার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"রূপ গুণ ধন সম্পদ কি কবচ ভেদ করিতে পারে!"

প্রমীত হাসিলেন; কিন্তু সে হাসি যেন ফুল্ল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দজাত ললিত হৃষ্ট হাসি নহে, কিছু যেন উদ্বেগজড়িত, সঙ্কুচিত হাসি! মুগ্ধা উৎপলা কিন্তু উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে স্বামীদত্ত ঋণ সত্ত্ব পরিশোধ করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বেহার-চিত্র

রেলপথে

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে; জামালপুর হইতে গয়ার গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই। "পুরি—মিঠাই," "পান—বিড়ি—দেয়াসলাই," "ক্ষীরা—কাঁকড়ি—তরমুজা"—ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র সুর ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; গাড়সাহেব হরিৎ নিশান হস্তে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছেন। এমন সময় একজন বিশালদেহ মাড়োয়ারি গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মধ্য-শ্রেণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন কুলি এক বিশাল মোট এবং বাক্স লইয়া উপস্থিত হইল।

শেঠজি মোট নামাইয়া লইয়া কুলিকে দিয়া 'বেঞ্চের' উপর আপনার শয্যা রচনা করাইয়া লইলেন, তাহার পর অত্যন্ত উদার ভাবে জটিল বস্ত্রগ্রন্থি উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "লেও বক্‌সিস্।"

কুলী চীৎকার করিয়া উঠিল "ওপার হইতে এপারে মোট আনিবার সাধারণ মজুরিই এক আনা; তাহার উপর সে দুই জনের মোট—একাকী বহন করিয়া আনিয়াছে। তাহার এই মজুরি!"

উভয়ে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক লাগিয়া গেল। বহুতর্কের পরে শেঠজি হতাশ হইয়া বলিলেন যে এ সকল বড়ই "জুলুমের" কথা। একটা মোট বহিবার মজুরি এক আনা! এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোকের পক্ষে অন্য কাজ না করিয়া মজুরি করাই ত ভাল! জটিলতর গ্রন্থি বহুকষ্টে উন্মোচন করিয়া শেঠজি কাতর ভাবে আর একটি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন "লেও ভাই মিন্‌সে তুম্ খুসী হোও।"

কুলি আর তর্ক করা বৃথা বুঝিয়া অনুচ্চস্বরে শেঠজির সম্বন্ধে নানা অযথা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

কুলিকে বিদায় দিয়া শেঠজি চরণ হইতে পাদুকাযুগল উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় সাহায্যে সযত্নে তাহাদের সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। পাদুকাযুগল একে বিলাতি, তাহাতে নূতন।

যথোচিত সংস্কারান্তে দ্বারের সম্মুখে সে দু'টিকে রক্ষা করিয়া শেঠজি সগর্ব্বে একবার সহযাত্রিগণের প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়া লইলেন। একজন যাত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "ইংরেজ লোগ্ বড়া বঢ়িয়া জুতি বানাতা হায়। লেকিন দামভি বহুত লেতা হায়। ইস্ জুতিকে দাম সাঢ়ে সাত রোপেয়া লিয়া।" মুগ্ধ সহযাত্রী বলিল "ওঃ সাঢ়ে সা—ত রোপেয়া!"

শেঠজি একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া আপনার পরিপুষ্ট গুম্ফরাজিকে যত্নপূর্ব্বক সুবিন্যস্ত করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। ষ্টেশনের খালাসীরা গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময়ে কোট-প্যাণ্টপরিহিত এক বেহারবাসী দ্রুতবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।

শেঠজি "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিয়া বলিলেন "ইয়ে গাড্ডী মে জাগা নেহি হায়। দোস্‌রি গাড্ডীমে যাও।" উত্তেজিত বেহারবাসী বলিল "চোপ্‌রও শালা, তুম্‌হারা বাপ্‌কি গাড়ী হায়?"

শেঠজি তাঁহার বিশাল উদর কম্পিত করিয়া বলিলেন "খবরদার মুহ্ সামালকে বাত বোলো।" এঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বেহারবাসী সবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; শেঠজি ধাক্কা মারিয়া তাহাকে বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। ফলে বেহারীর পায়ে লাগিয়া শেঠজির সযত্নরক্ষিত একপাটি জুতা লাইনের মধ্যে পড়িয়া গেল। শেঠজি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "গার্ড সাহেব! গার্ড সাহেব! হুজুর, ষ্টেশনমাষ্টার, পুলিস্ পুলিস্—হামারা জুতি গিরা দিয়া—!"

গার্ডসাহেব নিকটেই দাঁড়াইয়া ড্রাইভারকে হরিৎ পতাকা দেখাইতেছিলেন। শেঠজির মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিয়া সম্মুখে আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন "কেয়া হুয়া? কাহে হাল্লা করতা?" চীৎকার করিয়া শেঠজি বেহারবাসীর হাত ধরিয়া বলিলেন "হুজুর, ইয়ে বদমাস্‌নে হামারা সাঢ়ে সাত রোপেয়াকা জুতি গিরা দিয়া!" বিহারী বলিল "Sir, the fellow push me. I about to be thrown on the line! the rascal!"

গার্ড শেঠজিকে বলিলেন "কাহে ধাক্কা মারা শূয়ারকে বাচ্চা?" শেঠজি করজোড়ে বলিতে চেষ্টা করিলেন "হুজুর!"—সাহেব বলিল "চোপরও।" বলিয়াই বাঁশী বাজাইয়া দিল। শেঠজি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন।

শেঠজির মোটবাহী কুলিটী সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। শেঠজি করুণ অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "এ ভাই, জারা জুতিকো তো উঠাও। নগদ চার পয়সা বথসিস্ দেঙ্গে।" কুলি বিরক্তির স্বরে বলিল "ওঃ বড়া দেনে-বালা! গাড়ী খুল রহা হায়, চার পয়সেকা ওয়াস্তে আদ্‌মি জান দেগা!'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শেঠজি মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "গাড়ী যানেকো বাদ জুতি উঠাকে রাখিও। হাম্ ঘুরকে আ'কে চার আনা বথসিস্ দেঙ্গে।" পার্শ্বের গাড়ীতে এক বাঙ্গালী যুবক বসিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল

"শেঠজি, একপাটি জুতো নিয়ে আর কি করবে? ও পাটিটাও ফেলে দাও। যে পাবে সে পায়ে দিয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবে!" শেঠজি অবোধ্য ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া "বাঙ্কের" উপর হতাশভাবে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

শেঠজি শুইয়া পড়িলে বেহারী ভদ্রলোকটী মাথার টুপি খুলিয়া বেঞ্চের উপর রাখিলেন। "নেকটাই"-শোভিত সাহেবী পোষাকের উপর তাঁহার দোদুল্যমান স্থূল শিখা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ভারতীয় ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। টুপি রাখিয়া আরামে বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া বাবুসাহেব কহিলেন, "সাত রোপেয়াকে জুতি দেখলাতা। লছ্মি চৌধুরী সাতলাখ রোপেয়া পুছ্তা নেহি তো সাত রোপেয়া! এই কিউল ব্রিজমে হামারা দেড লাথ রোপেয়া একরাত্মে ডুব গিয়া। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহা 'আপ্কো বহুৎ রোপেয়া লোক্সান হো গেয়া। হাম্ Agentকো লিখ্কে আপ্কো কুছ্ রোপেয়া Advance দেলা দেঙ্গে।' হাম কহা, 'হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া মত্ কিজিয়ে সাহেব। দো চার লাখ রোপেয়া কোন্ পুছ্তা হায়?' উস্রোজ সে সাহেব হামারা নাম রাখা 'King contractor!' সম্‌ঝিয়ে, হাবড়া সে দিল্লী তক যেতনা লাইন হায় সব হামারা এলাকা হায়। বিশ পঁচিশ লাখ রোপেয়া হামারা হামেশা লাইন পর পড়া রহতা হায়। Agentসে লে করকে ষ্টেশনমাষ্টার তক্ ভর লাইনমে এইসা কোই নেহি হায় যো লছমি চৌধুরীকে একঠো বাত উঠাবে। Company দশ বিশ হাজার লোক্সান করেগা সো কবুল। তব্‌ভি লছ্মি চৌধুরীকো বাত নেহি উঠাবেগা।" মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল "ওঃ কেয়া খাতির!" সুযোগ পাইয়া একজন সহযাত্রী বাবু ঘমণ্ডিলাল বলিলেন "হামারা নোকরনে তো একঠো বড়া ভারি গল্‌তি (ভুল) কিয়া। উস্‌কো দানে দিয়া "ইন্টর"কে "টিকস্" উয়ো বে ওকুফ্‌নে "থার্ড কিলাসকে টিকস্" লান দিয়া। ইস্‌মে কুছ্ হরজ (ক্ষতি) তো নেহি?"

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন "কোই পরোয়া নেহি। হামারা নাম লেকে আপ্ ফাষ্ট ক্লাস মে যাইয়ে তব্ ভি কোই কুছ্ নেহি কহে গা; ইণ্টর কোন পুছ্তা হায়।" ভক্তিগদ্‌গদ ঘমণ্ডিলাল চৌধুরীজিকে দীর্ঘ সেলাম করিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ধারারায় আসিয়া পৌঁছিল, তিনজন মুসলমান আরোহী—"বদ্‌না" "গড়গড়া" "পানদান" "ওগল্‌দান" "খানা" প্রভৃতি লইয়া মহাসমারোহে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হাজি সাহেব জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "তোবা, হামরা খানা কাঁহা!"

হায় হায়, কমবক্‌ত্ খানসামা হাজি সাহেবকে কি বিপদেই ফেলিয়াছে! উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ভিন্ন হাজিসাহেবের অন্য কোন স্নেহ-পদার্থ আদৌ সহ্য হয় না! তাহার উপর অপরের রন্ধন হাজি সাহেবের মোটেই রুচিকর হয় না। সেইজন্য হাজিসাহেবের বিবি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটী মোরগ মারিয়া তাহাকে চালে ঝুলাইয়া রাখেন। পরদিন সেইটীকে ছাড়াইয়া কেবল একসের ঘৃতসহযোগে রন্ধন করেন। তাহাতে বিন্দুমাত্র জল পড়িবার যো নাই; কেবল কিছু মেওয়া,

জাফ্রান্, এলাচি, আর পেঁয়াজ। এই মোরগটী, একডজন "খাস্তা" পরেটা, কিছু উৎকৃষ্ট ফল, আধসের রাবড়ি আর আধসের উৎকৃষ্ট সিরনি (মিষ্টান্ন —ইহাই হাজি সাহেবের রাত্রের নাশ্তা (জলযোগ)। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ। "কমবখ্ত" এই আসল জিনিষটাই দিতে ভুল করিয়াছে! এখন সারা-রাত্রি উপবাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। লছ্মি চৌধুরী বলিলেন যে, কিউলে উৎকৃষ্ট ফলমূল যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেখানকার "রাবড়ি" এবং "মালাই"ও উত্তম। সেইখানে, কিছু ফলমূল আর রাবড়ি খরিদ করিয়া লইলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। 'খয়ের" বলিয়া হাজিসাহেব মনকে প্রবোধ দিয়া তামাকু সাজিতে মনোনিবেশ করিলেন।

হাজি সাহেবের সহযাত্রী খাঁ সাহেব এতক্ষণ তাম্রকূট-ধূমাকর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন এতক্ষণ পরে তিনি উদাসীন ভাবে হাজি সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,"চাকর বাকরদের উপর বিশ্বাস করিলেই বিপদ্। এই দেখুন না কেন, খারাপ তামাক আমার সহ্য হয় না বলিয়া ৫০ টাকা খরচ করিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে একেবারে একমণ তামাক আনাইয়া রাখিয়াছি। তথাপি আসিবার সময় সে তামাক না দিয়া তাহাদের নিজেদের খাইবার "কড়ুয়া" তামাক একসের ইহার মধ্যে দিয়া দিয়াছে। এখন সমস্ত রাত্রিই "নেহাইৎ তক্লিফ্"। পথে ভাল তামাক পাইবার কোনই উপায় নাই।" দুঃখিতচিত্ত খাঁসাহেব মুদিতচক্ষে তাম্রকূটধূমাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্ণৌএর মূল্যবান্ তামাকের অভাবে তাঁহার যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে মুখ দেখিয়া এমন কোন লক্ষণ বুঝা গেল না।

পার্শ্বের গাড়ী হইতে সান্ধ্য বাতাস কম্পিত করিয়া মাঝে মাঝে সুর আসিতে লাগিল—

"পিছে চলত ভাই লছমন
আগে চলত রঘুবীর।"

গাড়ী কাজরা পৌঁছিবা মাত্র ১০।১২ জন স্ত্রী-পুরুষ, লাঠি, বস্তা, ঝুড়ি, কোদাল প্রভৃতি লইয়া কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। চৌধুরী সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন; "ইয়ে গাড়ী নেহি। ইয়ে ডেঢ়া মাশুলকে গাড়ী হায়। আগে যাও।" কিন্তু তাহাদের অগ্রণী ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল "ও ডেঢ়া আর আঢ়াইয়া, আরে চলরে শুক্রা।' বলিতে বলিতে হুড়মুড় করিয়া সমস্ত দলবল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

খাঁ সাহেবেরা "ওঃ! ওঃ!! আরে ই কেয়া, ই কেয়া" বলিয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। চৌধুরী সাহেব গার্ড সাহেবের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। গার্ড আসিয়া বহুকষ্টে নিশানের দণ্ড প্রয়োগে তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল।

হাজি সাহেবের যুবা সঙ্গীটী এখনো কোন কথা কহেন নাই। এক্ষণে তিনি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে মৌলভি মহম্মদ মির্জ্জা সাহেব একজন "আমীর" লোক। সেখপুরা অঞ্চলে যত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার আছেন, মৌলভি সাহেবের পরিবার তাঁহাদের মধ্যে বংশ-মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইংরাজের সঙ্গে নবাব মিরকাশিমের যুদ্ধ বাধিলে, বলিতে গেলে একরকম তাঁহার "পরদাদার" (প্রপিতামহের) সাহায্যেই

ইংরাজের জয়লাভ হয়। মিরকাশিম তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার "পরদাদা" গবর্ণর সাহেবকে একবার "জবান" (কথা) দিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া কিছুতেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইতে স্বীকৃত হন নাই। কৃতজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মৌলভি সাহেবের প্রপিতামহকে একখানি তিন হাজার টাকা মূল্যের তরবারি আর একলক্ষ টাকা আয়ের একটী "জাগীর" দান করেন।

তাঁহার পিতামহ এক ফকিরকে সেই জাগীর "ইনাম" দিয়া ফেলেন। তদবধি মৌলভি-পরিবারের কিছু অর্থকষ্ট ঘটিয়াছে।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একলক্ষ টাকা আয়ের জাগীর একেবারে ফকিরকে দান করিয়া ফেলিলেন!"

ঈষৎ হাসিয়া মৌলভি কহিলেন যে "বাল্য কালে তাঁহার পিতার একবার কঠিন পীড়া হয়। কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে যত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, সকলকে দেখাইয়াও কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না। অবশেষে এক ফকির দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ফকিরের চিকিৎসায় পিতা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হন। রোগ-মুক্তির পর ফকির তাঁহার পিতামহের নিকটে "ইনাম" চাহিতে গেলে, তিনি তাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের সমস্ত জমিদারী ফকিরকে লিখিয়া দেন! তাঁহার দুই চারিজন বন্ধু সে সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিল "একেবারে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি! ইনামটা বড় বেশী হইয়া গেল!" কিন্তু পিতামহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন "কুছ্‌ভি নেহি। প্রাণের দাম লাখ টাকার অনেক বেশী! আমি ফকিরকে কিছুই দিতে পারিলাম না!"

শুনিয়া পুলকিত চিত্তে খাঁ সাহেব ও হাজি সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন "ওঃ হোঃ হোঃ! উন্‌ হোনে বহুত ঠিক তজ্‌বিজ্‌ (বিচার) কিয়া, জান্‌ কি কিম্মত (মূল্য) হাজার লাখ!!"

পিতামহের গৌরব-কাহিনী স্মরণে উদ্বেলিত-হৃদয় মৌলভি সাহেব সহাস্যমুখে দুই খিলি পান নিজ বদন-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, "মোচে" একটু "ইত্তর" (আতর) লাগাইয়া গড়গড়ায় ঝুলাইবার জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত পুষ্প-কলিকার সাহায্যে মাল্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গাড়ী কিউলে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্লাটফর্ম্ম প্রতিধ্বনিত করিয়া "রাবড়ি-মালাই," "পুরী-মিঠাই," "পান-বিড়ি-দিয়াশালাই," "রোটি-কাবাব," "হিন্দু-চা," "কেলা-আম-কাঁকড়ি-নাশপাতি"—ইত্যাকার শব্দ নানা বিচিত্র সুরে সমুত্থিত হইতে লাগিল।

"নাশ্‌তা" (জলযোগ) বঞ্চিত হাজি সাহেব "কেলাবালা" "কেলাবালা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ফলাওয়ালা নিকটে আসিলে হাজি সাহেব বলিলেন "কুছ মেওয়া হায়?" ফলাওয়ালা আপেল, নাশপাতি, আম্র, কদলী প্রভৃতি দেখাইল। কিন্তু তাহাদের মূল্যের কথা শুনিয়া হাজিজি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একান্ত হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কাঁকড়ি কেয়া ভাউ?" ফলওয়ালা বলিল "পয়সা পয়সা।" "তব্‌ তুম্‌-হারা সওদা বেচ্‌নেকে মতলব নাহি হায়!"—

বলিয়া হাজি সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে একটী অতিক্ষুদ্র কাঁকড়ি তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সেইটী উঠাইয়া হাজি সাহেব বলিলেন "আচ্ছা ইস্‌কো কেত্তা লেওগে ?" ফলওয়ালা বিরক্ত হইয়া বলিল "এক আধেলা। আব্ লেনা হোয় তো লিজিয়ে, এত্তা দের মে হাম্ এক রোপেয়াকে সওদা বেচতেঁ।" "খয়ের"—বলিয়া হাজি সাহেব আধেলা দিয়া কাঁকড়ি গ্রহণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে ছুরিকা সাহায্যে তাহাকে ছাড়াইতে ছাড়াইতে সহযাত্রিগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "আরে ভাই জারা নাশ্‌তাই না করনা? নাশ্‌তাকে লিয়ে এহি কাফি (যথেষ্ট) হায়।" একজন হিন্দু ভদ্রলোক বলিলেন "হিঁয়াকা মালাই ভি বহুত আচ্ছা হায়।" চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাজিসাহেব কহিলেন "কুছ্ কামকা নেহি, বিল্‌কুল আটা মিলায়া হুয়া। সাদিমে কাম পড়নেসে হিঁয়াকে রাব্‌ড়ি মালাই হামেশে দুদশ মণ হামারা মকাম্‌মে যাতাই হায়!" অগত্যা নিরুপায় হাজিসাহেব কাঁকাড় খাইয়াই এক বদ্‌না জলপান করিলেন। "মেওয়া" এবং "মোরগ মোসল্লম"-ভোজী হাজি সাহেবের ভীষণ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল!

ইতিমধ্যে প্লাটফর্মে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল লক্ষপতি চৌধুরী সাহেবের সহিত টিকিট-কলেক্টারের মহা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে! টিকিট কলেক্টর বলিতেছিল "তুমি without ticket travel করিতেছ; যদি তুমি এখনি টিকিটের মূল্য ও penalty না দাও তাহা হইলে আমি তোমাকে পুলিশে hand over করিয়া দিব।" চৌধুরী বলিতেছিলেন "I am a pass-holder. I forgot to bring my pass. Your Traffic Manager and Agent know me. I report against you." টিকিট-কলেক্টর বলিল "Do what you like I won't let you go." চৌধুরী সাহেব হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। রেলওয়ে পুলিশের জমাদার আসিয়া তাঁহার ভার গ্রহণ করিল।

বাবু ঘমণ্ডিলাল তাঁহার মুরব্বির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাণে পৈতা জড়াইয়া দ্রুতপদে লোটা হস্তে গাড়ীর পাইখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোলমালে শেঠজির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। চৌধুরীর দুরবস্থা দেখিয়া পাদুকা-শোক-বিহ্বল শেঠজির মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। শেঠজি হাসিয়া বলিলেন "শালা চোট্টা। টিকট্ খরিদ্ নেকো আওকাত (ক্ষমতা) নেহি, শালা বিশ লাখ্‌কে গপ্ উড়াতা থা! হামারা সাঢ়ে সাত রোপেয়াকা জুতি নাশ্ কর দিয়া, শালা, বদমাস্!"

কাঁকড়ি-ভোজন-পরিতৃপ্ত হাজিসাহেব ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন "দো চার রোপেয়াকে ওয়াস্তে ইজ্জত বরবাদ করনা বহুত খারাব হায়।"

এক পয়সার বরফ বদনার জলে ফেলিয়া দিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন "সেরেফ্ এই ইজ্জতকে খেয়াল্‌সে মেরা ওয়ালিদ (পিতা) হামেশা গাড়ী reserve করকে travel করতেঁ থে।"

গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময়ে দুইজন "বাভন" গল্প করিতে করিতে দ্রুতবেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েরই পরিধানে জীর্ণ মলিন বস্ত্র ও মিরজাই, কেবল মস্তকে একটী শুভ্র টুপি।

উভয়ে কিছুক্ষণ উপবেশনের পর কোমর হইতে "খইনি" (দোক্তা) এবং চূণের ডিবা বাহির করিয়া "খইনি" প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। খইনি প্রস্তুত হইলে নিজ নিজ বদনে খইনি নিক্ষেপ করিয়া একজন অপরকে কহিল "রামসিং তোমার সে মোকদ্দমার কি হইল?" রামসিং কহিল "মোকদ্দমায় আমারি জিত হইয়াছে। কোন সাক্ষী সাবুদ ছিল না। শেষে একটা জাল তমসুক বাহির করিয়া মোকদ্দমাটা "দুরস্ত" করি। হাকিম তমসুক দেখিয়া আর কোন কথা শুনিল না।"

হরি সিং বলিল "তমসুক রেজিষ্টারি হইল কি করিয়া?"

রাম। আরে সেজন্য ভাবনা কি? আমার চাকরটা গিয়া বলিল "আমি ভিখন সিং, আমিই তমসুক লিখিয়া দিয়াছি।"

হরি। সনাক্ত করিল কে?

রাম। তুমিও যেমন, সনাক্তের আবার ভাবনা? এক টাকা খরচ করিলে কত মোক্তার খুসী হইয়া সনাক্ত করিয়া দেয়! আজকাল আমাদের কুটুম্বেরা উকীল হইয়াছে, এখন উকীলেরও ভাবনা নাই!

কিন্তু তোমার খুনী মোকদ্দমাটা খুব বাঁচাইয়াছ যাহোক, হরি সিং!

হরি। কি করি ভাই; কিছু খরচ হইয়া গেল। রাস্তায় "লাস্" বদ্‌লাইয়া দিলাম। কনষ্টেবলকে ঘুস দিয়া ওদের "মুর্দ্দার" (মরার) বদলে আমার চাচার লাস চালাইয়া দিলাম। সমস্ত মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

রাম। অঁ্যা! তোমার চাচা কি মারা গিয়াছেন?

হরি সিং কণ্ঠস্বর খুব নীচু করিয়া বলিল "আর ও কথা কেন বল? চাচা বুড়ো হইয়া ত একরকম "বেকার"ই হইয়াছিলেন, একটা কাজে লাগিয়া গেলেন।"

রাম। হাঁ সে কথা যথার্থ, আগে "জায়-দাদ" (সম্পত্তি), পরে "জান"। "জান" দিতে পারি, কিন্তু এক "ধূল" জমি ছাড়িতে পারি না।

গাড়ী সেখপুরা আসিয়া পৌছিল। রামসিং ও হরি সিং গল্প করিতে করিতে নামিয়া গেল। তাহাদের পরিবর্ত্তে "মেহ্‌দি"-রঞ্জিত শ্মশ্রু এবং স্থূল যষ্টি লইয়া আর একজন মুসলমান তাড়াতাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া খাঁ সাহেব তাঁহার তাম্বুল-রঞ্জিত দন্তরাজি আমূল প্রকাশিত করিয়া কহিলেন "আঃ হা! হাকিম সাহেব! আইয়ে, আইয়ে।" হাকিম সাহেব আপনার জিনিস-পত্র গুছাইয়া খাঁ সাহেবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পর খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "নবাব সাহেব— কি হালত্ (অবস্থা) কেইসা?"

হাকিম সাহেব দুঃখের সহিত বলিলেন "কুচিকিৎসায় তিনি শেষটা মারা গেলেন! আমি রোগীকে প্রায় আরাম করিয়াই আনিয়া-ছিলাম, কেবল একটু শ্বাসের জোর আর "ছাতির ধড়ধড়ি" ছিল। গয়া হইতে বাঙ্গালী ডাক্তার আসিয়াই সর্ব্বনাশ করিল! হাত ফুঁড়িয়া পিচকারি করিয়া কি দিল, আর দুই

ঘণ্টার মধ্যেই নবাবসাহেব "কজ্জা" করিলেন! আসল কথা, ইংরাজিতে "প্লেগের" কোন ঔষধই নাই। ইহার প্রকৃত ঔষধ হইতেছে মিছ্‌রির সরবৎ আর আফিং। পর্য্যায়ক্রমে মিছরির সরবৎ আর আফিমের সরবৎ ২৪ ঘণ্টা দিতে পারিলে যেমনই রোগ হউক আরাম হইবেই। আমি এমনি করিয়া "হাজারো" রোগী আরাম করিয়াছি। খাঁ সাহেব সোচ্ছ্বাসে বলিলেন "আলবৎ। দাবাই তো ইউনানী। উহার কাছে অন্য চিকিৎসা কিছুই নয়।"

এই বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে না হইতে গাড়ী ডয়রিসেলিগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিল। খাঁ সাহেব সপরিবারে বাটী যাইতেছিলেন। এইখানে তাঁহার নামিবার কথা। খাঁ সাহেব "পাল্কী" "পাল্কী" বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাল্কীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। খাঁ সাহেব একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"আবরু" রক্ষা করিয়া কিরূপে বিবিসাহেবাকে গাড়ী হইতে নামান যায়, ইহা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি দুইজন কুলিকে ডাকিয়া খাঁ সাহেব যবনিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট একখানির অধিক চাদর ছিল না। বিপন্ন খাঁ সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন "চাদর" "চাদর"! সকলেই আগ্রহাতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন "হাঁ হাঁ, জরুর, জরুর!" কিন্তু কাহারও নিকট "তোয়ালিয়া" ভিন্ন আর কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না!

এই সময়ে ক্ষুণ্ণচিত্ত শেঠজি একখানি স্থূল চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া মুতের দর মণকরা কত করিয়া চড়াইয়া দিলে সাড়েসাত টাকা জুতার মূল্য উঠিয়া যাইতে পারে, মুদিত চক্ষে সম্ভবতঃ এই কঠিন সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। নিরুপায় খাঁ সাহেব তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া সবেগে শেঠজির গাত্রবস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া পত্নীর "আবরু" রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। চৈতন্যপ্রাপ্ত শেঠজি সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিয়া প্লাটফর্ম্মে পড়িলেন। খাঁ সাহেব ছুটিয়া গিয়া কুলির হস্তে চাদর দিয়া বলিলেন "জল্‌দি করো। চাদর পাক্‌ড়ো।" কিন্তু কুলি চাদর ধরিবার পূর্ব্বেই শেঠজি ব্যাঘ্রবিক্রমে খাঁ সাহেবের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "শালা চোট্টা! চাদর লেকে ভাগ্‌তা?" শেঠজির বিশাল উদরের গুরুভারে খাঁ সাহেব মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইলেন। বিপন্ন খাঁ সাহেব করুণস্বরে বলিলেন "আরে ছোড়ে ছোড়ে, গাড়ী খুলেগী।" শেঠজি গর্জ্জিয়া উঠিলেন? "কেয়া? ছোড়েগা শালা চোট্টা? তুমকো পলিশমে দেউঙ্গা।" খাঁ সাহেব শেঠজির বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই শেঠজির "জগদ্দল" দেহ-ভার হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না।

হাজি সাহেব এবং হাকিম সাহেব উভয়েই গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "ওঃ ওঃ কেয়া বদ্‌বখ্‌ত!" কিন্তু কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণে শেঠজির চৈতন্য হইল। তিনি খাঁ সাহেবকে ছাড়িয়া চাদর লইয়া দ্রুতবেগে চলিষ্ণু গাড়ীর

পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিবামাত্র ষ্টেশন-মাষ্টার চীৎকার করিয়া উঠিলেন "হাঁ, হাঁ, খবরদার চল্‌তি গাড়ী মে মত্‌ চঢ়ো!" ষ্টেশনমাষ্টারের ইঙ্গিতে একজন কুলি শেঠজির কোমর ধরিয়া সজোরে ঝুলিয়া পড়িল। শেঠজি সশব্দে প্লাট ফর্ম্মের উপর পড়িয়া গেলেন। খাঁ সাহেব বিশুদ্ধ পারস্য ভাষায় আপনার দুরদৃষ্ট, "কাহার' গণের নির্বুদ্ধিতা, এবং শেঠজির "সয়তানি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে টেলিগ্রাম করিবার জন্য ক্ষুণ্ণমনে "তার ঘরে" প্রবেশ করিলেন।

হাকিম সাহেব ও হাজি সাহেব নিজ নিজ আসনে পুনরাসীন হইয়া উভয়েই দুঃখের সহিত বলিলেন যে গাড়ীতে ভদ্রমহিলার "আবরু" রক্ষা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। মৌলভি মহম্মদ মির্জ্জা সাহেব কহিলেন "ইহার একমাত্র উপায় আছে। আমার "ওয়ালিদ্‌" (পিতা) বরাবর সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এবং আমিও এ বিষয়ে সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হইলে আমরা একখানি ক'রয়া খোলা কয়লার গাড়ী (coal truck) আনাইয়া লই। তাহারই উপর বেহারারা "ঘেরা টোপ" দেওয়া পাল্কী সমেত স্ত্রীলোকদের উঠাইয়া দেয়। যেখানে নামাইবার প্রয়োজন হয়, সেখানে পাল্কীসমেত নামাইয়া লয়। ইহাতে ২০০।১০০ খরচ হয় বটে, কিন্তু এরূপ না করিলে কিছুতেই ইজ্জত থাকে না।"

মির্জ্জা সাহেবের অদ্ভুত আবিষ্কার-কাহিনী শ্রবণে মুগ্ধ হাকিম ও হাজি সাহেব কহিলেন "বাহবা! ইয়ে আপ্‌নে বহুত্‌ হি উম্‌দা তরিকা (কৌশল) নিকালা। সাবাস।"

মির্জ্জা সাহেব বলিলেন আমাদের "খান্‌-দানে" (পরিবারে) ইজ্জতের খেয়ালটা বরা-বরই খুব বেশী। একবার আমার "চাচী" প্রসবকালে কিছুতেই প্রসব হইতে পারেন না। প্রতিবেশীরা সকলেই আসিয়া ধরিল একবার ডাক্তার সাহেবকে আনান হউক, নহিলে জীবন-সঙ্কট। কিন্তু আমার চাচা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "জান্‌সে ভি ইজ্জত বড়া; জান যায় সো কবুল, কিন্তু আমি "বে-ইজ্জতি" হইতে দিব না! চাচী মারা গেলেন, তথাপি চাচা নিজের ইজ্জত নষ্ট হইতে দিলেন না।

দীর্ঘশ্মশ্রু অঙ্গুলিসাহায্যে আলোড়িত করিয়া হাজি সাহেব বলিলেন "আলবৎ। ইজ্জতকে খেয়াল এইসাই হোনা চাহিয়ে।"

গাড়ী নওয়াদা পৌছিল। টেলিগ্রাম পাইয়া টিকিট কলেক্টর আসিয়া শেঠজির মোট এবং খাঁ সাহেবের রোদনরতা বিবি সাহেবাকে নামাইয়া লইল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় স্তব

(১)

মণ্টফারমিল, ফ্রান্সের একটি গণ্ডগ্রাম। সহর হইতে অনেকটা দূর, তবে ডাকগাড়ীর পথে বলিয়া কতকটা সহর-ঘেঁসা; একটিমাত্র সরাই; যাত্রীরা সেইখানেই আসিয়া উঠিত। থেনেডিয়ার-পরিবার তাহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং একাধারে পাচক, ভৃত্য এবং পরিবেশক। অনর্থক ব্যয়বাহুল্য বলিয়া তাহারা পরিচারক বা পরিচারিকা রাখিত না; সরাইয়ের আয় হইতে কষ্টে-সৃষ্টে একরূপে তাহাদের কাটিত।

সে দিন প্রাতঃকালে, থেনেডিয়ারের স্ত্রী, সদর দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া, রাস্তার অপরপার্শ্বে ক্রীড়ারতা তাহার কন্যাদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিয়াছিল। কন্যা দুইটিই শিশু, একটির বয়স আড়াই, অপরটির বয়স দেড় বৎসর মাত্র; দু'জনে একটা ভাঙ্গা গাড়ীর শিকলের দোলনা করিয়া খুব দোল খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। সে নিষ্কলঙ্ক সরল মুখ দুইটি আনন্দে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বাতাসে তাহাদের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল; পার্শ্বস্থ উদ্যান হইতে বেলিমল্লিকার গন্ধটুকু যেন তাহাদের গাত্রসৌরভ লইয়াই ভাসিয়া আসিতেছিল। সতর্ক এবং স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া জননী গাহিতেছিল—

এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে মধুর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"বেশ সুন্দর মেয়ে দুটি ত' আপনার!"

প্রশ্নকর্ত্রী এক যুবতী; তাহার কোলে শিশু কন্যা, দক্ষিণ হস্তে একটা ভারি ব্যাগ।

অপূর্ব্ব শ্রী সে শিশুকন্যার! বিধাতা যেন আপন ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়িয়া, তুলিকা দিয়া তাহার আঁখিপক্ষ্ম এবং যুগ্ম ভ্রূ চিত্রিত করিয়াছিলেন। রাজকন্যার ন্যায় তাহার আভরণ ও বেশভূষা। জননীর স্নেহশীতল বক্ষে বালিকা ঘুমাইতেছিল। জননীর কিন্তু বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না; দীনদরিদ্রার ন্যায় তাহার আকৃতি, অঙ্গুলিগুলি সূচিবিদ্ধ,—তাহাকে যে খাটিয়া খাইতে হয় তাহাতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল তথাপি লুকাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার মুক্তাধবল দন্তপাতি অশ্রুসজল চক্ষু, অযত্নরক্ষিত আজানুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, এবং মুখের সে বিষণ্ণ মাধুরীতে তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। জননী ক্রোড়স্থ শিশুর

প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন,— সে দৃষ্টি কেমন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, স্তন্যদাননিরতা জননী ধাত্রীকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন।

কে সে জননী?—সে ফ্যান্‌টাইন।

এইখানে আমরা একটা পূর্ব্বকথা বলিব। কে এ ফ্যানটাইন?

ফ্যান্‌টাইন দরিদ্র শ্রমজীবিকন্যা। যৌবনের প্রারম্ভে প্রতারকের কুহকে ভুলিয়া সে আজন্মের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসে।—থলোমিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াই সরলাকে ভুলাইয়া আনে। কিন্তু, একদিন, দু' দিন, সপ্তাহ, মাস, করিয়া ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর কাটিল, তবু থলোমিয়ে তাহার সে প্রতিজ্ঞা পালন করিল না। নানা ছলে, নানা কৌশলে সে সে কথা চাপা দিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সহসা সে যখন অন্তর্দ্ধান করিল, তখন বালিকা সত্যই অকূল পাথারে পড়িল। হায়, সে যে থলোমিয়েকে তাহার সর্ব্বস্বই দিয়াছিল,—পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া সে ত কিছুরই বিচার করে নাই,—বিবাহিতা স্ত্রীর মতই সে যে আপনাকে উৎসর্গিতা করিয়াছিল। বালিকা চারিদিক্ শূন্য দেখিল,—সে তখন অন্তর্বত্নী!

তাহার নিজের অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, একে একে বিক্রয় করিয়া সে কয়েক মাস চালাইল। তারপর, অনেক অনুসন্ধানে থলোমিয়ের ঠিকানা জানিয়া, একদিন এক সাধারণ মুহুরীকে দিয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিল-- নিজে সে লেখাপড়া জানিত না। থলোমিয়ে তখন 'মথুরার বাস্তা'; 'ব্রজের কথা' আর তখন তার মনে থাকিবে কেন? তাই সে ফ্যান-টাইনের পত্রের কোন উত্তর দিল না। ফ্যান-টাইন তার পর উপর্য্যুপরি আরও দুইখানি পত্র লেখাইল,—তাহাতেও কোন ফল হইল না। তার নিজের প্রতি না থাকুক, তাঁর আপন সন্তান নিষ্কলঙ্ক স্বর্গের ছবি তার প্রতিও তাঁর দয়া নাই?—অভাগিনীর শূন্য দেউলের ক্ষীণ দীপশিখা ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখী হইতে লাগিল।—স্বেচ্ছায় সে ইহজীবনের সব সুখ নষ্ট করিয়াছে, ক্ষণিক সুখের মন্থনে যে হলাহল উঠিয়াছে আজীবন সে বিষ তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে বালিকা তাহা বুঝিল। তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ হইলে তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না; যাহার সে অনুপম রূপসম্পত্তি, তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব কি? কিন্তু আমরা জানি তাহার প্রকৃতি অন্য ধাতুতে গঠিত ছিল; সংসারানভিজ্ঞা বালিকা একবার মাত্র পদস্খলিতা হইলেও, রমণীসুলভ সঙ্কোচ এবং পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্টা হইবার সে প্রবৃত্তি তখনও তাহার হয় নাই।

ভালবাসা জীবনের ভ্রান্তি; হয় হউক, কিন্তু ফ্যানটাইনের সারল্যের ছবিখানি সে ভ্রান্তির সলিলের উপর ভাসিতেছিল—এ কথা আমরা শতবার বলিব। যে দেবতার চরণে সে তাহার যৌবনের প্রথম আবেগ, জীবনের প্রথম প্রণয়, অন্তরের প্রথম অর্ঘ্য উৎসর্গিত করিয়াছিল,—প্রতারিতা হইয়াও, কার্য্যে বা চিন্তায় তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতে সে চাহে নাই; তাঁহার প্রসাদী ফুল অন্য কোন দেবতার চরণে অর্পণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রথম যৌবনে সর্ব্বপ্রথম যে মূর্ত্তিকে স্ত্রীলোকে একবার বরণ করিয়া লয়, যাহার

মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সে একবার আত্মবিসর্জ্জন করে, সে দেবতার আসন তাহার হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিতই থাকে ; উপেক্ষায়, বিচ্ছেদে, ঘটনা-চক্রের ঘাতপ্রতিঘাতে, সে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, প্রথম প্রেমের স্মৃতি, দুঃখে মধুর আশায় উজ্জ্বল হইয়া, চিরদিন তাহার জীবনে এক অনুপম মাধুরী সৃজন করিয়া রাখে। 'দুঃখের বেশে আসিলে'ও চিরদিবসের সে রাজার জন্য চিরদিন তাহার হৃদয় উন্মুখী হইয়া থাকে।—ফ্যানটাইন তখনও পর্য্যন্ত সেই একনিষ্ঠা সাধিকা ছিল। তাই সংসারের নির্ম্মায়িকতায় এবং ঘটনাচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও তখনো সে তলাইয়া যায় নাই। কিন্তু অর্থহীনা নিঃসহায়া তাহার অবস্থা প্রতিদিনই শোচনীয়তর হইয়া উঠিতে-ছিল ; তাহা বুঝিয়াই, 'শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়' ভাবিয়াই, প্রাণপণে আপনাকে প্রলোভনের হাত হইতে সে দূরে দূরে রাখিতে লাগিল। অবশেষে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করাই সে স্থির করিল। বহুদিন হইতে তাহারা প্রবাসী হইলেও, সেখানে কেহ না কেহ তাহাকে চিনিয়া দয়া করিতে পারে, কাজকর্ম্মেরও তাহার সুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহার কোলের শিশু ? তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যে অসম্ভব ; তার অস্তিত্বের কথা তাহাকে গোপন করিতে হইবে। ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠিলেও, সে অধৈর্য্য তাহাকে দমন করিতেই হইবে। কিন্তু কোথায় সে তাকে রাখিয়া যায় ? সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে অগ্রসর হইতে-ছিল, এমন সময় অকস্মাৎ থেনেডিয়ারের কন্যা দুইটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল ; তাহাদের সে শিশুসুলভ আনন্দোচ্ছ্বাস, অকলঙ্ক সরল মুখচ্ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করিল। তারা যেন দেবদূতের ন্যায় তাহাকে বলিতেছিল—"এই স্বর্গ, এইখানে আয়।" অভাগিনী মুগ্ধা হইল, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থেনেডিয়ার-পত্নীর কাছে যাইয়া তাই সে মৃদুস্বরে বলিল—"সুন্দর মেয়ে দু'টি ত আপনার !"

অতি হিংস্র পশুও অপরকে তাহার সন্তানদের আদর করিতে দেখিলে, শান্ত হইয়া আসে ; থেনেডিয়ার-পত্নী ত দূরের কথা। তাই মুখ তুলিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, আগন্তুকাকে সে বসিতে বলিল। পরিচয়ে বলিল—"আমি থেনেডিয়ারের স্ত্রী, এটা আমাদেরই সরাই।" তারপর গুণ্ গুণ্ করিয়া পুনরায় গাহিতে লাগিল ;—

থেনেডিয়ার—অন্ততঃ সে নিজে এইরূপ প্রচার করিত—বহুপূর্ব্বে সৈন্যদলভুক্ত ছিল ; এবং বিখ্যাত ওয়াটর্লু যুদ্ধের সময় সে না কি কোন এক আহত সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করে। সেই ঘটনার উপলক্ষ্য করিয়াই সে "ওয়াটার্লুর সার্জ্জেণ্ট" বলিয়া তাহার সরাইখানার নামকরণ করিয়া-ছিল। তার পত্নীও সৈনিকের যোগ্যা স্ত্রী, তাহার পাটল কেশ, তাম্রাভ গাত্রবর্ণ, এবং অসম কর্কশ দেহযষ্টি দেখিয়া সকলেই বলিত—"যোগ্যং যোগ্যেন যুক্তং।" তবে স্ত্রীর জীবনে একটু বৈচিত্র্য ছিল,—বটতলার এবং বাজে নাটক নভেল পড়িয়া কতকটা নায়িকাসুলভ নভেলী ভাব তাহার মধ্যে কঠোরে কোমলে মিশিয়া ছিল। তত্রাচ, সে বসিয়া ছিল তাই, নতুবা তাহার পূর্ণ অবয়ব এবং সম্পূর্ণ মুখখানা

দেখিলে ফ্যানটাইন হয় ত সন্ত্রস্তা এবং সন্দিগ্ধা হইত; কি করিত বলা যায় না, হয় ত কন্যাকে সেথানে রাখিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিত।—কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ অন্যরূপ। এমনি সামান্য সূত্রের উপর কত সময় মানবের অদৃষ্ট দুলিতে থাকে।

আগন্তুকা আপন জীবন-বৃত্তান্ত, সময়োপযোগী কতক পরিবর্ত্তিত করিয়া, বর্ণনা করিল। বলিল "তাহার স্বামী প্যারীতে দিনমজুরের কাজ করিতেন, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় অনাথ শিশুকন্যাকে লইয়া সে কাজের সন্ধানে অন্যত্র যাইতেছে, দরিদ্রা সে তাই সে প্রায় সব পথটা হাঁটিয়াই আসিয়াছে, মেয়েকেও কতক হাঁটাইয়াছে,—তাই তার চাঁদের কণা ক্লান্ত হইয়া তার বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ইত্যাদি" বলিয়া কন্যাকে দৃঢ়তরালিঙ্গনবদ্ধা করিয়া সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন করিল।

সে স্পর্শে শিশু জাগিয়া উঠিয়া, আয়ত সুনীল নেত্রে জননীর প্রতি চাহিল।—কি দেখিল?—কিছুই নয়; অথচ সবই যেন সে দেখিল। তারা যে দেব-দূত তা বুঝি শিশুরা বোঝে, আমরা যে দুর্ব্বল মানব তাও বুঝি তারা জানে; তাই আমাদের সন্দিগ্ধ পুণ্যের পার্শ্বে তাদের উজ্জ্বল পবিত্রতার ছবি এমন সারল্যে কোমল, গাম্ভীর্য্যে মধুর!

কন্যাকে ফ্যানটাইন ধরিয়া রাখিতে পারিল না; ক্রোড় হইতে স্খলিতা হইয়া ক্রীড়ারতা বালিকা দুইটির প্রতি সে ছুটিল। থেনেডিয়ার-পত্নী তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে বলিল,—"বেশ হয়েছে। তিনটিতে খেলা কর।"

সে বয়সে ভাব হইতে বিলম্ব হয় না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিন জনে পূর্ণ উৎসাহে 'গর্ত্ত কাটাকাটি খেলা' খেলিতে আরম্ভ করিল। নবাগতার উৎসাহই খুব বেশী; শিশুর আনন্দোচ্ছ্বাসে জননীর অন্তর-ছবিখানি প্রতিফলিত হয়, এ কথা খুবই সত্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে থেনেডিয়ার-পত্নী প্রশ্ন করিল—"তোমার মেয়ের নাম কি বাছা?"

"কসেট্।"

"ক' বছরের হল?"

"এই তিন চল্‌ছে।"

"তা হ'লে ত আমার বড়টির বয়েসী।"

শিশু তিনটি তখন বিস্ময়চকিত ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তার বিশেষ কারণও ছিল। একটা বৃহৎ কীট মাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তা দেখিয়া তাহাদের কত ভয়, অথচ কি আনন্দ! তাহাদের ক্ষুদ্র ললাট তিনটি পরস্পর সংলগ্ন, তিনটি ক্ষুদ্র মস্তকের উপর একটি দিব্যালোকসম্পাত!

"ছেলেরা কেমন এক দণ্ডে ভাব করে নেয় দেখেছ? তিনটিই যেন এক মায়ের পেটের!"

ফ্যানটাইন বুঝি এতক্ষণে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। থেনেডিয়ার-স্ত্রীর হাত দু'টি ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আমার মেয়েটিকে, আপনার কাছে রাখ্‌বেন?"

প্রবীণা বিস্ময়ে নবীনার প্রতি চাহিল। সে চাহনিতে 'হাঁ' কি 'না' কিছুই বুঝা গেল না। ফ্যানটাইন পুনরায় বলিল—"মেয়েকে নিয়ে ত আর আমি সেথানে যেতে পারি নে। সঙ্গে নেজুড় থাক্‌লে কোথাও কাজ পাব না। তাই ভগবানই বুঝি দয়া করে আমাকে এ দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার মেয়ে

দু'টিকে যখন দেখ্‌লাম, তখন মনে হল,—এদের মা নিশ্চয়ই খুব ভাল, আর কসেটও এদের সঙ্গে হেসে খেলে আপনার বোনের মত বেশ সুখে থাক্‌বে —ক' দিনই ত। তার পর আবার আমি এসে নিয়ে যাবো। কসেটকে আপনি রাখ্‌বেন ?"

"তাই ত, আচ্ছা ভেবে দেখি।"

"আমি মাসে মাসে তার খরচ বলে ছ' ফ্রাঙ্ক করে দেবো।"

এমন সময় বাটীর অভ্যন্তর হইতে পুরুষ-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—

"সাত ফ্রাঙ্কের কমে হবে না—আর, ছ' মাসের টাকা আগাম চাই।"

প্রবীণা বলিল—"ছ' মাসের হিসাবে তা হলে ত ৪২ ফ্রাঙ্ক হয়।"

নবীনা।—"বেশ, তা দিচ্ছি।"

পুনরায় নেপথ্য হইতে থেনেডিয়ার বলিল —"আর, প্রথম প্রথম বার্‌তি খরচের জন্য তা ছাড়া ১৫ ফ্রাঙ্ক বেশী চাই—।"

প্রবীণা।—৪২ আর ১৫,—সবশুদ্ধ তা হলে ৫৭ হয়।

নবীনা।—"তাও দেবো আমার কাছে এখন ৮০ ফ্রাঙ্ক আছে ; তা থেকে ৫৭ গেলেও যা থাক্‌বে তাতে এখন কিছুদিন আমার চলে যাবে। না হয় হাঁটাপথেই যাবো, তাতে খরচেরও কিছু সাশ্রয় হবে। তার পর, কাজ কর্ম্ম জুট্‌লে, হাতে কিছু টাকা করে, ফিরে এসে আমার সোণাকে নিয়ে যাবো।"

নেপথ্য হইতে—"মেয়ের জামা কাপড় আছে ত ?" এইবার প্রবীণা মৃদুস্বরে নবীনাকে জানাইল—"উনি আমার স্বামী।"

নবীনা।—আমি তা বুঝেছিলাম। জামা কাপড় আছে বই কি, যথেষ্টই আছে ; ভাল ভাল রেশমী পোষাক,—সব একডজন করে আছে। আমার হাতের এ কার্পেটের ব্যাগটা ওরই জিনিষপত্রে ভরা।

পুনরায় নেপথ্য হইতে —"সে গুলা সব রেখে যাবে ত ?"

"নইলে কোথায় নিয়ে যাবো—এত পোষাক থাকতে কি মেয়ে আমার ন্যাংটো হয়ে থাক্‌বে ?"

এতক্ষণে থেনাডিয়ার বাহিরে আসিল। বলিল "তা হলে আর আমাদের আপত্তি নেই।"

সেইভাবেই বন্দোবস্ত হইল ফ্যানটাইন, রাত্রিটা সেই সরাইখানাতে থাকিয়া, প্রাতঃ-কালে, থেনেডিয়ারদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া, কন্যাকে সেখানে রাখিয়া রওনা হইল। খুব শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে আপনার কাছে লইয়া যাইবে, তাহার মনে তখন সেই আশা। তত্রাচ সহজভাবে কন্যার কাছে বিদায় লইলেও এক একবার সে দারুণ নিরাশাভারে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

ফ্যানটাইন চলিয়া গেলে, থেনেডিয়ার তাহার স্ত্রীকে বলিল—"আঃ, বাচা গেল। সেই ১১০ ফ্রাঙ্কের দেনাটা কাল শোধ দেবার দিন, গোটা ৫০ ফ্রাঙ্ক কম পড়্‌ছিল—কি করব্‌ তাই আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিলাম ; হয় ত কাল সকালে দোকানে 'সিলই' বা পড়ত! ভাগ্যি তুমি তোমার বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে এমন ইঁদুর-কল পেতে ছিলে!"

"হাঁ,—তবে অজান্তিতে, এই যা!" বলিয়া প্রবীণা মৃদু হাস্য করিল।

কলে ইন্দুর ধরা পড়িয়াছিল।—সে ইন্দুর-শিশু কসেট। শিকার ক্ষুদ্র হউক, তাহা

দেখিয়াই মাজ্জাবী সানন্দে লাঙ্গুলাস্ফালন করিতেছিল।

কাহারা এই থেনেডিয়ার-পরিবার? বংশ হিসাবে ধরিতে গেলে, তাহাদিগকে মিশ্র বংশজ বলিতে হয়। নিম্নতম বংশ হইতে ক্রমোন্নত সম্প্রদায়, এবং অবস্থাবিপর্যায়ে অধঃপতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—উভয়ের মিশ্রণে যে শ্রেণী উৎপন্ন হয়, থেনেডিয়ারেরা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে, থেনেডিয়ারদের রীতিনীতি সেইরূপ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজাত ভদ্রতা বা শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের চিত্তের উদারতা কিছুই তাহারা পায় নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অতি সঙ্কীর্ণ মনা ছিল; সামান্য কারণেই তাহারা পিশাচসদৃশ হইয়া উঠিত,—তাহাদের অননুষ্ঠেয় কোন পাপ-কার্য্যই ছিল না। এমন মানব অনেক আছে যাহারা প্রতিদিনই 'আপনা রচিত জালে আপনি জড়িত' হইয়া, জীবনে ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া থাকে;—পশ্চাদ্দিকেই তাহাদের জীবনের গতি, পুরোভাগে নহে, তাহাদের জীবন চিররহস্যাচ্ছন্ন, সর্ব্বদাই যেন কি এক আশঙ্কায় তাহারা সন্ত্রস্ত; তাহাদের পাপপূর্ণ-চরিত্রের ছায়া সর্ব্বদাই তাহাদের মুখে ঘনীভূত হইয়া থাকে, সামান্য দু'একটি কথায়, মুখ ভাবে, তাহাদের অতীতের গুপ্ত পাপকাহিনী এবং ভবিষ্যতের অন্ধকারময় ঘটনার ইঙ্গিত যেন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। থেনেডিয়ার ও তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে এ কথা খুবই খাটে।

পাপ যতই আপাতঃ বলবান্ হউক্ না কেন, সকল সময় তাহা হইতে সম্পদ্ আসে না; থেনেডিয়ারদের ব্যবসায়ই তাহার প্রমাণ—কোনও রূপে তাহাদের চলিতেছিল মাত্র। দেনার দায়ে সরাইখানা প্রায়ই বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। ফ্যানটাইনের প্রদত্ত ৫৭ ফ্রাঙ্ক এ যাত্রা তাহাদিগকে উত্তমর্ণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু পরমাসে পুনরায় সেইরূপ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল, তখন থেনেডিয়ারের স্ত্রী কসেটের মূল্যবান্ পরিচ্ছদাদি প্যারীতে লইয়া যাইয়া ৬০ ফ্রাঙ্কে বন্ধক দিয়া আসিল। সে অর্থও যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন হইতে তাহারা কসেটের সহিত অনুগ্রহজীবীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। মূল্যবান্ পোষাকের যাহার অভাব ছিল না, থেনেডিয়ার-কন্যাদের পরিত্যক্ত—অর্থাৎ শত-ছিন্ন, অব্যবহার্য্য—বস্ত্রাদিতে তাহার দেহতাপ রক্ষা হইতে লাগিল; তাহাদের উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনে কোনোরূপে তাহার উদরপূর্ত্তি ঘটিতে লাগিল। অথচ এদিকে ফ্যানটাইন, প্রতিমাসেই পত্রোত্তরে জানিতে লাগিল—"কসেট্ ভাল আছে, বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতেই আছে।"—নির্দ্দিষ্ট ছয়মাস অতীত হইয়া গেলে, ফ্যানটাইন চুক্তিমত, তাহার মাসিক দেয় ৭ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিল। উত্তরে থেনেডিয়ার লিখিল—"৭ ফ্রাঙ্কে কি হবে? এখন থেকে ১২ ফ্রাঙ্ক করে চাই।" পরমাসে ফ্যানটাইন ১২ ফ্রাঙ্কই পাঠাইল;—মেয়ে ভাল আছে,—কাজেই সে কোন আপত্তি করিল না।

লোকচরিত্র চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়। অনেক চরিত্রে ভালবাসা এবং হিংসা পাশাপাশি গ্রথিত থাকে। থেনেডিয়ারের স্ত্রী আপন কন্যা দু'টিকে যে পরিমাণ ভালবাসিত, কসেটের প্রতি তার

সেই পরিমাণ ঘৃণা ছিল। অবশ্য সেটা সঙ্কীর্ণ-মনের লক্ষণ; জননীর ভালবাসা এতটা সঙ্কীর্ণ হওয়া পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমরা কি করিব? আমরা যেমনটি দেখিয়াছি তেমনই লিখিতেছি;—তবে সংসারে এমন জননীও অনেক থাকে। কসেট শিশু কসেট তাহার গৃহে তাহার কন্যা দুইটির সহিত আলো-বাতাসের ভাগ বসাইতে আসিতেছে—তাই সে ভাবিত, আর জ্বলিয়া মরিত। আদর, যত্ন, হাতটান—এইনটাই তার পূর্ণমাত্রায় ছিল,—কসেটের অভাবে, এতটা স্নেহ থাকিলেও, হয় ত তিনটাই সমভাবে কন্যাদের উপর বর্ষিত হইত, কিন্তু কসেট আসিয়া অবধি কিল চাপড়ের ভাবটা সবই আপনার উপর লইল, আদর যত্ন যা কিছু সবই তাহাদের জন্য রাখিয়া দিল। তত্রাচ তাহার নিস্তার ছিল না।—অসহায়া, কোমলা, সংসারানভিজ্ঞ, বালিকা দণ্ডে দণ্ডে নির্য্যাতিত হইত, আর তাহারই পার্শ্বে অপর দুইটি বালিকা স্নেহের শীতল ছায়ায় বসিয়া থাকিত।—এমনই সংসার।

শুধু জননী বলিয়া নয় কন্যাদ্বয়ের—ইপোনাইন ও এজেলমারেরও—ব্যবহার বড় নির্ম্মম ছিল। তাহাদের কি দোষ? সে বয়সে বালিকারা ত জননীরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র, সে ছায়া আয়তনে ক্ষুদ্র—এই যা।

এই ভাবে বৎসর দুই কাটিল। প্রতিবেশিনীরা সব কথা জানিত না; তাহারা ভাবিত, জননী বুঝি আর কসেটের কোন উদ্দেশ লয় না। তাই তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত—"যা হোক্, থেনেডিয়ারদের খুব ভাল বল্‌তে হবে কিন্তু বাছা। পরের মেয়েকে ঘরের কড়ি দিয়ে কে পোষে বল ত?"

ক্রমে ক্রমে কসেটের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে থেনেডিয়ারের মনে সন্দেহ জন্মিল; তাই সে জো পাইয়া তখন হইতে মাসিক ১৫ ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়া বসিল, লিখিল—"মেয়ে এখন বড় হচ্ছে, বেশী খাচ্ছে, এর কমে হবে না।" পরমাস হইতে ১৫ ফ্রাঙ্ক করিয়াই তাহার নিকট আসিতে লাগিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, কসেটের দুর্দ্দশাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। যতদিন সে নিতান্ত শিশু ছিল, ততদিন ইপোনাইনদের কৃত অপরাধের সমস্ত শাস্তি তাহাকে বহন করিতে হইত, পাঁচ বৎসরে পড়িতেই বাটীর পরিচারিকারূপে সে গণ্যা হইল। পাঠক, কথাটা আশ্চর্য্য ভাবিবেন না, এমনই ঘটিয়া থাকে। বিখ্যাত দস্যু দুমলার্দ্দের বিচারে কর্ত্তৃপক্ষের নথিপত্র হইতে জানা যায় যে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, উদরান্ন-সংস্থানের উপায়ান্তর না দেখিতে পাইয়া, পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালে দস্যুদলপতি হয়। অতএব কসেট যে সে অল্প বয়সে অবস্থাবিপর্য্যয়ে দাসীগিরি করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

চিঠিপত্রাদি লইয়া যাওয়া, ঘরদ্বার উঠান প্রভৃতি ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, ছোট খাট মোট-ঘাট বহা,—এ সকলই এখন হইতে তাহাকে করিতে হইত। বিশেষতঃ কয়েক মাস হইতে ফ্যানটাইন টাকা পাঠাইতে পারে নাই, কাজেই থেনেডিয়াররা বরং জোর করিয়াই তাহাকে বেশী বেশী খাটাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ ফ্যানটাইন ফিরিয়া

আসিলে, কসেটকে দেখিয়া কখনই আপনার কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিত না,—তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই নধরদেহা বালিকা এতই শীর্ণা হইয়া গিয়াছে; অত্যাচার এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়া সে ক্ষুদ্র বালিকা এই বয়সেই এতই গম্ভীরপ্রকৃতি এবং এমনই লুপ্ত-শ্রী হইয়া পড়িয়াছে! থাকিবার মধ্যে চক্ষু দুইটি তার আজিও তেমনি আয়ত ছিল,—তাহাতে বুঝি তাহার দীনভাবটুকু আরও পরিস্ফুট হইয়া থাকিত। থেনেডিয়ারেরা তা দেখিয়া বলিত—"পাজি ছুঁড়ি! হাড়ে হাড়ে সয়তানি!"

দারুণ শীতের সময়েও, প্রত্যূষে উঠিয়া, শতছিন্ন গাত্রবস্ত্রে, কাঁপিতে কাঁপিতে, ছোট ছোট হাত দু'খানিতে প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহাকে ঘরদ্বার ঝাঁট দিতে হইত। গ্রামের লোকেরা তাই তাহার নাম দিয়াছিল—"চাতক পাখী।" চাতক পাখীটীর মতই দেখিতে সে ক্ষুদ্র ছিল, তাহারই মত প্রত্যূষে সকলের আগে উঠিতও বটে; তবে উভয়ের মধ্যে একটু মাত্র প্রভেদ ছিল;—এ চাতকে গান গাহিত না, বুঝি গান সে জানিত না!

ফ্যানটাইনের কি হইল, এখন তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

যথাসময়ে সে তাহার পিতৃগ্রাম ম—তে আসিয়া পৌঁছিল। বহুদিন পূর্ব্বে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেও, আব্ছায়া মত কতকটা তাহার মনে ছিল; কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া সেটাকে স্বগ্রাম বলিয়া প্রথমতঃ সে চিনিতেই পারিল না,—এখন তাহার এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যেখানে সামান্য কয়েক ঘর গৃহস্থ পরিবার লইয়াই গ্রামের সমগ্র জন-সংখ্যা ছিল এখন সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল-কারখানা, অজস্র দোকান-পাট, কত নূতন নূতন অট্টালিকা,—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিসে সে গ্রামের এখন এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল তাই বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ম—গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, কয়েক ঘর শ্রমজীবী মাত্রই সেখানে বসতি করিত—পুরুষানুক্রমে তাহারা কালো বনাত ও কালো কাঁচের চুড়ির ব্যবসায় করিত।—কিন্তু কাঁচা মাল (Raw materials) দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, বাধ্য হইয়া তৈয়ারী জিনিসের দাম তাহাদের চড়াইতে হইত—কাজেই দামী বলিয়া বাজারে তত কাটতি ছিল না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কিন্তু একজন বিদেশী লোক আসিয়া দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-প্রণালীতে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করে। পরিবর্ত্তন যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই সে ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এবং তজ্জন্য মূল্য সুলভ হওয়ায়, এখন হইতে সে সব জিনিসের বিক্রয় অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাইল। ফলে, ক্রেতা বিক্রেতা, এবং শ্রমজীবিসম্প্রদায় প্রত্যেকেই লাভবান্ হইতে লাগিল অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ লাভ থাকিতে লাগিল; এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির উন্নতি এবং শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিও সম্ভবপর হইল। দেখিতে দেখিতে নবাগত লোকটি আপনি সমৃদ্ধ হইয়া সে পল্লীকেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল—কিন্তু সাধারণে এ পর্য্যন্ত তাহার বংশপরিচয় বা পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিত না।—লোকে বলিত কয়েক শত ফ্রাঙ্ক মাত্র লইয়া সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় সে সে গ্রামে প্রবেশ করে; তারপর পরিশ্রম এবং কার্য্য-

কুশলতার গুণে এবং সে নূতন আবিষ্কারের ফলে তাহার এ সমৃদ্ধি; প্রথম যখন সে আসে তখন সাধারণ একজন শ্রমজীবীর ন্যায়ই তাহার আচার-ব্যবহার পরিচ্ছদ ছিল। লোকে আরও বলে যে, সে দিন তাহার আগমনের অব্যবহিত পরেই সন্ধ্যার সময় সে গ্রামে আগুন লাগে, এবং নবাগত লোকটি তাহা দেখিয়া আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত গৃহ হইতে দুইটি শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনে,--সে শিশু দুইটি পুলিশের দারোগার। সেই আকস্মিক বিপদে কৃতজ্ঞ কর্তৃপক্ষ আর তাহার ছাড়পত্র দেখিতে চায় নাই। লোকটি সেই দিন হইতে 'ফাদার ম্যাডেলিন' নামে পরিচিত হইয়া সে গ্রামে বাস করিতে লাগিল। তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ।

লোকটি উদারপ্রকৃতির, সর্ব্বদাই সে চিন্তামগ্ন থাকিত। সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন স্বহস্তে তাহার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই দুই বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার কার্য্যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিল,—প্রত্যহ সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ তাহার কারবারে খাটিতে লাগিল; কার্য্যের সুবিধার জন্য তখন ম্যাডেলিন স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রমজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি কারখানা করিল,—প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ তত্ত্বাবধায়ক এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। তবে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক বা বালিকার সেখানে স্থান ছিল না, ম্যাডেলিন এই একটি মাত্র বিষয়ে কঠোর ছিল। তাহার আগমনে সে মুমূর্ষু প্রদেশ কর্ম্মের দীক্ষা লাভ করিয়া যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল; চারিদিকে উৎসাহ-উন্মাদনা পরিস্ফুট হইতে লাগিল; শ্রম-বিমুখতা এবং দারিদ্র্য অন্তর্হিত হইল; অতি দুঃখীরও অন্নের সংস্থান হইল; দীন-দরিদ্রের আবাসও আনন্দরেখায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কার্য্যের জন্য কেহ আসিলে ম্যাডেলিন কখনও তাহাকে ফিরাইত না, শুধু বলিত,—"স্ত্রী হও, আর পুরুষ হও,—সৎপথে থাক।"

ল্যাফিটের ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই তাহার প্রায় ৬৷৷০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়াছিল; অথচ সে কখনও অর্থগৃধ্নু ছিল না। হাঁসপাতাল, বালক এবং বালিকাদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয়, আতুরাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি শত শত অনুষ্ঠানে তাহার উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে লাগিল।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই পরানুচিকীর্ষু থাকে; ম—তেও ছিল। প্রথম প্রথম তাহারা বলাবলি করিত—"লোকটা টাকা চায়।" তার পর তাহার দানব্যয় দেখিয়া বলিল—"লোকটার মনে একটা উচ্চাশা আছে।" কথাটা অনেকের মনে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল; কারণ, ম্যাডেলিনের ধর্ম্মের দিকেও বেশ একটু টান ছিল,—সাধারণের সহানুভূতিও তজ্জন্য তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অবশেষে যখন একদিন তাৎকালিক "মনিটর" পত্রে প্রকাশিত হইল যে, তাঁহার সাধারণ সৎকার্য্যের জন্য এবং পুলিশের অধ্যক্ষের অনুরোধে স্বয়ং সম্রাট্ ম্যাডেলিনকে ম—র নগরাধ্যক্ষের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহারা যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"দেখেছ ত, ঠিকই বলেছিলাম। লোকটার মনে মনে বরাবরই এমনই একটা মতলব ছিল। যা কিছু ওর দান-ধ্যান, সবই এর জন্য।"

ম্যাডেলিন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে পদ প্রত্যাখ্যান

করিল। সেই বৎসরের শেষে তাহার নূতন আবিষ্কারের ফলে, সম্রাট্ তাহাকে সি, এল্, এচ্ (Cross of the Legion of Honour) উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলেন। তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল—"ওঃ বুঝেছি, ও এই রকম একটা বড় উপাধি চায়।"

ম্যাডেলিন সে সম্মানও প্রত্যাখ্যান করিল। তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া, ম্যাডেলিনের এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ না বুঝিতে পারিয়া, শেষে বলিল—"লোকটা একটা Adventurer (হুজুকে)।" অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার-সমূহ হইতে ম্যাডেলিনের নামে অজস্র নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। সাধারণ শ্রমজীবিভাবে যেখানে তাহার কোন স্থান ছিল না, আজ অবস্থার উন্নতিতে সে সব দ্বার তাহার জন্য সাদরে উন্মুক্ত হইল। তত্রাচ ম্যাডেলিন আপনাকে দূরে দূরেই রাখিতে লাগিল। তাহাতে অনেকে বিরক্ত হইল;—কেহ বলিল—"ও একটা কোথাকার গেঁয়ো ভূত, মূর্খ,— ভদ্রপরিবারে ও মিশবে কি করে।" কেহ বলিত "পশু ও, ভদ্রতার কি জানে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। ম্যাডেলিন কিন্তু তাহাতে টলিল না—অবশেষে, একদিন কর্ত্তৃপক্ষ না-ছোড়বান্দা হইয়া তাহাকে ধরিলেন, গ্রামস্থ সকলে পথে ঘাটে তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিল; শেষে এক বৃদ্ধা ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে বলিল—"ভাল, নগরাধ্যক্ষ হলে দেশের ও দশের উন্নতি হয়। ভাল কাজ করতে হবে বলেই কি তোমার যত ভয়?" অগত্যা ম্যাডেলিনকে স্বীকৃত হইতে হইল, এবং তাহার অনতিকাল পরেই ম—র অধ্যক্ষরূপে তাহার নিয়োগপত্র আসিল।

নগরাধ্যক্ষ হইয়াও তাঁহার সেই সহজ অনাড়ম্বরতা বিনষ্ট হইল না। শ্রমজীবীর ন্যায় তাম্রাভ-বর্ণ, এবং দার্শনিকের ন্যায় সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন তাঁহার মুখভাবে সর্ব্বদাই একটা শান্ত শ্রী ফুটিয়া থাকিত। একটা চওড়া টুপি এবং গলা পর্য্যন্ত আঁটা কোর্ত্তাই সাধারণতঃ তিনি পরিধান করিতেন। কথা তিনি কহিতেন কম; এবং লোকের তোষামোদ হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। পথে কাহারও সহিত দেখা হইলে, মৃদু হাসিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেন—কাহাকেও কথা কহিবার বড় একটা অবকাশ দিতেন না; সুযোগ পাইলেই নির্জ্জন প্রান্তরে যাইয়া একাকী পদচারণ করিতেন। প্রায়ই তিনি পাঠগৃহে থাকিতেন; পুস্তক তাঁহার বেশী ছিল না; যাহা ছিল সবগুলিই উচ্চ ভাবপূর্ণ, সুনির্ব্বাচিত। যথার্থ বলিতে গেলে কিন্তু পুস্তকের মত নীরব অথচ যথার্থ বন্ধু আর নাই। সেই নীরব বন্ধুর নিত্যসহবাসে ম্যাডেলিনের কথাবার্ত্তা, ভাষা, ভাব ক্রমশঃই সংশোধিত হইতেছিল। একটা কথা, নির্জ্জনে বেড়াইবার সময় সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কোন না কোন একটা বন্দুক থাকিত; প্রায়ই তাহার ব্যবহার হইত না, কিন্তু আবশ্যক কালে তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ-সন্ধান ছিল। নিরীহ জীবকে কখনও তিনি শিকার করিতেন না। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিলেও, শরীরে তখনও তাঁহার অমানুষিক শক্তি ছিল। পথে চলিতে চলিতে কতবার তিনি কতলোকের বহুপরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য একাই করিয়া দিতেন। লোকেরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত।

কৃষকদিগকে কতদিন তিনি কৃষিসম্বন্ধে কত উপদেশ দিতেন,—কিরূপে ধানের গোলায়, মরাইয়ের নীচে, কেবল মাত্র লবণের জল দিলে ঘুণ ধরে না, কিরূপে ধানের খেতে, গোলাবাড়ীতে, orviotএর ফুল রাখিয়া দিলে চেলোপোকা নষ্ট হয়; কিরূপে ধানের জমি ভাল থাকে, ইত্যাদি অনেক কথা তিনি তাহাদের বলিতেন। একবার কোন মজুরকে কতকগুলি nettle (কাঁটাগাছ) তুলিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়া তিনি বলেন "দেখ, ভগবানের জগতে সব জিনিসেরই মূল্য আছে। এর জমিও পাট করতে হয় না, চাষেরও পরিশ্রম নেই, অথচ সামান্য যত্নেই এ থেকে কত উপকার পাওয়া যায়, কতকাজে একে লাগান যেতে পারে; আমরা সে যত্নটুকুও করি না বলেই, সময়ে এর ফলগুলা কুড়িয়ে নিই না বলেই, শেষে এ গুলা জমির ক্ষতি করে,কাজেই তখন তাকে উপড়ে ফেলে দূর করে দিই। মানুষও এই কাঁটাগাছের মতনই।" তারপর থামিয়া,—"ভাই সব, এটা ঠিক জেনো, সংসারে নিতান্ত মন্দ লোক বলে, বা একবারে অপদার্থ উদ্ভিদ্ বলে কিছু নেই, আবাদের দোষেই সব মন্দ হয়, যা কিছু ত্রুটী—সবই চাষার।" ম্যাডেলিন সব কাজই জানিতেন,— সামান্য খড়-কুটা দিয়া ছেলেদের এমন সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈয়ার করিয়া দিতেন যে, তাহারা তাঁহাকে পাইলে আর সহজে ছাড়িতে চাহিত না।

যখনি কোন মৃতদেহ গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হইত, ম্যাডেলিন, কাছে থাকিলে, অমনি তাহার অনুসরণ করিতেন। অপরের দুঃখ কষ্ট মৃত্যু তাঁহাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিত; শোকার্ত্ত পরিবারে তাহাদেরই একটি হইয়া তিনি মিশিয়া যাইতেন। মৃতের উদ্দেশে পঠিত মন্ত্রের ধ্বনি অপর এক জগতের দ্বার যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিত। মৃত্যুর গাঢ় অন্ধকারে সে করুণ স্বর যেন ডুবিয়া যাইত, আর উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্তের গূঢ়-রহস্যাচ্ছন্ন কোন দৈবি ঝঙ্কার যেন তিনি শুনিতে থাকিতেন। তাঁহার অধিকাংশ সৎকার্য্য দানাদি অতি গোপনেই নিষ্পন্ন হইত। কত দরিদ্র, কত সময় সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিয়া তার সদর দরজার পুরাতন তালা ভাঙা দেখিয়া "চোর" "চোর" করিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিত তাহার শয্যার উপর কতকগুলা টাকা কে রাখিয়া গিয়াছে। সে চোর কে, পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। —লোকে তাঁহার টাকাকড়ি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিত; তবে এটা সত্য যে লাফেট ব্যাঙ্কে তাঁহার প্রভূত পরিমাণ অর্থ জমা ছিল, এবং ব্যাঙ্কওয়ালার সহিত এই সর্ত্ত ছিল যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সব টাকা তিনি এককালীন উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

ম্যাডেলিন ম—নগরের অধ্যক্ষ হওয়ার পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সহসা একদিন ডি—র প্রধান ধর্ম্মযাজকের ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইল, পরদিন ম্যাডেলিন শোক চিহ্ন ধারণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল কারণ ডি—র ধর্ম্ম-যাজক তখনকার কালে একরূপ মহর্ষি-পদ-বাচ্য ছিলেন। লোকে ভাবিল, হয়ত

ম্যাডেলিন তাঁহার কোন আত্মীয়ই বা হইবেন; তত্রাচ তাহারা উভয়ের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য কৌতূহলী হইল। অবশেষে একদিন এক সম্ভ্রান্তা বৃদ্ধা ম্যাডেলিনকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন—

"আপনি কি তাঁহার কোন আত্মীয়?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তাঁর জন্য আপনি শোকচিহ্ন নিয়েছেন কেন?"

ম্যাডেলিন ধীরভাবে উত্তর করিলেন--"ছেলে বয়সে তাঁর বাড়ীতে আমি চাকর ছিলাম, তাই।"

আরও একটা কথা। যখনি কোন 'হা-ঘরে' বালক সে গ্রামে আসিত, ম্যাডেলিন তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া অর্থ ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। তাহারা যাইয়া সঙ্গীদের কাছে সে গল্প করিত; ফলে হা-ঘরে বালকদের প্রায়ই সে পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যাইত।

ক্রমে ক্রমে ম্যাডেলিনের নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দশ পনের ক্রোশের মধ্যে যত গ্রামবাসী ছিল সকলেরই তিনি উপদেষ্টা স্বরূপ হইলেন; মামলা-মোকদ্দমার সালিশনিষ্পত্তি, পরস্পর বন্ধুত্ব সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেন। লোকের মুখে মুখে তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

একজনমাত্র লোক তাঁহার উপর বরাবর সন্দিগ্ধ ছিল। সাধারণের সুখ্যাতি, ম্যাডেলিনের অসংখ্য সৎকার্য্যাদি কিছুতেই তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। এক একজন লোকের মনে এমন এক একটা পাশবিক সংস্কার থাকে—যাহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, যাহা আপনা আপনিই স্নেহের আকর্ষণের বা ঘৃণার বিকর্ষণের সৃষ্টি করে, যাহা কখনও ইতস্ততঃ করে না, কখনও চঞ্চল হয় না; কখনও আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না; জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিতর্ক যাহাকে কখনও টলাইতে পারে না; স্থির গম্ভীর অদম্য অনম্যভাবে আপনার সম্পূর্ণতার মাঝে যাহা শুদ্ধভাবে বসিয়া থাকে। এ লোকটারও প্রকৃতি সেইরূপ। প্রায়ই, যখন ম্যাডেলিনের ধীর স্নেহ-মধুর সাধারণের মঙ্গলাশীষপূত মূর্ত্তিখানি পথে দেখা যাইত, তখন সে অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির দৃষ্টিতে, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত; আর নিম্নাধরৌষ্ঠ দিয়া ঊর্দ্ধাধরৌষ্ঠকে নাসিকার সহিত সংযুক্ত করিয়া, ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিত; ভাবটা—"কে এ? কোথায় না দেখিছি যেন? যাই হোক্ তোমার ভেকে আমি ভুলছিনে, ঠাকুর!"

সে জাভার্ট। পুলিশের দারোগা। ম—তে যখন সে আসে, তখন ম্যাডেলিনের ব্যবসায় জমিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

রেখা-চিত্র

বাঙ্গালীর স্বাধীন বৃত্তির পরিচয় দানের সুযোগ বড়ই অল্প ঘটে। এরূপ স্থলে, দেশের শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন ভাবের উপযোগী স্পষ্ট-বাদিতার সাহস দেখিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না, তাই আজ দেশের চারিটি প্রথিতনামা মহাশয় ব্যক্তির অনুষ্ঠিত চারিটি ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই,ই, মহোদয় বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে যখন নিযুক্ত হন, তখন স্যার আস্‌লি ইডেন্ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ। রাজকার্য্যোপলক্ষে ভূদেব বাবু বেলভিডিয়ারে ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, প্রসঙ্গক্রমে ইডেন সাহেব সম্মান ও সমাদরের ভাবব্যঞ্জক স্বরে ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন আমাদের রাজ্য পালন-পদ্ধতি কত উদার! আমরা আপনাকে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়াই জাতি ও বর্ণ বিচার না করিয়া, একেবারে একটা ডিপার্টমেন্টের সর্ব্বোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি।" ভূদেব বাবু চিরদিনই স্পষ্টবক্তা, এ স্থানেও উচিত বলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। বলিলেন,—"এই রাজ্যপালনপদ্ধতি অত্যন্ত অনুদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আমাকে যেরূপ ভাবে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কখনই ঐরূপ হইত না। আপনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, ভিতরে ভিতরে প্রভেদ বজায় রাখার জন্য আপনারা দৃঢ়ব্রত, তবে এদেশে অবশ্য আপনাদের এই নীতি শোভা পাইতেছে, আর এতেই দেশের লোক সন্তুষ্ট।" ছোটলাট বলিলেন, "আপনার এরূপ বলিবার কারণ কি?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "দেখুন, ডাইরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌স্‌ট্রক্‌সনের পদে আমাকে কয়েক মাসের জন্য নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু ঐ নিয়োগটা একজন ইংরাজের হইলে, গেজেট যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, আমার বেলা সে ভাষা ব্যবহার করিতে আপনাদের আপত্তি জন্মিল। Officiating Director এই দুটি শব্দ ব্যবহার ত্যাগ করিয়া 'Placed in charge of the Directorate' ব্যবহার করা আবশ্যক হইল; একজন ইংরাজের নিয়োগে কি ঐরূপ কিম্ভূতকিমাকার হইত?" ইডেন সাহেব সত্যই উদারপ্রকৃতির রাজকর্ম্মচারী ছিলেন তাই ভূদেব বাবুর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ভূদেব বাবু পুনরপি বলিলেন "দেখুন, মোগল-রাজত্বে আমার ন্যায় ব্যক্তি মোগল-কোর্টের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিতে বোধ হয় অক্ষম হইত না।" এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ইডেন সাহেবের আনন্দানুভূতি সে দিন বিষাদে পরিণত করিয়া ভূদেব বাবু গৃহে ফিরিয়াছিলেন।*

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় যখন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ, সে সময়ে পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নির্দ্দেশ

---

* অধুনা লোকান্তরিত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় ভূদেব-প্রসঙ্গে আমাকে ঐ ঘটনাটি বলিয়াছিলেন। ইনি ডাইরেক্টারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

মত উক্ত কলেজের কার্য্যপরিচালন জন্য এক কমিটী গঠিত হয়। সেই কমিটীর সম্পাদক ছিলেন—রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, আর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কমিটির সভাপতি। সুতরাং যখন যিনি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন, তিনিই কলেজ-কমিটীর সভাপতির কার্য্য করিতেন।

একদা প্রেসিডেন্সীবিভাগের শিক্ষাবিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক মাসের জন্য 'বদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার তদানীন্তন সহকারী চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় অস্থায়িভাবে ঐ কার্য্যে ব্রতী থাকা কালে একবার মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয় সকল পরিদর্শনে বাহির হইয়া বহরমপুরে উপস্থিত হন। তথায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলার বিদ্যালয়-সমূহের অবস্থা বিষয়ে নানা কথা-বার্ত্তার মাঝখানে জেলার কর্ত্তা সহসা কলেজ পরিদর্শনের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। ' কলেজ পরিদর্শন ত করা হয় না।" সাহেব বলিলেন "এবার হবে। আগামী কল্য আপনি কলেজে যাইবেন, আমি কলেজের কমিটীকে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া এখনই পত্র লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিটির সম্পাদক রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরকে এক পত্র লিখিয়া পরদিনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং এ কথাও লিখিয়া দিলেন যে, তিনি স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়কে পরদিন কলেজ-পরিদর্শনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

যে দিন এই ব্যাপার ঘটে, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কাশিমবাজার রাজবাটীতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠাননিবন্ধন বহু পদস্থ লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। রায় বাহাদুর সম্পাদক, কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্র বাবুকে পত্রের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় জানাইয়া পর দিনের পরিদর্শন ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু রায় বাহাদুরের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাই রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে একখানি পদত্যাগপত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবা মাত্র ব্রজেন্দ্র বাবু নিজের পদত্যাগপত্রখানি হাতে দিয়া বলিলেন "আগে কল্যকার ব্যবস্থা করুন। আমি কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ভিন্ন অন্য কোন নিম্নপদবির কর্ম্মচারী দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে সাহায্য করিতে পারিব না। সে কাজ আমার দ্বারা হইবে না।" শ্রীনাথ বাবু পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন "এখন উপায়? এ ব্যাপার এতদূর গড়াইবে, আমি তাহা আদৌ বুঝিতে পারি নাই। তাহা হইলে আপনাকে সংবাদ দিবার পূর্ব্বে উপায় অবলম্বন করিতাম, এখন উপায় কি?"

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ ক্ষেত্রে আমার দ্বারা কোন সাহায্য হইবে না।" এই সময়ে বৈকুণ্ঠ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র শ্রীনাথ বাবু বৈকুণ্ঠ বাবুকে গিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া ত্বরায় উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে একজন বিষয়-জ্ঞানবিহীন নিরীহ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই

মনে করিতেন, কিন্তু সেই দিন ঐ পদত্যাগ পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা উচ্চগ্রামে উঠিয়া গেল। বৈকুণ্ঠ বাবু বুঝিলেন যে, অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ কেবল পণ্ডিত নহেন, তাঁহার পদ-মর্য্যাদাজ্ঞান পূর্ণরূপে পরিস্ফুট ও স্বপদের সম্মান রক্ষায় বেশ পটু; উক্ত পদত্যাগ-পত্রে উচ্চাঙ্গের কর্ম্মপটুতার পরিচয় পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং ত্বরায় ইহার প্রতীকার সাধনে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনাথ বাবু ও বৈকুণ্ঠ বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া তখনই সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় উপস্থিত হইয়া সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিবামাত্র, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর—সান্ধ্যসমীরণ-সেবিত স্নিগ্ধ ইংরাজ-মূর্ত্তি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব—সহসা বৈশাখের প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডে পরিণত হইয়া বলিলেন, "How can it be ? I can't cancel my order. The Inspector must inspect the college to-morrow. I have asked him to do so as President of the College Comittee. It is impossible for me now to ask him not to go there". বৈকুণ্ঠ বাবু ও শ্রীনাথ বাবু সাহেবকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে "এটা নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, আর এই হুকুম তামিল করিতে হইলে, আমাদিগকে বর্ত্তমান অধ্যক্ষকে হারাইতে হয়। এ কার্য্যে আমরাই বা কেমন করিয়া সম্মত হইব ?" সাহেব বলিলেন, "I don't know that. It is my order, and the order must stand". এই বলিয়া সাহেব ক্রোধ ও অভিমানভরে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তখন বৈকুণ্ঠ বাবু সাহেবকে বলিলেন, কলেজের একটা কমিটি আছে, এরূপ গুরুতর বিষয়ে কলেজ-কমিটির অভিপ্রায় জানিয়া কার্য্য করা উচিত তাই আমার অনুরোধ এই যে আজ রাত্রিতেই সম্পাদক সকল সভ্যকে সংবাদ দিবেন। আগামী কল্য প্রাতঃকালে ছয়টার সময় আপনার এখানেই আমরা মিলিত হইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিব, আপনি সে বিষয়ে অনুমতি দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।" সাহেব বলিলেন "All right Babu."

পরদিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় সভ্যেরা সাহেবের বাঙ্গালায় মিলিত হইলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, বিষয়টা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে এবিষয়ে কমিটি কিছু না করিয়া শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান রাজপুরুষের উপর ভার দেওয়া হউক, কমিটি ডাইরেক্টর বাহাদুরের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিলেন। অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার বক্তব্যসহ বিষয়টা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তার নিকট প্রেরণের অনুরোধ করিয়া বলিলেন "আমরা আপনাদের প্রদর্শিত বিধি-সঙ্গত পন্থারই অনুসরণ করিলাম। এতে ক্ষুণ্ণ হইলে চলিবে কেন? শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, তাহা না করিলে, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার অবমাননা করা হয়, আপনার ত সেরূপ করা উদ্দেশ্য নহে।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনরায় বলিলেন "All right Babu."

অধ্যক্ষের পদত্যাগপত্রসহ কমিটির মন্তব্য, সভাপতির মন্তব্য স্বাক্ষরে তদানীন্তন ডাইরেক্টর স্যার আলফ্রেড্ কয়াট্ বাহাদুরের দরবারে প্রেরিত হইল। জেলার কর্তা চন্দ্র মোহন বাবুকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "আপনি কলেজ পরিদর্শন জন্য এই জেলায় কয়েক দিনের জন্য অপেক্ষা করুন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরিদর্শনকার্য্য চলিতে থাকুক।' সপ্তাহ অতীত হয় দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাহার তাগিদ্ দিলেন। নবম কি দশম দিবসে শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ আসিল। সে আদেশ বড়ই চমৎকার।

ডাইরেক্টর বাহাদুর লিখিলেন "শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরই কেবল প্রথম শ্রেণীর কলেজ পরিদর্শনের অধিকারী, তন্নিম্নস্থ কোন কর্ম্মচারী নিয়মানুসারে ঐরূপ পরিদর্শনের অধিকারী নহেন। এক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভ্রমবশতঃ ইন্‌স্‌পেক্টরকে কলেজ পরিদর্শনে অনুরোধ করায় কলেজের অধ্যক্ষ যদি শীলতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে সভাপতির অনুরোধ রক্ষা করিতেন, বা এখনও করেন, ভালই, কিন্তু তাঁহার আপত্তি থাকিলে, নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইনস্‌পেক্টর দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে তাঁহাকে বাধ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। আর এক কথা এই যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যত দিন কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষতা করিবেন, সে সময়ে কলেজ-কমিটি কলেজের শিক্ষাবিষয়ক আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।"

এই আদেশ আসিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার স্থলে জেলার জজ বাহাদুরকে সভাপতি-পদে বরণ করা হইল। বোধ হয় সেই ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অস্থায়ী ইন্‌স্‌পেক্টর চন্দ্রমোহন বাবুর আর কলেজ পরিদর্শন করা হইল না।

মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুই জন ইংরাজ জজের সঙ্গে মিলিত বিচার-আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঢাকার ষড়যন্ত্রবিষয়ক মোকদ্দমার আপিল শুনিতে ও বিচার করিতে আরম্ভ করেন। আপিলের সময়ে রাজপক্ষ-সমর্থনের ভার ছিল কাউন্সেল গার্থ সাহেবের উপর। গার্থ সাহেব আপিলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান কালে প্রাথমিক বক্তৃতায় কয়েকটা অবান্তর কথার উত্থাপন করিবামাত্র স্যার আশুতোষ বলিয়াছিলেন "মিষ্টার গার্থ, আপনি যাঁহার নামে গুরুতর অভিযোগ আরোপ করিতেছেন, তিনি কি এই আসামী দলভুক্ত?" উত্তরে গার্থ সাহেব বলিলেন "No, my lord." স্যার আশুতোষ তৎক্ষণাৎ বলিলেন "তবে তাঁহার নাম করিবার আপনার কি অধিকার আছে?" পুনরায় গার্থ সাহেব বলিলেন "আর, সি, দত্তের ভারতীয় ইতিহাস পাঠে এদেশের ছাত্রবৃন্দের মস্তিষ্ক বিগ্‌ড়াইয়া যাইতেছে।" স্যার আশুতোষ প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসা করিলেন মিষ্টার গার্থ কোন্ ইতিহাস? যেখানি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, সেই বইখানিকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতে সাবধান হওয়া উচিত।" গার্থ সাহেব পুনরায় বলিলেন "শিবাজি দস্যুদলের নায়ক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।" স্যার আশুতোষ

উত্তরে বলিয়াছিলেন—"Was the Marhatta leader a greater robber than your Alexander the Great ?" এইরূপ শিষ্ট বিশেষণে ভারতীয় জাতি সকলের মর্য্যাদাশালী লোকদিগকে ভারত-প্রবাসী বিদেশীগণ কালাকালবিচারশূন্য হইয়া আক্রমণ করিয়া থাকেন। নিরীহ ভারতসন্তান এ সব তিরস্কার নীরবে সহ্য করে।

ভাগ্যগুণে বিচারাসনে স্যার আশুতোষের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন, উদারহৃদয়, তেজস্বী বিচারপতি উপবিষ্ট ছিলেন, তাই সমগ্র জাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গার্থ সাহেবের বাক্যগঞ্জনার উপযুক্ত প্রতিবাদ হইয়াছিল এবং সাহেবও নীরব হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্যার আস্‌লি ইডেন যখন বঙ্গের ছোটলাট নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে আলিপুরের রাজ-ভবনে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তাঁহার বন্ধু-বর্গের সকলেই এক এক করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বেলভিডিয়ারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যান নাই কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়। প্রসঙ্গক্রমে ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই আমার সংবাদ লইলেন, পণ্ডিত কেবল আমার কোন খোঁজ লইলেন না।" স্বর্গীয় পাল মহাশয় এই বহু সম্মানজনক আক্ষেপোক্তিতে আনন্দিত হইয়া আলিপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে কাঁসাড়িপাড়ার মোড় হইতে গৃহে না গিয়া সেই দরবারের পোষাকেই বাদুরবাগানে বিদ্যাসাগরসদনে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাল মহাশয়কে বলিলেন, "এ রাজবেশে আমার এখানে কেন ?" রায় বাহাদুর বলিলেন "আমি বেলভিডিয়ারে গিয়াছিলাম। ইডেন সাহেব আপনার কথা বলায় আপনাকে কথাটা বলিতে আসিয়াছি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন 'আমি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসায় আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই সংবাদ লইলেন, কেবল পণ্ডিত কোন সংবাদ লইলেন না।' আপনি কি একবার সাক্ষাৎ করিবেন না ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া "না রাম না গঙ্গা" একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমশঃ অন্যান্য কথা পাড়িয়া রায় বাহাদুরের আদর আপ্যায়ন করিয়া বিদায় দিতেছেন, এমন সময়ে উৎকণ্ঠান্বিত রায় বাহাদুর পুনরায় বলিলেন "আপনি কথাটা গায় মাখলেন না, ব্যাপার কি ?" "ব্যাপার কি শুনিতে চাও তবে একটু বসো" বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি শান্ত ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন "তোমাদের দরকার আছে, তোমরা যাইতেছ, আমার কোন দরকার নাই, আমি কেন যাইব ? ছোটলাটের কোন প্রয়োজন হইলে তিনি আমাকে সংবাদ দিতে পারেন। আমি অকারণ কেন দৌড়াদৌড়ি করিব ?" রায় বাহাদুর বলিলেন "তিনি পুরাতন আত্মীয়তার অভিমান করিয়াই ঐ কয়টি কথা বলিয়াছেন।" উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "তিনি কি ঐ কথাগুলি আমাকে বলিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন ?" রায় বাহাদুর বলিলেন "আজ্ঞে না, তা তিনি বলেন নাই।" এইবার বিদ্যাসাগর একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর ইডেন্ সাহেবের পাঁচিলে আমার একচালা ? যেমন তোমার মুখে শুনা, অমনি আলিপুরে দৌড়িব ?

তোমায় তিনি অনুরোধ করেন নাই, আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার নাম করিয়া ইডেন সাহেবকে বল পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন।” রায় বাহাদুর বলিলেন “আজ্ঞে আমার দ্বারা ও কাজ হইবে না, আমি আপনাকে এ কথা বলিতে আসিয়া অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে কোন কথাই বলিব না।”

এই ঘটনার কিছুকাল পরে কার্য্যবিশেষে উত্তর-পশ্চিমের ছোটলাট ও বঙ্গের ছোটলাট একদা বক্সারে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে বঙ্গের ছোটলাট ইডেন্ সাহেব মোগলসরাই ষ্টেশনের দীর্ঘ প্লাটফর্ম্মে পাইচারি করিতেছেন, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশী হইতে আসিয়া মোগলসরাই ষ্টেশনে কলিকাতার গাড়ীতে চড়িয়া বসিতেছেন, ইডেন সাহেব তাহা দেখিয়াছেন। দেখিয়া ধীরে ধীরে পণ্ডিতের গাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র ইডেন সাহেব সুন্দর বাঙ্গালায় বলিলেন “আপনি আমাকে চিনিতে পারেন?” বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন “না, চিনিতে পারিতেছি না ত।” সাহেব বলিলেন “আমি ইডেন।” বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন “কেমন করিয়া চিনিব? দেখাসাক্ষাৎ কতকালের কথা হইল, তখন তুমি লিক্‌লিকে ছোকরা ছিলে, এখন তুমি যেমন বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, তেমনি তোমার চেহারাখানাও জাঁদরেল গোছের হয়েছে, সে চেহারাই নাই, আমি কেমন করে চিন্‌বো?” ইহার পরই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন “তুমি কৃষ্ণদাস পালকে আমার বিষয়ে কিছু বলেছিলে?” সাহেব বলিলেন “হাঁ বলিয়াছিলাম।” “আমি যে উত্তর বলিয়াছিলাম তিনি বোধ হয় তোমাকে সে কথা বলেন নাই। আমি সর্ব্বাগ্রে সেটা তোমাকে বলি,” বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাগুলি ইডেন সাহেবকে বলিলেন। সাহেব “পাঁচিলে এক চালার” কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন “বেশ উত্তর হয়েছে, এখন বেলভিডিয়ারে পায়ের ধুলা পড়িবে কবে?” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন “তোমার যে দিন ইচ্ছা সংবাদ দিলেই যাইব।” এরূপ ভাবের মর্য্যাদাবোধই এদেশের লোকসমাজে ফুটিয়া উঠিতে বিলম্ব আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যাঁহারা কর্ম্মী, জীবনী-লেখক তাঁহাদিগের জীবনের ঘটনা-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু যে সাধনার বলে তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—তাহা দেখান এক প্রকার সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিপুণ ব্যবচ্ছেদকের ছুরিকা দ্বারা মনুষ্যদেহের শিরা, পেশী প্রভৃতির যথাযথ

সংস্থান প্রকাশ করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যদেহে জীবনী-শক্তির স্থান কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সমালোচক কবিতার সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু সহস্র বিশ্লেষণেও কবিতার প্রাণ কোথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না—তেমনি মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা কেবল তাহার প্রধান প্রধান উপাদান নির্দ্দেশ করিতে পারি—কিন্তু যে জীবনব্যাপী নিগূঢ় সাধনায় এই চরিত্র আপনাকে সম্পূর্ণ সফল করিয়াছিল,—তাহা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সংসারচন্দ্র সামান্য শিক্ষকতা হইতে ক্রমে ক্রমে জয়পুরের মত একটা বিশাল রাজ্যের মন্ত্রিত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমরা ঘটনা-বলি গ্রথিত করিয়া তাহা দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু কেমন করিয়া যে তাঁহার প্রতিভা চারিদিক হইতে রস গ্রহণ করিয়া, ক্ষুদ্র বীজ যেমন বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, তেমনি আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া বিকশিত হইয়াছিল—জানি না কি প্রকার বিশ্লেষণে তাহা প্রকাশ করিব। সংসারচন্দ্রের জীবনী লিখিতে যে সহস্র ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে—সে সকল ত্রুটির ইহাই একমাত্র ওজুহাত।

এত দূর যাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিয়াছেন—সংসারচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ধারণা জন্মিয়াছে, আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। তথাপি আমরা তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্য এই পরিচ্ছেদের অবতারণা করিয়াছি।

রাজনীতি ব্যাপারটি এমন যে, ধর্ম্ম-নীতির সহিত ইহার অহি-নকুল-সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মভীরু তাঁহারা যদি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার সামঞ্জস্য করা যে কতদূর কঠিন তাহা তাঁহারাই বুঝেন। সংসারচন্দ্র সম্বন্ধে কি রাজা, কি প্রজা, কি ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী সকলেরই মুখে এই একটা কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যাইত -"Oh! he is a God fearing man!"—এই ধর্ম্ম-ভীরুতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান। তিনি অল্প বয়স হইতেই নানা দুঃখ-কষ্টের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া "সাবধানে জ্বালায়ে অন্তর-প্রদীপখানি" সংসারের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্তা বিধাতা তাঁহাকে এই বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যে বিবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতেছিলেন, তিনি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নানা প্রলোভন, নানা চক্রান্ত, "প্রতিদিনের কুশাঙ্কুর" প্রতি পদে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরস্থিত দেবতার আদেশ-বাণী কখন অগ্রাহ্য করেন নাই—তিনি সেই "ভয়ানাং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাম্"এর আদেশ প্রতিকার্য্যে অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন—জগদীশ্বর শুধু প্রেমময় নহেন—তিনি ভীষণং ভীষণানাম্। ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান; ধর্ম্মভীরুতা এবং জগদীশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতাই

তাঁহার চরিত্রকে অসামান্যতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব দৈন্য, সকল প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া অসাধারণ চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের যাহা কিছু মহত্ব, এই ধর্ম্মভীরুতাই তাহার মূল প্রস্রবণ।

সংসারচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের মূল—তাঁহার স্বর্গীয় পিতার আদর্শ এবং উপদেশ। বাল্যকালে তিনি প্রতিদিন প্রাতে পিতার সহিত মন্দিরে গিয়া প্রণামাদি করিয়া আসিতেন এবং গৃহে নিজে পিতার অনুকরণে পূজাদি করিতেন। বালকের নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী হয়েন। তখন বঙ্গদেশে এই নবধর্ম্মের যুগ—রাজা রামমোহন রায় যাহার ব্যাখ্যাতা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাহার সাধক এবং কেশবচন্দ্র সেন যাহার প্রচারক—সেই নবধর্ম্মের স্রোত বঙ্গদেশ হইতে সুদূর আগ্রা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, তাহার ফলে তখনকার অনেক শিক্ষিত যুবকই আগ্রার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেন, সংসারচন্দ্রও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ লইয়া নিয়মিতরূপে এখানে আসিয়া উপাসনাদি করিতেন। তারপর যখন স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন, তখন সংসারচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে উৎসাহে যোগ দিলেন। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। জয়পুর ব্রাহ্ম-সমাজ লোপ পাওয়ার পর সংসারচন্দ্র নিজে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত উপাসনাদি করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে সংসারচন্দ্রের জীবনে এক মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্রের শিক্ষাদাতা এক জন বৈদান্তিক পাঞ্জাবী সাধুর সহিত সংসারচন্দ্রের ধর্ম্মালোচনা হইল—বহুক্ষণব্যাপী আলোচনার ফলে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান হয়েন। এই সময় হইতে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হিন্দুগৃহীর আদর্শ গ্রহণ করিয়া আপন জীবনে সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং জীবনের প্রতিকার্য্যে তিনি হিন্দুর সেই আদর্শ অনুসারে চলিতেন।

এই ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে ঈশ্বরের উপর যে একান্ত নির্ভরতা, যে সাহস, বিপদে যে অটল ধৈর্য্য, এবং প্রলোভনে আত্মরক্ষার যে অসীম ক্ষমতা দান করিয়াছিল—তাহা গৃহীর পক্ষে বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিতান্ত সুলভ নহে।

তাঁহার সাহস সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গীদিগের মুখে আজও নানা প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ মাধোসিংহ অত্যন্ত শিকার প্রিয়। তিনি পূর্ব্বে প্রায়ই রাত্রে ব্যাঘ্র শিকার-করিতে যাইতেন। গভীর বনের ভিতর বৃক্ষের উপর শিকারীদিগের জন্য কয়েকটি 'মাচান' বাঁধা হইত। সংসারচন্দ্র শিকার করিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গে না লইলে মহারাজের চলিত না। মাঝে মাঝে শিকার সম্বন্ধে অন্য শিকারীদের মহারাজের আদেশ দিবার প্রয়োজন হইত। সংসারচন্দ্রের উপরই সে সকল আদেশ বহন করিবার ভার পড়িত। তাঁহার সঙ্গীরা বলেন সেই ঘোর অন্ধকারে, গভীর বনের ভিতর যখন প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্র আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা, সে সময় সংসারচন্দ্র সামান্য এক গাছি ছড়ি মাত্র হস্তে করিয়া

এক মাচান হইতে নামিয়া অন্য মাচানে যাইতেন, নির্ভীক সংসারচন্দ্রকে তাহারা কখন একটুও বিচলিত বা ত্রস্ত হইতে দেখে নাই। মহারাজ তাঁহাকে বন্দুক হাতে করিয়া যাইবার জন্য বলিলে তিনি একটু হাসিয়া বলিতেন "কি দরকার ?'

বাল্যকাল হইতে সংসারচন্দ্র নানা দুঃখ কষ্ট, নানা শোকের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শোকে দুঃখে কেহ কখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের একটা ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া ইন্দুমতী তাঁহার একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ইন্দুমতীর স্বামী মেদিনীপুর জেলায় কাথিতে ওকালতী করেন। কয় দিন হইতে ইন্দুমতীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একদিন প্রাতে ইন্দুমতীর পরলোক গমনের সংবাদ আসিল, সংসারচন্দ্র তখন মহারাজের নিকট। এই নিদারুণ সংবাদ যে সংসারচন্দ্রকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু বাহিরে তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তিনি ধীর ভাবে আফিসের নিয়মত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। বাড়ী যাওয়া মাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যাকুল হইয়া ইন্দুমতীর সংবাদ লইতে আসিলেন, সংসারচন্দ্র কোন কথা না কহিয়া নিজে স্নান আহার করিয়া বাড়ীর সকলকে স্নানাহার করাইলেন, তারপর সকলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া ধীর ভাবে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ দিলেন এবং নানা প্রকার উপদেশ দিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া আর আর সকলে শান্ত হইল - তিনি আপন বলে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে বলীয়ান্ করিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের কত প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছিল—নানা কারণে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নহে। একটা উদাহরণ দেই—মহারাজ মাধোসিংহের গদি প্রাপ্তির পর ১৮৮১ সালে তাঁহার সহিত গুজরাট প্রদেশের ধ্রাংধাড়া রাজকুমারীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সে জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ কৃষ্ণরাও পাণ্ডুরাং ধ্রাংধাড়া রাজ-দরবার হইতে জয়পুর আগমন করেন। মিঃ কৃষ্ণরাও জয়পুরে আসিয়া তদানীন্তন রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং রাজবাটীর কর্ম্মচারীদিগকে নানা কৌশলে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হয়েন। সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং মহারাজের উপর তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট—এই সকল কারণে মিঃ কৃষ্ণরাও তাঁহাকেও স্বপক্ষে আনিবার বিধিমত চেষ্টা করেন এবং যাহাতে এই শুভ-বিবাহ ঘটে তাহা করিতে পারিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবেন এমন প্রস্তাবও করেন। পুরস্কারের পরিমাণ দরিদ্র সংসারচন্দ্রকে প্রলোভিত করিতে পারিল না—তিনি সহাস্য বদনে এই বিপুল অর্থ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"যে পরিশ্রমে এবং মহারাজের অনুগ্রহে তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন—তাঁহার সামান্য অভাবের পক্ষে তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। এরূপ পুরস্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি এই

শুভ-বিবাহ যাহাতে ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বিবাহ হইয়া গেল। এই ঘটনার বহুদিন পরে বোম্বায়ে কোন বন্ধুগৃহে সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ-চন্দ্রকে দেখিয়া মিঃ—কৃষ্ণরাও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি জান না, তুমি কত বড় লোকের পুত্র; তোমার পিতা মানুষ নহেন, তিনি দেবতা।" (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

গাব তোমার সুরে
    দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুন্‌ব তোমার বাণী
    দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা
    দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
    দাও সে অচল ভক্তি।
সইব তোমার আঘাত
    দাও সে বিপুল ধৈর্য্য,
বইব তোমার ধ্বজা
    দাও সে অটল স্থৈর্য্য।

নেব সকল বিশ্ব
    দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
    দাও সে প্রেমের দান।
যাব তোমার সাথে
    দাও সে দখিণ হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
    দাও সে তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌ব তোমার সত্যে
    দাও সেই আহ্বান,
ছাড়্‌ব সুখের দাস্য
    দাও দাও কল্যাণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ব্বরাগ *

শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য মূলে একই বস্তু বলিয়াই, শরীরের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ। আর মাধুর্য্যের কোনও অবস্থাতেই এই শারীর সম্বন্ধের একান্ত বিলোপ হয় না; নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সম্বন্ধের উপরেই মাধুর্য্যরস ফুটিয়া উঠে। এই সম্বন্ধের প্রথম সূচনাকেই পূর্ব্বরাগ বলে। এই পূর্ব্বরাগ যে ভাবে নায়ক-নায়িকার স্নায়ুমণ্ডলকে অধিকার করিয়া, তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাকেই পূর্ব্বরাগের রূপ বলা যাইতে পারে।

রসশাস্ত্রে সচরাচর কেবল নায়ক নায়িকার সম্বন্ধেই পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর পরস্পরের প্রতি প্রথম অনুরাগের সঞ্চার অবধি, প্রথম মিলন বা সম্ভোগ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের যে সকল অবস্থা ঘটে, এ ক্ষেত্রে তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলে। কিন্তু রসশাস্ত্রে এই পূর্ব্বরাগ-শব্দ বিশেষভাবে মাধুর্য্যের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইলেও, বাৎসল্যে বা সখ্যেতেও যে ইহার অনুরূপ একটা অবস্থা নাই, তাহা নহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই, আপনার গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি সন্তানসম্ভাবিতার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব আসক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাই বাৎসল্যের পূর্ব্বরাগ। আর বাল্য-বন্ধুত্বের আস্বাদলাভ যার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সে-ই সখ্যের পূর্ব্বরাগ-বস্তুটা যে কি, ইহাও জানে। মাধুর্য্যের মতন, বাল্য-বন্ধুত্বের ভিতরেও একটা রূপ-লালসা ও আসঙ্গলিপ্সা লুকাইয়া থাকে। পাঠশালায় শতাধিক বালক এক সঙ্গে পড়ে। ইহাদের মধ্যে হঠাৎ একদিন একটী বালকের মুখ দেখিয়া আর একটী বালকের প্রাণে একটা অভিনব অনুরাগের সঞ্চার হইল। ঐ মুখখানি ধ্যান করিতে তার আনন্দ হয়। এই বালকের সঙ্গ-লাভের জন্য তার অন্তরে একটা পিপাসা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তখনও উভয়ের মধ্যে তেমন পরিচয় হয় নাই। পূর্ব্ব পরিচয় থাকিলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। তখনও ইহারা পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি জড়াজড়ি করিতে আরম্ভ করে নাই; অথচ তাহা করিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই যে অবস্থা ইহাই সখ্যের পূর্ব্বরাগ। এ অবস্থায় লালসা ও ভয়, সাহস ও লজ্জা, আস্থা ও সন্দেহ, এই সকল পরস্পর-বিরোধী ভাব প্রাণটাকে তোলপাড় করিতে থাকে। এই লোভ ও ভীতি, আশ্বাস ও সন্দেহ মিলিয়া তার শরীর-মনে একটা চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এই উদ্বেগ তার মুখে, এই চাঞ্চল্য তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া, সখ্যরতির পূর্ব্বরাগের বিশিষ্ট রূপটীকে গড়িয়া তোলে। আর এই সখ্যরতি যখন খুব বলবতী হইয়া উঠে, তখন তাহাতেও মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের মতন, স্বেদকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিকীভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রণয়ী

* রসের রূপ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শনে ১৩১৯ সালের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইয়েছে— (১) বাৎসল্য—পৌষ, (২) দাস্য ও (৩) সখ্য—মাঘ; (৪) (৫) (৬) মাধুর্য্য—১৩২০—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।

জনের রূপ দেখিয়া, আর কখনও বা না দেখিয়াও, তাঁর রূপগুণের কথামাত্র শুনিয়াই, সখ্যের এবং মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। কিন্তু বাৎসল্যের পূর্ব্বরাগের এরূপ কোনও প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা থাকে না, থাকা অসম্ভব। তবে সন্তান ধারণ করিয়াই, সন্তান-সম্ভাবিতার শরীরের, বিশেষতঃ তাঁর স্নায়ু-মণ্ডলের, এমন সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে, যাহাতে অজাত সন্তানের প্রতিও গর্ভ-ধারিণীর অন্তরে একটা স্বাভাবিকী আসক্তি জন্মিতে থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তিও বাড়িয়া চলে, এবং সন্তানসম্ভাবিতা জননীর প্রাণে গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি একটা প্রবল মমতা জাগিয়া উঠে। এই মমতা হইতেই এই সন্তানের মুখ দেখিবার জন্য লালসার উদয় হয়। এই লালসায় তখন আসন্ন-প্রসবা জননীর সমুদায় শরীরকে যেন এক অভূতপূর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। আর, যেখানে আশা সেইখানেই আশঙ্কা, যেখানে লোভ সেইখানেই ভয়, যেখানে ঔৎসুক্য সেইখানেই উদ্বেগ ও ভাবনা জাগিয়া উঠে। অজাত সন্তান সম্বন্ধে শত আশা, শত আশঙ্কা, শত সুখ-কল্পনা, শত দুঃখভীতি, এ সকলে মাতার মনকে অধিকার করিয়া, তাঁহাকে অধীর করিয়া তোলে। সন্তান বালক হইবে, না বালিকা হইবে; সুন্দর, সুস্থ, সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ হইবে, না কুৎসিত, রুগ্ন, অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইবে; সে দীর্ঘায়ু হইবে, না স্বল্পায়ু হইবে, এই সকল চিন্তায় মাতার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপে কখনও কখনও সন্তানসম্ভাবিতাকে গর্ভস্থ শিশুর ধ্যানে তন্ময় করিয়া ফেলে। এই তন্ময়ত্বহেতু গর্ভবতী রমণীগণ কখনও বা অমনস্ক, কখনও বা সমনস্ক; কখনও বা চঞ্চল, কখনও বা ধীর; কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। আর এই ধ্যান খুব গভীর হইলে, অজাত সন্তানের ভাবনায় জননীর অঙ্গে হর্ষদৈন্যপুলকবিবর্ণাদি সাত্ত্বিকী ভাবেরও প্রকাশ হইতে পারে। সন্তানের জন্মের পূর্ব্বে, জননীর অন্তরে বাৎসল্যের এই সকল প্রকাশই, এই রসের পূর্ব্বরাগ। অতএব কেবল মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার-রসেরই একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে, সখ্যের বা বাৎসল্যের কোনও পূর্ব্বরাগ নাই, এমন বলা যায় না। তবে মাধুর্য্য সকল রসের সেরা ও সর্ব্বাপেক্ষা জটিল বলিয়া, প্রত্যেক অবস্থাতেই এই রসের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি, আনন্দ এবং বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, সখ্যে বা বাৎসল্যে যে তাহা হয় না, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

রসতত্ত্ববিদেরা শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদে রসের পর্য্যায় নিরূপণ করিতে যাইয়া, প্রথমে সখ্য, তারপর বাৎসল্য, এবং সর্ব্বশেষেই মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা সত্য। ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এ সকল রসকে পৃথক্ করিয়া, সকল রসের একটা সমী-করণ ও নিজস্ব-পর্য্যায়-নিরূপণ করিতে হইলে, যেটী অপেক্ষাকৃত সরল, তাহাকেই সকলের নিম্নে, আর যেটী সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, তাহাকেই সকলের মাথায় বসাইতে হয়; ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এবং—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে"—এই সূত্র ধরিয়াই আমাদের রসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-ভক্তেরাও বাৎসল্যকে মাধুর্য্যের পূর্ব্বে

এবং সখ্যের পরে বসাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিজ নিজ জীবনের বিবর্ত্তনধারাতে এই সকল রস, এই ক্রমের অনুসরণ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। আমরা সকলের প্রথমে, যত সামান্য পরিমাণে হউক না কেন, দাস্যরসেরই আস্বাদন করিয়া থাকি। কারণ, আমাদের প্রথম আসক্তি পিতামাতার উপরে, কিম্বা পিতৃমাতৃস্থানীয় পরিচারক ও পরি চারিকার উপরেই জন্মিয়া থাকে এবং এই আসক্তির মধ্যে দাস্যরতির প্রাণ যে দুইটী বস্তু—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও আনুগত্য—সেই দুইটীই স্বল্লাধিক বিদ্যমান থাকে। আশ্রয়-আশ্রিত ভাবটা, অতি অলক্ষিতে হইলেও, শৈশবের পিতৃমাতৃভক্তির মধ্যে সর্ব্বদাই লুকাইয়া থাকে। তার পরে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে, নবযৌবনের প্রথম মলয়নিঃস্বনে যখন শরীর-মনের কুঞ্জে কুঞ্জে নূতন প্রাণতা ও নূতন উল্লাস স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং যখন আমরা, বাসন্তী বনস্থলীর ন্যায়, নিজেদেরে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠি; তখন ইচ্ছা হয়—

ঘর করি বাহির, বাহির করি ঘর,
পর করি আপন, আপন করি পর।

আর এই যে পরকে আপন করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহা হইতেই সখ্যরতির জন্ম হয়। বাসন্তী বনস্থলী যেমন আপনি আপনার অভিনব উল্লাস ও কর্ম্মচেষ্টার ভাব নিজে বুঝে না, কেন যে তার শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়া উঠে, নীরব আকাশ বিহগের কলকণ্ঠে ও ভ্রমরগুঞ্জনে সঙ্গীত-মুখরিত হইয়া উঠে, কেন যে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে, চারিদিকে সৌরভ ছুটে, এ সকল কিছুই জানে না; আমরাও অনেক সময় প্রকৃতি দেবীর এই অপূর্ব্ব বসন্তোৎসবের বরণকিরণগন্ধে ও সঙ্গীত-চ্ছন্দেই কেবল মুগ্ধ হইয়া থাকি, কিন্তু তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম যে কি, ইহার অনুসন্ধান করি না। সেইরূপ প্রথম-যৌবন-সঞ্চারে আমাদের শরীর-মনে যে অভিনব ভাবের উদয় হয়, তাহার আনন্দ এবং উল্লাসটুকুই কেবল আমরা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তাহার ভিতরে যে নিগূঢ় কলাকৌশলটী লুকাইয়া আছে, তাহা ধরিতে চাহিও না, পারিও না। ফলতঃ প্রকৃত মর্ম্ম কিন্তু দু'এরই এক। ঐ বাহিরের নৈসর্গিকী বাসন্তী লীলার যে অর্থ, জীবের শরীর মনের এই যৌবনলীলারও সেই অর্থ। দুই-ই এককে বহু করিবার, সঙ্কীর্ণকে বিস্তীর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতির অদ্ভুত কলাকৌশল মাত্র। ভৃঙ্গের পায়ে জড়াইয়া, প্রজাপতির পালকে চড়াইয়া, উদ্ভিদেরা আপনার প্রাণ কেশরগুলিকে বনময় ছড়াইবার জন্যই, রূপের হাট খুলিয়া, মধুগন্ধ বিলাইয়া, বাসন্তীলীলাতে নিযুক্ত হয়। আর আমরাও সখ্য ও মাধুর্য্য-রতিকে জাগাইয়া, তার সাহায্যে আপনাদিগকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাতেই, সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে, নবযৌবনের রূপরসের পসরা খুলিয়া বসি।

যৌবনের সূচনাতেই সখ্যরতির সঞ্চার হয়। তার পরে, যৌবনের প্রস্ফুট পূর্ণতায়, যাহা মাধুর্য্য-রসের ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করিবে,—সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যারও এই সখ্যরতিতেই "হাতে খড়ি" আরম্ভ হয়। এই জন্য মাধুর্য্যের অনেকগুলি ভাববিভব এবং কলাকৌশল সখ্যেতেও ফুটিয়া উঠে। রূপ-লালসা এবং

আসঙ্গলিপ্সা মাধুর্য্যের প্রাণ। এই রূপ-লালসা এবং আসঙ্গলিপ্সা সখ্যেরও প্রধান প্রেরণা এবং উপজীব্য। দেহাশ্রয় ও রূপজ মোহ ব্যতীত সখ্যরতির সঞ্চার হয়, এ কল্পনা অসত্য। যৌবনান্তে বা যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি হইলেও বহুলোকের সঙ্গে আমরা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হই বটে, এবং প্রচলিত ভাষায় অনেক সময় এই সকল আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সখ্য নামও দিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহা সখ্যরতি নহে। সেবা, কল্যাণ-কামনা, চিন্তা ও ভাবের বিনিময়, সংসারের কর্ম্মে ও অবসরের আমোদ-প্রমোদে পরস্পরের সাহায্য —এ সকলই এই আত্মীয়তার সম্বন্ধের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তথাপি ইহা প্রকৃত সখ্য নহে। আর, এই সম্বন্ধের মধ্যে রূপের ভোগ ও একান্ত আসঙ্গলিপ্সা থাকে না বলিয়াই ইহাকে সখ্য বলা সঙ্গত নহে। প্রকৃত সখ্য কৈশোর-ধর্ম্ম। দেহের তারুণ্য ও লাবণ্য ইহার প্রধান উদ্দীপনা। বিগত-কৈশোরের প্রণয়ের সম্বন্ধেতে প্রণয়ী জনের দেহের প্রতি কোনও প্রকারের লোভ থাকে না। তাঁর হাতখানি ধরিয়া, সে স্পর্শসুখে নীরবে ডুবিয়া যাইবার কোনও সাধ, তাঁর অনাবৃত দেহের সুদৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কোনও লালসা—হয় না। তাঁর অবিরল সান্নিধ্য লাভ না করিলে, কাছে থাকা ব্যর্থ হইয়া গেল, এমনটা মনে হয় না। অথচ এইগুলি সখ্যরতির নিত্যধর্ম্ম। এই ঘনিষ্ঠ দেহ-সম্বন্ধ-নিবন্ধনই সখ্যরতির মধ্যে আমরা মাধুর্য্যরসের পূর্ব্বাস্বাদ লাভ করিয়া থাকি। এই জন্যই সখ্যরতিরও ঠিক মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের মতন একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে।

আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাহিত্যে সখ্য-বাৎসল্যাদি রসের যেমন অদ্ভুত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইয়াছে, জগতের আর কোনও সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত সেরূপ হইয়াছে বলিয়া জানি না ও শুনি নাই। আর আমাদের বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণ এ সকল রসের রূপ যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, অন্য কোনও কবি-সমাজ সেরূপ ফুটাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রভৃতির বর্ণনা যেমন বৈষ্ণব কবিতায় আছে, তেমন আর কোনও কবিতায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণও সখ্যের পূর্ব্বরাগের কোনও চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। গোষ্ঠলীলায় সখ্যের সম্ভোগের এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইলে শ্রীদামাদির বিরহের বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ রসের মধ্যেও যে পূর্ব্বরাগ এবং মানাদির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কোনও চিত্র অন্ততঃ এপর্য্যন্ত আমার চক্ষে পড়ে নাই। অথচ এই রসের যে একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। আর এই পূর্ব্বরাগের সঙ্গে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের সাদৃশ্য অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

দর্শন বা শ্রবণ এই দুই সূত্র অবলম্বনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। রূপ-দর্শন বা গুণ-শ্রবণ, এই দুই কারণেই,—যাঁর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, কিম্বা গুণের কথা শুনিয়া যাঁর প্রতি প্রাণে একটা আসক্তির সঞ্চার হইল—তাঁর সঙ্গলাভের জন্য লোভ জন্মে। এই লোভেরই নাম পূর্ব্বরাগ। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য

শ্রবণে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে—

সই ! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো!
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো!
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো!
কেমনে পাইব সই, তারে?

অন্যদিকে বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎদর্শন হইতেই সঞ্জাত হয়—

নাহি উঠল তীরে, রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে, লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরয় বয়ান।
সখিহে, অপরূপ চাতুরী গোরী!
সব জন তেজিয়া, আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি।
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল,
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল।
নয়ন চকোর, কানুমুখ শশিবর
করল অমিয়া রসপান।
দুহু দোহাঁ দরশনে, রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাল জান॥

প্রথমে তাঁর নামগুণ শুনিয়া চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়াছেন, তারপর চিত্রপটে কৃষ্ণ-প্রতিকৃতি দেখিয়া, সে অনুরাগ বাড়িয়া যায়; এবং সর্ব্বশেষে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া, সে রূপসাগরে কুলশীলমান ধরম-করম সকল বিসর্জ্জন দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ফলতঃ দর্শন ও শ্রবণ দু'ই পূর্ব্বরাগের সমান বাহন। তবে উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদও আছে। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা ঐ প্রথম দর্শন-লাভের পরেই সখীকে কহিতেছেন:—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ।

কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণরূপে যেমন পাগল করিয়া তুলিয়াছে, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকাকে তেমন করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, সাক্ষাৎদর্শনের পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মতন, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা সে রূপকে এমন করিয়া আপনার ধ্যানের বিষয় করেন নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীমতী প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ শুনিয়া মুগ্ধ হন। এই নাম-গুণই তাঁর অনুরাগের প্রথম আশ্রয় ও উপজীব্য হয়। কিন্তু নাম শুনিয়া তিনি কেবল নাম লইয়াই পড়িয়া রহেন নাই—কেহই পড়িয়া রহে না। তিনি সেই নামকে আপনার জপমালা করিলেও, আপনার অন্তরে যে সহজ শ্রেষ্ঠতম রূপের আদর্শ ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে জাগাইয়া, সেই নামের উপরে আপনার নবীন অনুরাগের তুলিকা লইয়া সে নবীন রূপকে আঁকিয়া নামের সঙ্গে তারও ধ্যান আরম্ভ করিলেন। মানুষের প্রাণ, জগতের সকল রূপের সার ছানিয়া, আপনার মনের মাঝে তার নিজের সৌন্দর্য্যের আদর্শকে ফুটাইয়া তোলে ও জাগাইয়া রাখে। তার চক্ষে এ রূপের তুলনা জগতে মিলে না। আর আপনার অন্তরের এই অতুলনীয় রূপ

দিয়াই চণ্ডীদাসের শ্রীমতী শ্যামনামের উপরে শ্যামরূপের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপর চিত্রপট-দর্শন। পটের ধর্ম্মই এই যে, তাহা কোনও বস্তুর সমগ্রকে কিছুতেই প্রকাশ করে না ও করিতে পারে না। যে রূপ পটে ফুটিয়া উঠে, তার পশ্চাতে তার শতগুণ, সহস্রগুণ রূপ অস্ফুট থাকিয়া, কেবল যেন চারিদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। প্রথমে যেমন নাম শুনিয়া সেই নামের উপরে শ্রীমতী আপনার অন্তরের সৌন্দর্য্যের ছবিটী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ চিত্রপট দেখিয়াও সেই পটের অস্ফুট রূপের উপরে আপনার অন্তরের রূপের চিরন্তন আদর্শের রসান মাখাইয়া দিলেন। ইহার পরে যখন তাঁর সাক্ষাৎদর্শনলাভ হইল, তখন সে প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের ধ্যানের রূপটী মিলিয়া মিশিয়া, ভিতরবাহির, চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ উভয়কে এক করিয়া দিল। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া

কি কহব রে সখি কানুক রূপ !
কো পতিয়ায়ব স্বপনস্বরূপ !

ইহার চাইতে কোনও বড় কথা আর কহিতে পারিলেন না। তার পরে যাহা কিছু রূপবর্ণনা করিলেন, সকলই যেন ভাসা-ভাসা, কেবল কবিত্বের চাতুরী, উপমার ছলাকলা মাত্র। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা পূর্ব্ব হইতেই গভীর ধ্যানযোগে ও মানস-সম্ভোগের দ্বারা সে স্বপ্নকেই প্রত্যক্ষ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং সাক্ষাৎদর্শনে তাঁর স্বপ্নাবেশ হইল না; বরং তন্দ্রা টুটিয়া গিয়া সজাগ দৃষ্টিতে সে সত্যরূপ দেখিয়া, তিনি সজ্ঞানে তাহার পদে আপনার তনু-মন-প্রাণ সকলি সমর্পণ করিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার দৃষ্টি পরিষ্কার, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আর ছায়ার মতন দেখেন নাই!

শ্যামের বদনের ছটায় কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদইছে যেন শশী রবি।
সই কিবা সে শ্যামের রূপ
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা।

অন্যত্র—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।
* * * * * *
দুইটী মোহন নয়নের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে।

দর্শন ও শ্রবণ—রূপদর্শন এবং নামগুণ-শ্রবণ—ইহা হইতেই পূর্ব্বরাগের জন্ম হয়। সখ্যের পূর্ব্বরাগ প্রায় সর্ব্বদাই রূপদর্শনে জাগ্রত হয়। মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগ দর্শন ও শ্রবণে—আর আমাদের দেশে বিশেষতঃ প্রিয়জনের নামগুণ শুনিয়াই জাগিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই পূর্ব্বরাগেরও একটা পূর্ব্বাবস্থা আছে। যৌবন ফুটিতেছে অথচ বাল্যও একেবারে চলিয়া যায় নাই, এই বয়ঃসন্ধিকালেই সখ্যের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। এই সময়ে বাল্য-বন্ধু ও বাল্যসহচরীগণই আমাদি

প্রেমের প্রধান আলম্বন ও উপজীব্য হইয়া কেন। তখনও মাধুর্য্যের ভূমি প্রস্তুত হয় নাই। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ—প্রজনন-হেতুই কাম বা কন্দর্প ভগবানের বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হয়। আর এই প্রজনন-চেষ্টা হইতেই শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য-রসের উৎপত্তি হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের শরীর-মনের অবস্থা প্রজনন-ক্রিয়ার উপযোগী হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে মাধুর্য্যের ভূমিও প্রস্তুত হয় না। অতএব ফুটনোন্মুখ যৌবন যেমন সখ্যরতির আশ্রয়, সেইরূপ প্রস্ফুট যৌবনই কেবল মাধুর্য্যের আশ্রয় হইয়া থাকে। যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বে সখ্য-রতিই জন্মিতে পারে, কিন্তু মাধুর্য্য জন্মিতে পারে না। সেইরূপ আবার যৌবন একেবারে নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আর প্রকৃত মাধুর্য্য ফুটিবার অবসর পায় না। যে সকল সমাজে অতীত যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, সেখানে আমাদের রস-শাস্ত্রে যাহাকে পূর্ব্বরাগ বলিয়াছেন, তার সত্য স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটিতে পারে না। একদিকে একটা বলবতী লালসা, অন্যদিকে একটা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা,—এই দুই ভাব মিলিয়া যে গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, তাহাই পূর্ব্বরাগের প্রাণ। জীবনের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা স্বল্পবিস্তর স্থিরবুদ্ধি জন্মিতে আরম্ভ করে। আর পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল অবস্থায় যেরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, এবারেও তাহার অনুরূপ অবস্থায় সেইরূপ পরিণতিই ঘটিবে, এই যে ধারণা, ইহা হইতেই অনাগত বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ কমিয়া আইসে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের সংসারের ভাবনা ও কর্ম্মচেষ্টা যতই প্রবল হউক না কেন, প্রথম বয়সের অসহ্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যে ক্রমে কমিয়া আইসে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। এবং এই জন্যই পরিণত যৌবনে বা যৌবনান্তে আমাদের জীবনে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগ ফুটিয়া উঠিবার উপযোগী ভূমি ও অবসর প্রাপ্ত হয় না।

প্রথম যৌবনের সূচনায় আমরা একটা অনন্ত অজ্ঞাত রাজ্যের সীমাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াই। আমাদের শরীরের মধ্যে তখন একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে—এই অভিনব উল্লাস ও বিবর্ত্তন-স্রোতে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে, ইহা আমরা তখনও জানি না। জানি কেবল একটা নূতন শক্তির জাগরণ, একটা নূতন আনন্দের সঞ্চার, একটা নূতন রূপের বিকাশ, একটা নূতন ভোগের পিয়াসা। এই যৌবন যখন আপনার নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, এই বিকাশ যখন বন্ধ হইয়া যায়,—ইন্দ্রিয়ের লালসা মাত্র তখন থাকে, কিন্তু পূর্ব্বকার সে রস বা রোম্যান্স-টুকু আর থাকে না। ফলতঃ অজ্ঞাতের আশ্রয় ব্যতীত কোথাও সত্য রস বা রোম্যান্স (Romance) ফুটিতে পায় না। অজ্ঞাতই রসের বা রোম্যান্সের নিত্যভূমি। যে দম্পতি পরস্পরকে একান্তভাবে জানিয়া ফেলিয়াছেন, যাহাদের পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের রূপের, গুণের, চিন্তার, ভাবের, আচার-আচরণের মধ্যে অজানা কোনও কিছু থাকে না,—যাঁরা পরস্পরের সম্বন্ধে সত্যভাবে সর্ব্বদা ইহা অনুভব করেন না যে—"জানি

জানি মনে জানি, কিন্তু আমি জানিনে"
চিনি চিনি মনে চিনি, কিন্তু আমি চিনিনে"—তাঁদের দাম্পত্য সম্বন্ধে রস বা রোম্যান্স (Romance) আর থাকে না। যতদিন ঐ অজানা জগৎটা পরস্পরের রূপের, গুণের, আচার-আচরণের মধ্যে একে অন্যের চক্ষে নিয়ত জাগিয়া থাকে, ততদিনই প্রকৃত পক্ষে তাহাদের দাম্পত্য-প্রেমে মাধুর্য্য-রস বিদ্যমান থাকে। সব জানা হইয়া গেলে, কামের সন্ধুক্ষণ-নিবৃত্তি না হইলেও, প্রেমের সন্ধান আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন নিতান্ত সাধুলোকের মধ্যেও, প্রেমের ডোর ছিঁড়িয়া গিয়া, কেবল সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য বন্ধন মাত্র অবশিষ্ট রহে। কেবলমাত্র কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, কিম্বা শুদ্ধ প্রজননক্রিয়া-সম্পাদনার্থে যৌবন একান্ত আবশ্যক নহে। কিন্তু মাধুর্য্যের জন্য তাহা নিতান্তই প্রয়োজন এই জন্যই চণ্ডীদাস কিশোরা-কিশোরীর যুগল-মূর্ত্তিকে মাধুর্য্যের আধার ও আশ্রয় বলিয়াছেন।

কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন।

কিন্তু এখানে কিশোরা কিশোরী বলিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা বুঝিলে চলিবে না। প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তই কৈশোরকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণের, বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের, পরিভাষায় ইহাকে কৈশোর না বলিয়া বয়ঃসন্ধি বলাই সমধিক সঙ্গত। আর বয়ঃসন্ধিকালে সখ্যরতিরই সঞ্চার ও বিকাশ সম্ভব, মাধুর্য্যরসের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। ফলতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও শ্রীমতীর যে রূপবর্ণনা আছে, তাহা হইতে তাঁহাকে কোনও মতেই অপ্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার ছবি নহে, কিন্তু প্রস্ফুট-যৌবনা রমণীরই ছবি।

তাড়ত বরণী, হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি
কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপরে চূড়াটি বসালে
সে আর অধিক ভাগে॥

অন্যত্র—

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহ পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেমহার দোলে,
সুমেরু শিখর জানি॥

আবার অন্যত্র আছে—

থির বিজুরী বদন গোরী
পেখনু ঘাটের কূলে।

কানড়া ছাঁদে,　　কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে ॥
সই মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে　　ঈষৎ হাসিয়া
আকুল করিল মোরে ॥
ফুলের গেড়ুয়া,　　লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচ কুচ যুগ,　　বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস ॥

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন :—

শ্রীফল যুগল,　　জিনি কুচ যুগ
পাতলা কাঁচলি তাকে।
তাহার উপরে,　　মণিময় হার
উপমা কহিব কাকে ॥

শ্রীকৃষ্ণমুখে শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনার সকলের শেষ পদটী এই—

কনক বরণ　　কিবে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত,　　চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর।
সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর,　　পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল পশি ॥
গলার উপর,　　মণিময় হার
গগন মণ্ডল ফেরু।
কুচযুগ গিরি,　　কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু ॥
গুরু উরুতে,　　লম্বিত কেশ—
ইত্যাদি।

নায়কের পূর্ব্বরাগের বর্ণনায়, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধিকার যে রূপের বর্ণনা এখানে করিয়াছেন, প্রচলিত অর্থে তাহা কৈশোর রূপ হইতেই পারে না। একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তও অঙ্গ-গঠনের এতটা বিকাশ প্রায় হয় না। গুরুনিতম্ব, পীনপয়োধর প্রভৃতি প্রস্ফুটযৌবনেরই লক্ষণ, বিকাশোন্মুখ যৌবনে ইহা পাওয়া যায় না। অতএব চণ্ডীদাসের কৈশোর কাল কিছুতেই একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না। কদাচিৎ কোনও স্থলে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার মধ্যে এতটা অসাধারণ অঙ্গবিকাশ দেখা গেলেও, সচরাচর আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ এবং শীতপ্রধান য়ুরোপে অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্তই চণ্ডীদাস কৈশোর-নামে যে প্রস্ফুট যৌবনের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। চণ্ডীদাসের কিশোরী অঙ্কুরিতযৌবনা বা সদ্যোভিন্নযৌবনা নহেন, কিন্তু প্রস্ফুট বা বিকাশতযৌবনা। তাঁহার কিশোরও সেইরূপ বালক নহেন, কিন্তু যুবক। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। সাক্ষাদ্দর্শনের পরে শ্রীমতী সখী সম্বোধনে বলিতেছেন—

সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥
এ বড় কারিকরে　　কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম,　　ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে ॥

অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে, লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা ॥

আর একবার শ্রীমতী কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

অতি সে শোভিত, বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল, শোভি আছে ভাল
উপজে মদন বিকার ॥
নাভির উপরে জনু, তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিকর, কুন্দিয়াছে ভাল
বাম কদলী শোভা ॥

অন্যত্র —

বিম্বফল জিনি কে বা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড।
কম্বু জিনিয়া কে বা, কণ্ঠ বনাইল রে,
বিস্তারি পাষাণে কে বা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কে বা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥
আচলি উপরে কে বা, কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কে বা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥

যেমন শ্রীমতীর গুরুনিতম্ব পীনপয়োধর প্রভৃতি, প্রচলিত অভিধানে যাহাকে কৈশোর বলে, তাহার লক্ষণ নহে; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তারিত বক্ষ, নাভি, লোমলতাবলী, কদলি-সম উরুযুগ, এই সকলও কৈশোরের ছবি নহে। চণ্ডীদাসের শ্রীমতীর রূপবর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা উভয়ই তাঁর নায়ক-নায়িকার কোমল কৈশোরের নহে, কিন্তু প্রস্ফুট যৌবনেরই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেমন, বিদ্যাপতির পদাবলীতেও সেইরূপই, প্রথম দর্শনের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা পরস্পরের যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কৈশোরাবস্থার নহে, কিন্তু প্রস্ফুটযৌবনেরই পরিষ্কার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনের পরে বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

উরহি অঞ্চল, কাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে, শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু ॥

অন্যত্র বলিতেছেন—

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি-হারা।
কামকম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা ॥

আবার—

অপরূপ-রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখলু গজরাজ-গমনি ধনী ॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তনু অতি কোমলিনী
কুচ-ছিরি-ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি ॥

পীনপয়োধর, গুরুনিতম্ব, সরভাদ—এ

সকলের কোনটাই কৈশোর-লক্ষণ নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি পূর্ব্বরাগ বর্ণনার পূর্ব্বেই বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করিয়া, পূর্ণ ও প্রস্ফুট যৌবনের পূর্ব্বে যে মাধুর্য্যের সম্ভব অসম্ভব ইহা স্পষ্টতঃই বলিয়া গিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণের কিশোর-কিশোরীকে আধুনিক বাঙ্গালা অভিধানের অর্থে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বা অস্ফুটযৌবন মনে করা কোনও মতেই সঙ্গত নহে। তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনার সঙ্গে এই অর্থের কোনও প্রকারের সঙ্গতি হয় না।

ফলতঃ প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে যাহাকে কৈশোর বলে, বিদ্যাপতি তাহাকেই বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। এই কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিকালে সখ্যরতিরই জন্ম হয়, মাধুর্য্য জন্মে না। এই কৈশোরে মানুষ জ্ঞান ও অজানার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের গোধূলী লগ্নে আসিয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞাতের ছটা আসিয়া তখন যাবতীয় জ্ঞাতকে উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করে। উন্মেষোন্মুখ যৌবনের প্রথম মলয় নিশ্বাসে তখন একটা অভিনব রূপ-লালসা ও আসঙ্গলিপ্সা শরীর-মনকে চঞ্চল করিতে আরম্ভ করে। তখনও কিন্তু জননে-ন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। প্রজনন-প্রয়োজনে প্রস্ফুট যৌবনে জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে পূর্ণতাপ্রাপ্তি অত্যাবশ্যক, সে পূর্ণতা তখনও ফুটিয়া উঠে নাই; তার অঙ্কুর মাত্র সবে জাত হইতেছে। ভিতরে ভিতরে তখন সবে এই নবযৌবনের সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই সাড়ার মর্ম্ম সম্যক উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই বয়ঃকালকেই আমাদের দেশের রসতত্ত্ব-বিদেরা বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। তখন মানুষ না পুরুষ না স্ত্রী; না রমণ, না রমণী। এই বয়ঃসন্ধিকালেই সখ্যরতির উপযোগী যুগ। এই বয়ঃসন্ধিকালেই ইংরেজিতে যাহাকে school boy কিম্বা school girl love বা friendship বলিয়া থাকে, তার জন্ম হয়। তখনও মাধুর্য্যের আশ্রয় যে শৃঙ্গাররতি তার প্রেরণা জাগে নাই, অথচ উষার প্রথমতম আভাসের মতন, এই অপূর্ব্ব, অজ্ঞাত রসের একটা ঈষৎ-আভা শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদেরে চিনি নাই ও বুঝি না; কেবল প্রতিদিন নূতন নূতন রূপরসের বিকাশ অনুভব করিয়া কেমন একটা অজানাভাবে বিভোর হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের দেহেতে এই উন্মেষোন্মুখ যৌবনের নিত্য নবরূপের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া নিজেরাই বিস্মিত হইয়া, চকিত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া, বারম্বার তাহারই ধ্যান করিতে থাকি। এই ধ্যান হইতে এই শরীরের প্রতি একটা অভিনব মমতা, এই দেহের স্ফূর্ত্তি ও কান্তি-সাধনের জন্য একটা অভিনব প্রসাধন-প্রয়াস প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমরা নিজেরা নিজেদের রূপেরই সম্ভোগ করিতে থাকি। এই রূপে তখনও অপর কাহারও অধিকার হয় নাই। ইহাই বয়ঃসন্ধির অবস্থা। এই অবস্থাতেই আমাদের শরীর-মনেতে ক্রমে ক্রমে মাধুর্য্যের ভূমি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে।

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বয়ঃসন্ধির কোনও বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। অথচ রসের সকল রূপকে ভাল করিয়া ফুটাইতে হইলে, যেমন নায়িকার সেইরূপ

নায়কেরও বয়ঃসন্ধির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করা আবশ্যক হয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই এই বয়ঃসন্ধির সঙ্গে পরবর্তী পরিস্ফুটযৌবনে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের যে সকল রূপ ফুটিয়া উঠে, তার অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির কোনও ছবি বৈষ্ণব-পদাবলীতে না থাকিলেও, বিদ্যাপতি ঠাকুর শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধির অতি অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের আর কোনও সাহিত্যে ইহার অনুরূপ কোনও কিছু পাওয়া যায় বলিয়া এখনও জানি না। আর পূর্ব্বরাগের সত্য রূপটী যে কি, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে হইলে, প্রথমে এই বয়ঃসন্ধিকালে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এই সকল ভাবই পরিস্ফুট-যৌবনের তাড়িতসঞ্চারের দ্বারা রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত হইয়া, পূর্ব্বরাগের স্বরূপকে ফুটাইয়া তোলে। শৈশব ও যৌবনের মিলন-কালকেই এই বয়ঃসন্ধি বলা হয়।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি, লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত, হাসত, পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরীসম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ॥

অন্যত্র—

খণে খণে নয়ন কোণ অনুসরই।
খণে খণে বসনধূলি তনু ভরই॥
খণে খণে দশন ছটাছট হাস।
খণে খণে অধর আগে করু বাস॥
চমকি চলয়ে খণে, খণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
খণে আঁচর দেই, খণে হোয় ভোর॥

আবার—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥
থির নয়ন অথির কছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

তার পরে যখন যৌবন আর একটু ফুটিয়া উঠিল, তখন এ সকল ভাবেরও একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল, উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহ নত কর মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥

তার পরে, যৌবন যখন আরো প্রস্ফুট হইল তখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীট।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

কেমন করিয়া ধীরে ধীরে শৈশব সরিয়া যায় ও যৌবন আসিয়া তার স্থান অধিকার করে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীরাধিকার এই বয়ঃসন্ধির চিত্রেতে তাহা অতিশয় বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর

"জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান"

এই পদেতে বিদ্যাপতি ঠাকুর এ বয়ঃসন্ধির সঙ্গে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গারের সম্বন্ধ কি ও কতটুকু তাহা অদ্ভুত কলাকুশলতা সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শৈশবে আমাদের দেহমনে মদনের কোনও সাড়া পড়ে না। শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য কাকে বলে তখন আমরা তার কোনও কিছুই জানি না। কিন্তু এই বয়ঃসন্ধিকালে, আসন্ন যৌবনের পূর্ব্বভাগে শরীর মনের যখন একটা নূতন বিকাশ আরম্ভ হয়, তখনই প্রথমে মনসিজ জাগিতে আরম্ভ করে, কিন্তু চক্ষু খোলে না। ভিতরে ভিতরে তার জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বহিশ্চৈতন্যে প্রকাশ হয় নাই। ফলতঃ কোনও বহিঃস্থ মানুষী রূপের প্রেরণা ব্যতীত মনসিজ কখনও এই বহিশ্চৈতন্য লাভ করে না। এইরূপ চাক্ষুষই হউক বা কেবল কল্পিতই হউক,—ইহার প্রেরণা মনসিজের নয়নোন্মীলনের জন্য অত্যাবশ্যক। আর কল্পিতরূপও প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত ফুটে না। কারণ স্থানবিশেষে, কালবিশেষে, আধারবিশেষে যে রূপ প্রত্যক্ষ হয়, অন্যস্থানে, অন্যকালে, অপর আধারে, যেখানে তাহা প্রত্যক্ষ নাই, সেখানে তার আরোপ বা অধ্যাস করিয়াই আমরা সর্ব্ববিধ কাল্পত রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এইরূপে বিশেষ রূপের প্রত্যক্ষ বা কল্পনা ব্যতীত মনসিজের মুদিত-নয়ান খোলে না। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার জাগ্রত কিন্তু নিমীলিতনেত্র মনসিজ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনে চক্ষু মেলিয়াছে। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মনসিজের এই নিমীলিত নেত্র প্রথমে শ্রীমতীর অন্তরের ধ্যানমূর্ত্তি ভাবিয়া, ও পরে চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শনলাভে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হইয়া খুলিয়া যায়। কিন্তু উভয়-ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালে তাহা জাগ্রত অথচ নিমীলিতনেত্র হইয়া ছিল।

বিদ্যাপতি ঠাকুর পূর্ব্বরাগের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধির এই অনুপম চিত্র আঁকিয়া, মাধুর্য্যের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, শরীরের ও স্নায়ুমণ্ডলের কোন্ অবস্থাকে কিরূপে কোন্ দিক দিয়া অবলম্বন করিয়া এই উন্নত উজ্জ্বল রসশ্রী তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তাহার বিবর্ত্তন-ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বটীও অতি পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এইখানেই আমরা পূর্ব্বরাগের মনস্তত্ত্বের বা psychology'র সন্ধান প্রাপ্ত হই। আর এইখানেই আমরা অতি পরিষ্কাররূপে এটী দেখি যে, প্রস্ফুট যৌবনে ভিন্ন মাধুর্য্যের সত্য আশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। শ্রীরাধিকার যখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

আর এইরূপে শৈশব যৌবনের দ্বন্দ্বেতে যখন যৌবন সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল এবং শৈশব সদলবলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল,—অর্থাৎ যৌবনের পূর্ণ ও অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব যখন তাঁর দেহ-মনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল,—তার পরেই যমুনা-স্নানে যাইয়া কানু-দরশনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

বুড়া বয়সে কলম ধরিতে যাওয়াই এক প্রকার বিড়ম্বনা। লিখিতে বসিলে সব কথা সকল সময়ে ঠিক মনে আসে না—আর যদিই বা আসে, ভাল করিয়া গুছাইয়া লেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু তা' বলিয়া জগদীশ বাবুর জীবনবৃত্তান্ত বাদ দেওয়া চলে না। সুতরাং যেখানে যেখানে ত্রুটি ঘটিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

জগদীশ বাবু যখন নোয়াখালিতে, তখন সেই বিভাগে ডরাণ্ট বলিয়া একজন সিভিল-সার্জ্জন ছিলেন, পানাধিক্যের জন্য সাহেবেরা কেহই তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিতেন না, ইনি জগদীশ বাবুর শরণাপন্ন হন, জগদীশ বাবুও ইঁহাকে সহায়তা করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর জগদীশ বাবুর নিকটে আসিয়া কি চাহেন, জগদীশ বাবু তাহা দিতে স্বীকৃত হন নাই, তাহাতে রাগান্ধ হইয়া হস্তস্থিত একটা 'ছপ্‌টি'র দ্বারা জগদীশ বাবুকে আঘাত করিতে যান, ছপ্‌টির অগ্রভাগ জগদীশ বাবুর মুখে লাগে. তিনি ইঁহার মত্ততার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, অন্য কোনও প্রতিবিধান না করিয়া, আর্দ্দালিদের কেবল উঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হুকুম দেন, আর্দ্দালিরা বাহিরে লইয়া গিয়া কিছু শাস্তি দেয়, সাহেব প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

লেফ্‌টেনাণ্ট গবরণর গ্রে সাহেব এ কথা জানিতে পারিয়া, একেবারে ডরাণ্টকে ডিস্‌মিস করেন, নোয়াখালি হইতে আসে, তাহার এমন সংস্থান ছিল না, সুতরাং জগদীশ বাবুর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করে, জগদীশ বাবু তাহার পূর্ব্ব ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, এ রকম উদারতা আজকাল বিরল।

একবার জগদীশ বাবু ময়নাগড়ের রাজা ও তাঁহার দল-বল লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাইতে-ছিলেন, শিয়ালদহ ষ্টেশনে পুলিশ-বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনেরাল কর্ণেল জিউ, ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনেরাল কর্ণেল গর্ডন, পারসনাল আসিষ্টাণ্ট মেজার ডগলাস্‌ কিন্‌সন এবং অপরাপর সাহেব পুলিস-কর্ম্মচারিদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা জগদীশ বাবুকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি অম্লান বদনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটগুলি দেখাইয়া উত্তর করিলেন "আমার বন্ধুদের লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাইতেছি এবং তৃতীয় শ্রেণীর এই টিকিটগুলি ক্রয় করিয়াছি।" কয়জন এ অবস্থায় পড়িলে সত্যকথা বলিতে সাহসী হইতেন?

যখন জগদীশ বাবু নোয়াখালিতে, তখন হুইনফিল্‌ড্‌ বলিয়া একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান কলেক্টর ছিলেন, নিমকসংক্রান্ত কোন বিষয় তাঁহার জানিবার আবশ্যক ছিল, সুতরাং রেভেনিউ বোর্ডে সেই তথ্য জানিবার জন্য লেখেন, আলান্‌জোন্‌স তখন বোর্ডে নিমক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি উত্তর পাঠাইলেন 'নিমকের সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার আবশ্যক হইলে বোর্ডকে লিখিতে হইবে না, ওখানে তোমার যে

পুলিশের কর্ত্তা আছেন, তিনি নিমকসম্বন্ধীয় বিষয়ে এত দক্ষ ও বিজ্ঞ যে, তিনি যাহা বলিবেন সেই মতে যেন কার্য্য করা হয়, বোর্ডকে লিখিবার আবশ্যক নাই, বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট নিমক সম্বন্ধে জগদীশ বাবুর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন।”

হুইন্‌ফিল্‌ড সাহেবের জগদীশ বাবুর উপর এত শ্রদ্ধাভক্তি বর্দ্ধিত হইল যে, তাঁহার স্ত্রীকে জগদীশ বাবুর সঙ্গে এক বোটে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন. আজকাল এমত সৌহার্দ্দ্য বাঙ্গালী-ইংরাজের ভিতর দুর্লভ।

বালেশ্বরে থাকিবার সময় ইনি উড়িয়াদিগের উচ্চ শিক্ষা দিবার এবং সরকারী কার্য্যে ভর্ত্তি করিবার সুব্যবস্থা করেন; বাঙ্গালীরা তখন উড়িয়াদের সুচক্ষে দেখিতেন না, এমন কি উড়িয়া ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা ছিল না, জগদীশ বাবু উড়িয়াদের নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন,তাহাতে বাঙ্গালীরা মনে মনে বিরক্ত হইলেন, যদিও প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে কেহ সাহসী হন নাই। এই সম্বন্ধে বাবু ফকিরমোহন সেনাপতি, বাবু গোবিন্দ দাস এবং মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর অনেক কথা বলিতে পারেন। জগদীশ বাবুর উত্তেজনায় ডিভিসনাল্‌ কমিশনার রেভেনসা সাহেব স্থানীয় সাহেবদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, উড়িয়াদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার পরেই রেভেনসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জগদীশ বাবুর পরামর্শ মত চাঁদবালী বন্দর খোলা হয়, উড়িষ্যার পথে তখন চোর-ডাকাতের বড় ভয় ছিল, যাত্রীদের কাপড়-চোপড় কাড়িয়া কুড়িয়া লইয়া শুধু বদমায়েসেরা যে ক্ষান্ত হইত তাহা নহে, সময়ে সময়ে খুন জখম অবধি করিয়া ফেলিত। অধিকন্তু পথে পীড়া হইলে একেবারে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, জগদীশ বাবু গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডে এমন সুব্যবস্থা করিলেন যে, প্রত্যেক এক ক্রোশ অন্তর একজন কনষ্টবল ও চারিজন পাইক এবং প্রত্যেক তিন ক্রোশ অন্তর একজন হেড্‌ কনষ্টবল, চারিজন কনষ্টবল এবং আটজন পাইক, তাহাদের এলাকার ভিতর চৌকি পাহারা করিত,ইহাদের উপর একজন ইন্‌স্পেক্টর ও দুইজন সব্‌ইন্‌স্পেক্টার খালি জেদগস্ত করিত, স্বয়ং জগদীশ বাবু নিজে ঝুপ ঝাপ করিয়া আজ এখানে কাল ওখানে দেখিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং চুরি ডাকাতী তাঁহার এলাকার ভিতর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সব পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের নিকট জ্বর, কলেরা, রক্ত আমাশয়ের ঔষধ থাকিত এবং পানীয় জলের ইন্দারা অথবা পুষ্করিণী তাহারা একেবারে ময়লা করিতে দিত না। এই প্রকার সুচারু বন্দোবস্তে যাত্রীদিগের বড়ই উপকার হইয়াছিল। ক্রমে কটক এবং পুরীর পুলিশ সাহেবেরা ঠিক ঐ রকম আপন আপন এলাকায় করিয়াছিলেন। এই সময় দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, স্যার রিচার্ড টেম্পল জগদীশ বাবুকে মনোনীত করিয়া দুর্ভিক্ষকার্য্যে ব্রতী করিলেন। তিনি প্রথমতঃ দুইলক্ষ মণ চাউল সংগ্রহ করিবার ভার পান, মালদহ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে চাউল সংগ্রহ করিয়া, উহা দিনাজপুরে গোলাজাত করা হয়, দিনাজ-

পূর্ব্বে চারিমাস ধরিয়া তিনি পুলিস ও দুর্ভিক্ষ উভয় বিভাগেরই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার পর রামগঞ্জে গিয়া একেবারে দুর্ভিক্ষের কর্ম্মে ব্রতী হয়েন। এই রামগঞ্জ মাঠের উপর একটা ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য ইহা আধা সহরে পরিণত হ'ল। 'ফোমেন'কর্ম্মচারীর সুবৃহৎ বাঙ্গালা সম্মুখে সুবৃহৎ তাম্বু খাটান, এই তাম্বুটি অফিসারদিগের জন্য এবেসিনিয়ান এক্‌স্‌পিডিসনে গিয়াছিল, বড় বড় প্রকাণ্ড চালের গোলা, কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার বাসা, খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য দোকান-ঘর প্রভৃতি নানাবিধ আটখানা চালা বাঙ্গালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর প্রভৃতিতে রামগঞ্জ একটা জনাকীর্ণ স্থান হইয়া পড়িল। গ্রামটির নীচে টাঙ্গন বলিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে পড়িয়াছে, তাহার বক্ষে পারাপারের সুবিধার জন্য একটি বাঁশের পুল নির্ম্মিত হইল।

(ক্রমশঃ)

জিজ্ঞাসা।

—:*:—

হে ধ্রুব, হে অন্তর্য্যামী, হৃদি-অন্তঃপুর
তব রূপ-রস-স্পর্শে সদা ভরপুর—
এ কথা কে কবে নাথ, করে অস্বীকার ?
তবে কেন প্রাণারাম, হেন ব্যভিচার,—
তব সহ পরিচয় করিবার তরে,—
অক্ষয় করুণা স্নেহ লভিতে অন্তরে,—
পুরোহিত—প্রতিনিধি—পথ প্রদর্শক,
অনিল-সলিল-সম হবে আবশ্যক ?
যে সম্বন্ধে বাঁধিয়াছ হৃদয় আমার—
তা'র মাঝে কোথা স্থান অন্যে দাঁড়াবার ?
আমার প্রাণের কথা—সে গুপ্ত কাহিনী—
মিলন-মঙ্গল তব, দিবসযামিনী,
অপরে বলিবে মোরে,—তা' কি হয় কভু ?
চির-প্রিয়তম মম, হে নিখিল প্রভু !

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

প্রথম পাঁচ ফর্ম্মা মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিংওয়ার্কসে ও শেষ দুই ফর্ম্মা মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৌর অচিরেই পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু বর্ষা তখন সমাগতপ্রায়; সুতরাং বর্ষাপগম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। শরতের প্রারম্ভে গৌর যাত্রা করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণকে ভক্তগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সঙ্গে লইলেন।

প্রশস্ত রাজপথ ত্যাগ করিয়া গৌর অরণ্য-পথে চলিলেন। কটক নগর দক্ষিণে রাখিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হস্তিব্যাঘ্রমৃগ সমাকুল অরণ্যমধ্যে বলভদ্র ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গৌরের কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ অন্তঃকরণে ভয়ের স্থান ছিল না। বন্য জন্তুগণ তাঁহার প্রেমপুলকিত মূর্ত্তি দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। এক দিন পথের উপরি শায়িত এক ব্যাঘ্রের গাত্রে গৌরের চরণ পতিত হইল। ব্যাঘ্রের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে গৌর কহিলেন "কৃষ্ণ বল।" শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্র অমনি গাত্রোত্থান করিয়া "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিল। এক দিন স্নানকালে গৌর দেখিতে পাইলেন, এক মত্ত হস্তিযূথ নদীতে জলপান করিতে আসিল। "কৃষ্ণ বল" বলিয়া গৌর সেই হস্তিদলের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিলেন। হস্তিগণ "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূমিষ্ঠ হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, কেহ কেহ উচ্চ হুঙ্কারে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

মুক্ত আকাশতলে গৌর প্রাণ ভরিয়া মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুধাবর্ষী স্বরে আকৃষ্ট হইয়া, দলে দলে মৃগীগণ সমাগত হইল এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া গমন করিতে লাগিল। গৌর সস্নেহে তাহাদের গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কতিপয় ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইল! ব্যাঘ্রভয়ে মৃগীগণ পলায়ন করিল না। ব্যাঘ্রগণ মৃগীদিগকে আক্রমণ করিল না। ব্যাঘ্র ও মৃগী একত্রিত হইয়া গৌরের সঙ্গে নাচিতে লাগিল। গৌর বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে

বলিতে ব্যাঘ্র ও মৃগীগণ নাচিতে লাগিল। ব্যাঘ ও মৃগ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের মুখচুম্বন করিল। শাখারূঢ় ময়ূরগণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল এবং আকাশমার্গে গৌরের সহিত গমন করিতে লাগিল।

ঝাবিখণ্ডের অরণ্যের মধ্যে গৌর চলিতে-ছিলেন। অসভ্য ঝাবিখণ্ডবাসিগণ গৌরের নিকট কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আবিষ্টভাবে গৌর চলিতে লাগিলেন। বনানীদর্শনে তাহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল। শৈল দেখিয়া গোবর্দ্ধন মনে হইল। নদী দর্শনে কালিন্দী-প্রতীতি হইল। এইভাবে বহুপথ অতিক্রম করিয়া, গৌর অবশেষে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মণিকর্ণিকায় স্নান কালে তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিদায়কালে এই তপন মিশ্রকেই গৌর কাশী যাইতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তপন কাশী আসিয়া গৌরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আজ দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং পরম যত্নে স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন। তথায় বৈদ্যবংশোদ্ভব চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য বহুলোক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন।

প্রকাশানন্দ নামক এক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত তখন কাশীধামে বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। এক দিন এক ব্রাহ্মণ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে গমন করিয়া গৌরের মনোমোহ-কর মূর্ত্তি ও প্রেমবিহ্বল কীর্ত্তনের কাহিনী বর্ণনা করিল। প্রকাশানন্দ তাহা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে হাস্য করতঃ কহিলেন, "হাঁ, গৌর-বেশে কেশবভারতীর শিষ্য এক প্রতারক-সাধু 'চৈতন্য' নাম গ্রহণ করতঃ দেশে দেশে লোক ভুলাইয়া বেড়াইতেছে, শুনিয়াছি। সার্ব্ব-ভৌমের মত তীক্ষ্নধী পণ্ডিতও না কি তাহার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু কাশীধামে তাহার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না—তজ্জন্য চিন্তা নাই।" ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া গৌর হাস্য করিয়া উঠিলেন।

কয়েক দিন বারাণসীধামে অবস্থান করিয়া গৌর মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে যমুনাদর্শনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বলভদ্র শশব্যস্ত হইয়া ধরিয়া তুলিলেন। প্রয়াগে তিন দিন অবস্থান করতঃ অসংখ্য নর-নারীকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া পুনরায় মথুরার পথে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কয়েক স্থানে পুনরায় যমুনাদর্শন হইল। প্রতি বারই গৌর প্রেমপুলকিত ভাবে তাহাতে অবগাহন করিলেন। অবশেষে মথুরা দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিহ্বলভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মথুরায় প্রবেশ করতঃ বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া কৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিলেন। মথুরার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার নৃত্য ও সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সানোড়িয়া-বংশোদ্ভব এক ব্রাহ্মণে তাঁহার প্রেম সংক্রমিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি বাহু তুলিয়া গৌরের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গৌর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া, উভয়ে হরিনাম করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া গৌর অবগত হইলেন, ব্রাহ্মণ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পরিচয়ে তুষ্ট হইয়া গৌর তাহার গৃহে ভোজন করিতে চাহিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে সনোড়িয়ার অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলেন। কিন্তু গৌর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সানন্দে তাঁহার গৃহে ভোজন করিলেন। তথায় অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত হইল। গৌর তাহাদিগকে দর্শন দিয়া প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন। অনন্তর যমুনার চব্বিশঘাটে স্নান করিয়া মথুরার যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিলেন এবং বনভ্রমণে বহির্গত হইলেন। মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলবন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গাভীগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাম্বারবে হুঙ্কার করিয়া উঠিল এবং বাৎসল্য ভরে তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগের অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দলে দলে মৃগ ও মৃগীগণ ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। পিক ও ভৃঙ্গগণ পঞ্চমস্বরে গাহিয়া উঠিল। শিখিগণ নাচিতে নাচিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে ছুটিল। গৌর প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতাকে আলিঙ্গন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু বিগলিত, শরীর পুলকিত, মুখে উচ্চ হরিবোল। বৃক্ষলতাগণ তাঁহার মস্তকোপরি সুগন্ধি পুষ্প ও মধু বর্ষণ করিতে লাগিল। মৃগের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া গৌর রোদন করিলেন। মৃগের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল—অঙ্গ পুলকিত হইল, শুক-সারীগণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া রাধাকৃষ্ণ বলিয়া গান করিতে লাগিল। গৌরের হৃদয়ে প্রেমপ্রবাহ উথলিত হইয়া উঠিল। নৃত্যপর ময়ূর দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। বলভদ্র কষ্টে মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন।

গৌর আরিটগ্রামে গমন করিয়া রাধাকুণ্ডের অবস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তর দিবে কে? কালবশে যাবতীয় তীর্থ তখন লুপ্ত। রাধাকুণ্ডের সংবাদ কেহই রাখিত না। সর্ব্বজ্ঞ গৌর ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে কুণ্ডের আবিষ্কার করিয়া তাহাতে স্নান করিলেন। রাধাকুণ্ড প্রচারিত হইল। অনন্তর সুমনসরোবরে গমন করিয়া গৌর অদূরস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে প্রণাম করিলেন এবং গোবর্দ্ধন গ্রামে গমন করত তথায় হরিদেব-বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে শ্রীগোপাল-বিগ্রহ স্থাপিত। গৌর পবিত্র গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কিরূপে গোপালের দর্শনলাভ করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিস্থ অন্নকুট গ্রামের অধিবাসিগণ সংবাদ পাইলেন, তুর্কগণ গ্রাম আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সংবাদে গ্রামবাসিগণ গোপাল-বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া গাঠুলিয়া গ্রামে পলাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে গাঠুলিয়া গমন করত গৌর তথায় বিগ্রহ দর্শন করিলেন। অনন্তর কাম্যবন দর্শন করিয়া নান্দীশ্বর গমন করিলেন। তথায় পাবন প্রভৃতি যাবতীয় কুণ্ডে স্নান করিয়া সমীপস্থ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক এক গুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

খদির বন হইতে শেষশায়ী ও তথা হইতে খেলাতীর্থ ও ভাণ্ডীর বনে গমন করিয়া গৌর অবশেষে যমুনা পারে ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন ও মহাবন দর্শন করিলেন। গোকুল নগরে ভগ্নমূল যমলার্জুন দেখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। গোকুল হইতে গৌর মথুরায় সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তথায় এত লোকের সমাগম হইতে লাগিল যে তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য গৌর অক্রূর তীর্থে যাইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও লোক-সমাগম অত্যধিক হওয়ায় গৌর প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে গুপ্তভাবে বৃন্দাবনের বনমধ্যে গমন করিয়া তথায় সাধন ভজন করিতে লাগিলেন এবং তৃতীয় প্রহরে প্রত্যাগত হইয়া সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক কাহিনী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন। এই সময়ে একদিন গৌর দেখিতে পাইলেন, বহু লোক কোলাহল করিতে করিতে বৃন্দাবন যাইতেছে। তাহারা গৌরকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল "আমরা শুনিলাম কালীদহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়া রাত্রিকালে কালীয়-শিরে নৃত্য করিতেছেন এবং কালীয়ের শিরোমণি দীপ্তি পাইতেছে। আমরা দেখিতে যাইতেছি এ কথা সত্য কি না।" তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই কালীদহে প্রকট হইয়াছেন।" বলভদ্র এই কথা শুনিয়া দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। গৌর তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন "তুমি পণ্ডিত হইয়া মূর্খের মত কথা কহিতেছ। কলিকালে কেন কৃষ্ণ আবির্ভূত হইবেন ?" পরদিন প্রাতঃকালে একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে গৌর পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কালীয়দহে কৃষ্ণ দেখিলে কেমন বল দেখি ?" ভদ্রলোকটি কহিলেন "এক ধীবর কালীদহে নৌকার উপর মশাল জ্বালিয়া মাছ ধরিতেছিল। মূর্খ লোক না বুঝিয়া সেই নৌকাকে সর্প, মশালকে মণি ও ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়াছে।" গৌর তখন বলভদ্রকে কহিলেন "কৃষ্ণ কেমন প্রকট হইয়াছেন এখন শুনলে ত।" তখন ভদ্রলোকটী কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে প্রকট হয়েছেন—সে কথা মিথ্যা নহে। আপনি জঙ্গম নারায়ণ। আপনাকে দেখিয়া লোকে উদ্ধার হইতেছে।" তখন গৌর বিষ্ণু নাম স্মরণ করিয়া কহিলেন "এমন কথা কি মুখে আনিতে আছে ? জীবে কখনও কৃষ্ণ জ্ঞান করিও না। আমি সন্ন্যাসী সামান্য চিৎকণ মাত্র, জীব কিরণকণার মত। আর শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যোপম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। জীব ও ঈশ্বর কি কখনও এক হইতে পারে ? জ্বলন্ত অগ্নি ও তজ্জাত স্ফুলিঙ্গে যে প্রভেদ—ঈশ্বরে ও জীবে তদ্রূপ প্রভেদ। যে মূঢ় জীব ও ঈশ্বরকে তুল্য মনে করে ও নারায়ণকে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতার সম জ্ঞান করে সে পাষণ্ডী।"

মথুরাবাসিগণ মাধবপুরীর শিষ্য সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা গৌরকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। একদিনে একজনের অধিক নিমন্ত্রণ গ্রহণ চলে না। কিন্তু অসংখ্য

লোক নিমন্ত্রণ করিয়া বসে। বলভদ্র বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ইহার পরে গৌরের মানসিক অবস্থাও ক্রমশঃ বিকল হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন অক্রুর-ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া গৌর অজ্ঞানভাবে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। এই সমস্ত কারণে বলভদ্র অনেক বলিয়া কহিয়া গৌরকে সম্মত করত একদিন তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস নামক এক রাজপুত ও সেই সানোড়িয় ব্রাহ্মণও সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া সকলে শ্রান্তি দূর করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ এক বংশীধ্বনি শুনিয়া গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দিয়া ফেণ নির্গত হইতে লাগিল। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল। দৈবক্রমে সেই সময় দশজন অশ্বারোহী যবন সৈনিক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মনে করিল, সঙ্গের তিনজন লোক ধুতুরা প্রয়োগ করিয়া সন্ন্যাসীকে অজ্ঞান করতঃ তাহার ধন-সম্পদ হরণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। তাহারা সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু অনতি-বিলম্বে গৌর হরি হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ তখন সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে গৌরের চরণে প্রণত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন জ্ঞানী "পীর" ছিলেন। তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুক্ষণ গৌরের সহিত আলোচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। গৌর তাঁহাকে কৃষ্ণ নাম প্রদান করিয়া তাঁহার রামদাস নাম রাখিলেন। যবনসৈনিকগণের মধ্যে আর একজন ছিলেন। তাঁহার নাম বিজুলী খাঁ। তিনিও অন্যান্য সমস্ত সৈনিকই গৌরের নিকট কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলেন। বিজুলী খাঁ পরম ভাগবত বলিয়া কালে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সৈনিকদিগকে বিদায় দিয়া গৌর সঙ্গিগণ-সহ যাত্রা করিলেন। কতিপয় দিবসান্তে তাঁহারা প্রয়াগে উপনীত হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাটলীর পথে

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার প্রায় এক মাস পরে একদিন মধ্যাহ্নের পর প্রমীতসেন পাটলী গ্রামে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ভৃত্য বাদল। ক্ষুদ্রদৃষ্টি, ক্ষুণ্ণদেহ লইয়া বাদল একদিন প্রমীতের আশ্রয় লইয়াছিল, প্রভুর উদার অনুগ্রহে এখন আর তাহার সে দুরবস্থা নাই। তাহার শরীর সুস্থ সবল হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদল প্রভুর অতি

বিশ্বস্ত, কায়মনোবাক্যে আজ্ঞাবহ ভৃত্য, পরিবারের একজন হইয়া উঠিয়াছে।

তখনও রৌদ্রতেজ বড় প্রখর। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রমীত অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এই পথে গন্তব্য স্থানে যাইতে অল্প সময় লাগে। পল্লী-বসতির পথ ধূলি-বালুতে ততটা আচ্ছন্ন নহে। অথচ গাছের ছায়াতে অনেকটা শীতল। পাটলীপুত্রে অনেক বসতি-বিভাগ ছিল। গো-পালক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক, নিষাদ, শৌণ্ডিক, চণ্ডাল প্রভৃতির পৃথক পৃথক বসতি ছিল। ব্যবসা-ভেদে প্রায়শঃই বসতি-বিভেদ হইত। বারবনিতারাও ইচ্ছামত নগরের যে সে স্থানে বাস করিতে পারিত না, তাহাদের জন্য নগরের প্রান্তে পৃথক্ বসতি নির্দ্দিষ্ট ছিল। দ্যূতগৃহের স্থানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেখানে দ্যূতকারীরা মিলিত হইত এবং দিন রাত্রি পণ রাখিয়া খেলা চলিত। দ্যূত-সভাধ্যক্ষের নাম সভিক। দ্যূতকারিগণের মধ্যে তর্ক-কলহ, পণ-আদায় ইত্যাদি কার্য্য সভিকের দ্বারা মীমাংসা হইত। গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা বা গুরু অপরাধের বিচার রাজদ্বারে হইত। সেদিন প্রমীত এই দ্যূতগৃহের নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। কদাচিৎ তিনি এ পথ দিয়া চলিতেন, আজ সুবিধা বিবেচনা করিয়া এই পথ ধরিয়াছিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রমীত একটা গোলযোগের শব্দ শুনিতে পাইলেন। সঙ্কীর্ণ পথ। পথের মধ্যভাগেই কয়েকটী লোক একজনকে টানাটানি করিতেছে। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রমীত দেখিতে পাইলেন, সভিকের লোকেরা শোমদত্তের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। অনেকে এই ব্যাপার দেখিতেছে; কেহ কেহ শোম-দত্তের পক্ষে তর্ক করিতেছে, অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে বলিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া প্রমীত-সেন থামিলেন। সে পথ পরিত্যাগ করিবেন কি পাশ দিয়া চলিয়া যাইবেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শোমদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া মস্তক নত করিলেন। সঙ্কীর্ণ পথ, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবার সুবিধা নাই; বিশেষতঃ শোমদত্ত তাঁহার পরিচিত, সেই শোমদত্তের এই বিপদ! কি বিপদ?

প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এ কি তোমরা ইঁহাকে ধরিয়াছ কেন?"

প্রমীত নগর-বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোক, অনেকেই তাঁহাকে চিনিত। একজন নমস্কার করিয়া বলিল:—

"ইনি পণ হারিয়া অনেক দিন যাবৎ শোধ করিতেছেন না। আজ সভিক মহাশয়ের আদেশে ইঁহাকে ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইতেছি।"

"সভিক মহাশয় এখানে আছেন?"

"আছেন। তাঁহাকে ডাকিব?"

"ডাক।"

দুই তিন জন লোক সভিককে ডাকিতে গেল। প্রমীত শোমদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কি হইয়াছে, মহাশয়?"

শোমদত্ত প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন:—

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ঋণী। শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিব, কিন্তু ইহারা তাহা

মানিতেছে না, আমাকে ধর্ম্মপালের নিকট লইয়া যাইবে !—আমাকে রক্ষা করুন।"

"অবশ্য করিব।—ইঁহার হাত ছাড়। সভিক আসিতেছেন, আমি মিটাইয়া দিতেছি।"

লোকেরা শোমদত্তের হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সভিকও সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রমীতসেনকে দেখিয়া সভিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন :—

"আপনি এখানে!—কেন ?"

"শোমদত্ত মহাশয় সম্মানী লোক, আপনার লোকেরা তাঁহার এরূপ অসম্মান করিতেছে!"

সভিক বলিলেন—

"অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি কোন রূপেই পণের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন না, আজ কাল করিয়া অনেক বিলম্ব করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া ইঁহাকে ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছিলাম।"

"কত ঋণ ?"

সভিক ঋণের পরিমাণ জানাইলেন। প্রমীত বলিলেন ;—

"আমার সঙ্গে এখন কিছু নাই ;—আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন ?"

সভিক পুনরায় নমস্কার করিয়া বলিলেন :—

"প্রমীতসেন মহাশয়ের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারে, নগরে এমন লোক নাই। আপনি আদেশ করুন।"

"শোমদত্ত মহাশয়ের যে ঋণ আছে, তাহা সমস্ত আমি পরিশোধ করিব। আমার এই ভৃত্য বাদলকে দিয়া আগামী কল্যই আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আপনি ইঁহাকে ছাড়িয়া দিন।"

"এখনি।" শোমদত্তকে নমস্কার করিয়া—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমন করুন।"

সভিক তখন নতমস্তকে প্রমীতসেনকে নমস্কার করিয়া লোকজনসহ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

শোমদত্ত তখন অতিনমিত মস্তকে প্রমীতসেনকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন :—

"আপনি উপস্থিত না হইলে আজ আমার রক্ষা ছিল না। এ উপকারের কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে।—আমি শীঘ্রই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।"

"আপনার যখন সুবিধা হইবে, করিবেন ; অত ব্যস্ত হইবেন না। উপকারের কথা বলিতেছেন ?—এ আর কি উপকার ? পরস্পরের সাময়িক সাহায্য করা ত মানুষের কর্ত্তব্য কাজ। আমি অনেকটা দূরে যাইতেছি, এখন বিদায় হই।"

তখন উভয়ে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনা করিয়া যে যাহার গম্য পথে চলিলেন। বাদল প্রমীতের পাছে পাছে চলিতেছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে একবার অগ্রসর হইয়া প্রায় প্রমীতের পাশাপাশি আসিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রমীত অত্যন্ত অন্যমনস্কে চলিয়াছিলেন, বাদলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। আবার কতক দূর চলিয়া বাদল পুনর্ব্বার ঐরূপ করিল। এবার প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কিরে বাদল, কিছু বলিবি ?"

"আজ্ঞা—"

"কি রে ?"

"আজ্ঞা, এই যাহাকে আপনি মুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহাকে আমি—আমি সেদিন—সকালে ঠাকুরাণীর বাড়িতে দেখিয়াছিলাম !"

প্রমীত চমকিত হইলেন, বলিলেন :—

"ইহাকে দেখিয়াছিস্ ! কবে ?"

"এই যে ফল ফুল মালার ভেট লইয়া আমরা যে দিন সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেই দিন।"

"বটে ?—সে বাড়ীতে কোন্ ঘরে ?"

"কোন ঘরে নয়। আমরা যখন প্রবেশ করি, তখন ইনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। সেদিন ইঁহার বেশভূষা এরূপ ছিল না, সেদিন ইঁহার গায়ে মূল্যবান পরিচ্ছদ ছিল।"

প্রমীতের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া প্রমীত বলিলেন,—

"ইনি বোধ হয় সে বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; নগরের মধ্যে ইনি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক।"

বাদল নীরবে পশ্চাতে সরিয়া প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচীবেধ-যন্ত্রণা

মঞ্জুলার গৃহে সোমদত্ত !

প্রমীত ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সোমদত্তের চরিত্র, ব্যবহার, সংসর্গ ত দেখিলাম। দ্যূতগৃহে তাহার যাতায়াত, ঋণ-পরিশোধে অক্ষমতা, সুরাসেবিগণের সংসর্গ, আরও বা কি।—এমন লোক মঞ্জুলার গৃহে! মঞ্জুলার সঙ্গে এ সব লোকের বাক্যালাপ, আমোদ-রহস্য! মঞ্জুলা এমন লোককে গীত শুনায় ?—ক্ষতিই বা কি ! মঞ্জুলা আমার কে ? কিন্তু—

প্রমীত পাটলী গ্রামে অসঙ্গ সেনের ভগ্নীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অসঙ্গ সেখানেই ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ের পীড়া সম্পূর্ণ আরাম হয় নাই, সে অনেক দিন ভুগিতেছে। প্রমীতকে দেখিয়া অসঙ্গ বলিলেন:—

"এস, এস, আজ ক'দিন তোমাকে দেখি নাই!"

"অরুণ আজ কেমন আছে ?"

"অনেকটা ভাল, তবে এখনো বড় দুর্ব্বল।"

তখন উভয়ে শয্যায় বসিলেন। অসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"রাজসভার সংবাদ কি ? যুদ্ধযাত্রা কবে ?"

"আর বিলম্ব নাই; বর্ষা অতীতপ্রায়। সীমান্তদেশে বহু সেনা প্রেরিত হইয়াছে, আয়োজন উদ্যোগ প্রায় শেষ হইয়াছে।"

"কলিঙ্গ জয় সহজে হইবে না। শুনিয়াছি, কলিঙ্গরাজের সৈন্যসামন্তের অভাব নাই।"

"রাজাধিরাজ স্বয়ং যাইতেছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা, সে দেশ জয় করিয়া ফিরিবেন।"

"তা যাক্।—মঞ্জুলা আর তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিল ?"

"আজ তিন চারি দিন হইল আসিয়াছিল। উৎপলা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"

"তোমার আগ্রহে ?"

"আমার আগ্রহে কেন ?—উৎপলা এবং মঞ্জুলার যে ভারি ভাব !"

"তিনি মঞ্জুলার গীত শুনিয়াছেন ?"

"গীত শুনিয়া উৎপলা মুগ্ধ হইয়াছেন। মঞ্জুলা যদি শিখায়, তবে তিনি গীত-বাদ্য শিখিতে প্রস্তুত।"

অসঙ্গ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন :-

"যে মঞ্জুলার সঙ্গে তোমাদের কোনদিন পরিচয় ছিল না, যাহাকে দেখিবার জন্য কোন দিন আগ্রহ ছিল না, তাহার সঙ্গে তোমাদের এত ঘনিষ্ঠতা, এত যাতায়াত!—ব্যাপারটা কি ?"

"তুমি সকলই জান। মঞ্জুলা আমার বড় উপকার করিয়াছে।"

"তুমিও ত তার উপকার করিয়াছিলে।" (হাসিয়া বলিলেন)।

"মঞ্জুলা অতি রূপবতীও বটে ?"

"তুমিও ত তাহাকে দেখিয়াছ।"

"দেখিয়াছি।—আর এক কথা, শুনিয়াছ, শোমদত্ত না কি মঞ্জুলার পাণিগ্রহণার্থী ?"

প্রনীতের দৃঢ়চিত্ত হঠাৎ বিচলিত হইবার নহে; তথাপি এ সংবাদে তাঁহার হৃদয়ে হঠাৎ সূচীবেধ-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল; মুখ শুষ্ক, চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অসঙ্গ বলিলেন :—

"চাহিয়া রহিলে যে !"

"এ কথা কোথায় শুনিলে ?"

"এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছে।"

"জনরব! মিথ্যাও হইতে পারে ?"

"অসম্ভব নহে। কিন্তু শোমদত্ত অনেক দিন হইতেই মঞ্জুলার গৃহে যাতায়াত করে।"

"শুনিয়াছি, অনেকেই ত সেখানে যাইয়া থাকে।"

"যায়ই ত; কিন্তু আজকাল কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মঞ্জুলার সঙ্গে কাহারও বড় দেখা হয় না। তাহার শরীর না কি বড় সুস্থ নয়!"

"মঞ্জুলা অসুস্থ! সেদিনও ত মঞ্জুলা কুমুদনিবাসে আসিয়াছিল, কোন পীড়া, অসুখের কোন লক্ষণ ত দেখি নাই।"

"তবে তাহার মনেরই বা একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

"কিসে তাহা বুঝিলে ?"

"কোন পরিচিত সম্ভ্রান্ত ঘরে আমন্ত্রিত হইলে মঞ্জুলা যাইত, গীত গাহিত, বাক্যালাপে লোকের চিত্ত মুগ্ধ করিত। এখন আর মঞ্জুলা কোথায়ও যায় না! ধর্ম্মপাল মহাশয়ের ভগ্নী উষাদেবী না কি তাহাকে সেদিন সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, উষাদেবীর অনেক আত্মীয়া বয়স্যার সেদিন মঞ্জুলার গীত শুনিবার জন্য একত্রিত হইবার কথা ছিল। নানা আপত্তি করিয়া, শরীর অসুস্থ বলিয়া মঞ্জুলা সেখানে যায় নাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে উষা-দেবীর আহ্বানে মঞ্জুলা সে বাড়ীতে যাইত! শুনিয়াছি, আরও কোন কোন পরিচিত গৃহে মঞ্জুলা আজকাল যায় নাই।"

প্রনীত কিছুকাল নীরব রহিলেন। কেন যায় না? কুমুদনিবাসে ত আসিয়াছিল! প্রনীত বলিলেন—

"সন্দেহের বিষয়ই বটে।—ভাল, শোম-দত্তের অবস্থা ও চরিত্রের কথা কিছু জান ?"

"অবস্থা ত ভালই ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। রাজপ্রাসাদ তুল্য ঘর-বাড়ী, পুকুর-উদ্যান আছে; দাসদাসীর অভাব নাই, ব্যয়বিধান যথেষ্ট, কিন্তু ঋণ না কি অতি বেশী!"

"সুরা ?"

"অনেক দিন হইতেই চলে।"

"দাতগৃহে"—

"বেশী যাতায়াত। সেখানেও না কি অনেক ঋণ।"

"ঋণ-পরিশোধের উপায় ?"

"উপায়ই বোধ হয় শোমদত্ত খুঁজিতেছে। মঞ্জুলা ধনশালিনী, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে শোমদত্তের ঋণ পরিশোধ হয়, পূর্ব্ববৎ অমিত ব্যয়ের সুবিধা হয়।"

প্রণীত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন, অন্যমনস্কে কক্ষমধ্যে ক্ষণকাল পরিক্রমণ করিয়া বলিলেন :—

"মঞ্জুলার মাতা স্বীকার হইবেন ?"

"জানি না। তবে শোমদত্ত নগরের মধ্যে এক বিখ্যাত ঘরের লোক। ঘর বাড়ী, পুকুর-উদ্যান, দাসদাসী, মানসম্ভ্রম তাহার সকলই আছে। অলোকা ঠাকুরাণী কি এ সমস্ত উপেক্ষা করিবেন ?"

"মঞ্জুলার অভিমত হইবে ?"

"স্ত্রীলোকের রুচি আর মন! চিরকাল দুর্জ্ঞেয়।"

"রাজ্ঞী কারুবকী"—

"রাজ্ঞী ত রাজ্ঞী। নগরস্থ গৃহস্থ-ঘরের কথা তাঁহার অত জানা কি সম্ভব ?"

"আর কি কেহ নাই ?"

অসঙ্গ বড়ই বিস্মিত হইলেন, এত প্রশ্ন কেন ? প্রণীতের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া অসঙ্গ বলিলেন :—

"মঞ্জুলার আর কে থাকিবে ?"

"তা—তা বটে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই ?"

"রক্ষা করা! কেন, তাহার কি বিপদ ? আর, আমাদের সে ভাবনা কেন ?—মঞ্জুলা ত তোমার আমার কেহ নহে।"

"কেহ নয়, ঠিক। যখন তাহার সঙ্গে দেখাশুনা ছিল না, তোমার মুখে তাহার অত প্রশংসা শুনিয়াও তাহাকে দেখার সাধ কোন দিন হয় নাই। এখন তাহাকে দেখিয়াছি, পরস্পর পরস্পরের নিকট এত উপকৃত, তাহার ভালমন্দের দিকে চাহিতে নাই ?"

"মঞ্জুলা কচি বালিকা নয়, যুবতী; কুরূপা কুৎসিতা নয়, রূপলাবণ্যবতী; অবোধ মূর্খ নয়, চতুরা ও শিক্ষিতা; দরিদ্রা নয়, ধন-শালিনী; অসহায়া নয়, রাজ্ঞী তাহার অভিভাবিকা; অনভিজ্ঞা গ্রাম্যবালিকা নয়, নগরে প্রসিদ্ধা রমণী। নিজের ভালমন্দ সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। যেখানে তাহার অমত, সেখানে কে তাহার বিবাহ দিবে ? অযোগ্য পাত্রে সে কেন আত্মসমর্পণ করিবে ?"

"এইমাত্র তুমি বলিলে, নারীর চরিত্র বুঝা কঠিন!"

"মঞ্জুলা পরাধীনা নয়, স্বাধীনা। সে যদি অপাত্রেই চিত্ত সমর্পণ করে, তুমি আমি বাধা দিবার কে ?"

প্রণীত সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তথাপি বলিলেন ;—

"ভাল, মঞ্জুলাকে একটুকু সাবধান করিয়া দিলে হয় না ?—শোমদত্তের স্বভাবচরিত্রের একটুকু পরিচয় তাহাকে দিলে হয় না ?"

"তুমি কেন এত অধীর হইতেছ ? মঞ্জুলা বুদ্ধিমতী, সে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়াই মন স্থির করিবে। শোমদত্ত যে ইচ্ছা করিতেছে, মঞ্জুলা কি তাহা জানে ?—আগে থাকিতেই অত বড় একটা

কথা বলা নিঃসম্পর্কীয় আমাদিগের পক্ষে ভাল দেখায় কি ?—তবে, তোমার—তোমার নিজের যদি কোন অভিপ্রায় —”

“তুমি পাগল।”

অসঙ্গ অন্ধকারে ঢিল মারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমীতের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অসঙ্গের মনে সন্দেহটা প্রবল হইল তিনি ভাবিলেন—তাই কি ? প্রকাশ্যে বলিলেন—

“শোমদত্ত যে প্রকৃতই মঞ্জুলাকে চায়, তাহা ত আমরা ঠিক জানি না। একটা ক্ষুদ্র জনরব মাত্র, সম্পূর্ণ মিথ্যাও হইতে পারে।”

“তা ঠিক। তথাপি মঞ্জুলাকে বলিতে না চাও, তাহার মাতার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়া দেখ না।”

অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি বলিতেছ, ভাল, একদিন যাইব।”

“অরুণ ত এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে, তুমি নগরে ফিরিবে কবে ?”

“আর গৌণ করিব না, কালই ফিরিব।”

“যাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিও।”

অসঙ্গ হাসিলেন। আরও কিছু কথা-বার্ত্তার পর প্রমীত বিদায় হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অসঙ্গ সেই ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অত উদ্বিগ্ন কেন ? প্রমীতের চিত্ত বিচলিত হইয়াছে ? অতি প্রলোভনের বস্তু, সন্দেহ নাই। আমি ত আগেই সাবধান করিয়াছিলাম !—প্রমীত প্রলুব্ধ হইয়াছে ! তাহার ত কোন অভাব নাই। মানসম্ভ্রম ধনসম্পদ ? তাহার ত সে সকলের অবধি নাই। আর, সংসারে যাহা অতি দুর্লভ—অতুল্য, অমূল্য—রূপসী গুণবতী সাধ্বী স্ত্রী, পুণ্যফলে তাহাও ত তাহার গৃহে আছে ; দেবী উৎপলা যে রমণীরত্ন !—আমারই ভ্রম ! আমি যাহা চিত্তের বিকার বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা, হয় ত, পরম হিতকারিণী মঞ্জুলার মঙ্গলকামনায় প্রমীতের অকপট নিঃস্বার্থ চেষ্টামাত্র। অসঙ্গের মন অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

এদিকে পথে চলিতে চলিতে প্রমীতের চিত্তে চিন্তাতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। উদ্যানে ফুল ফুটিয়া সৌরভে সৌন্দর্য্যে দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করে। ফুলটী বৃন্তচ্যুত করিবার লোভ হয় ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই ; শুধু দূর হইতে দেখিয়া সৌরভ উপভোগ করিয়াই সুখ। কিন্তু যেইমাত্র অন্য কোন ক্ষিপ্রকারী দর্শক সেটীকে আত্মসাৎ করিবার জন্য হাত বাড়ায়, বৃন্ত হইতে ছিঁড়িয়া লইবার উদ্যোগ করে, অমনি তুমি চমকিয়া উঠিবে—অহো ! ও লোকটা হাত বাড়াইল ! ও-ই লইয়া যাইবে ? উহার অপেক্ষা ত আমি ফুলটী লইবার অধিক উপযুক্ত ! ও ত কালো কুৎসিত। সৌরভ-সৌন্দর্য্যের আদর জানে না ! আমি লইব না কেন ? আমি ত উহার অপেক্ষা গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ। প্রমীত ভাবিলেন, মঞ্জুলাকে বিবাহ করিবে শোমদত্ত ?—মনে করিতে প্রমীতের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দ্যূতকারী, সুরাপায়ী, স্বার্থপর, ঋণভারগ্রস্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য শোমদত্ত, আর শিক্ষিতা চতুরা কলকণ্ঠা ধনৈশ্বর্য্যশালিনী রূপলাবণ্যবতী যুবতী মঞ্জুলা !

জনরব অসত্য নহে ! শোমদত্তের অনেক ঋণ, ঋণের দায়ে সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেছিল। ধনলোভে শোমদত্ত মঞ্জুলার

পাণিগ্রহণার্থী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মঞ্জুলার রূপগুণ কলকণ্ঠের মর্য্যাদা সে কি করিয়া জানিবে?—এমন বিবাহ হইতে মঞ্জুলাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

আমার এত ভাবনা কেন? মঞ্জুলা ত আমার—আমার কেহ নয়। কিন্তু——তখন প্রমীতের উদ্‌ভ্রান্ত মনের কল্পিত নানা চিত্র—অসম্পূর্ণ, অমূলক, ক্ষীণ, উজ্জ্বল, বিশৃঙ্খল—নানা চিত্র তাহার মগ্ন হৃদয়পটে উদিত হইতে লাগিল। মঞ্জুলার সেই আনত চক্ষের মধুর চঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপ। মঞ্জুলা আমার দিকে অমন করিয়া চায় কেন? চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে চমকিতের ন্যায় চক্ষু অবনত করে কেন? মধুর মন্থর তাহার চলনভঙ্গি। চলিতে চলিতে মঞ্জুলা থামিয়া যায় কেন? মঞ্জুলা কাহারও আমন্ত্রণে কোথাও আর যায় না, আমার গৃহে ত আসিয়া থাকে। মঞ্জুলার মধুর কণ্ঠ। আমি ত উপকারী সুহৃদ, আমার কাছে একটী গীত গাহিতে চাহে না—পারে না কেন? প্রথম সাক্ষাতে সেই ঝড়বৃষ্টির দিন অত কথা বলিয়াছিল এখন তাহার মুখে বাক্য সরে না কেন? স্বাধীনা, স্বচ্ছন্দচিত্তার অন্তরে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে?—কবে হইতে? আর আমি, আমারও কি কোন পরিবর্ত্তন——?

চিন্তার আবেগময় উচ্ছ্বাস এবং মন্দ-মধুরত্বভেদে প্রমীতের পদক্ষেপও সময় সময় দ্রুত, সময় সময় বিলম্বিত হইতে লাগিল। ভৃত্য বাদল তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, প্রভুর ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, ভাবিল—আজ এ কিরূপ!

সন্ধ্যার পর প্রমীত গৃহে ফিরিলেন। বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে উৎপলার শয়নকক্ষে পালঙ্কে যাইয়া বসিলেন। গৃহ আলোকিত। উৎপলা যেন কি করিতেছিলেন, স্বামীকে দেখিয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কখন বাড়ীতে আসিলে?"

"এই যে এই মাত্র।"

"অরুণ কেমন আছে?"

"অনেকটা ভাল।"

"তোমাকে ওরূপ দেখাইতেছে কেন?—শুষ্ক মুখ, কোন অসুখ করিয়াছে?"

"পথ হাঁটিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি।"

"বল কি?"—স্বামীর ললাটে গণ্ডে হাত বুলাইয়া—"তুমি শোও, আমি তোমার পা টিপিয়া দি।"

"তুমি কেন?"

"আমি কেন!"—হাসিয়া—"তবে কে?"

প্রমীত উৎপলার স্কন্ধে হাত রাখিয়া আবেগের সহিত বলিলেন—

"আর কেহই না উৎপল, তুমি। একমাত্র তুমি?"

উৎপলা মনে করিলেন, স্বামী একটা রহস্য করিলেন;—

"তবে তুমি শোও।"

ক্লান্তদেহে উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে প্রমীত শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। পথের ধূলিতে প্রমীতের পা জানু পর্য্যন্ত ধূসর হইয়াছিল, উৎপলা সাটীর অঞ্চলে তাহা ঝাড়িয়া মুছিয়া দিলেন। শয্যার পাশে বসিয়া স্বামীর পদযুগল অঙ্কে তুলিয়া লইয়া আপনার নবনীত কোমল হস্তে তাহা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। দাস আর দাসী!—নিজের শয়নকক্ষে স্বামীর পরি-

চর্য্যায় উৎপলা কোন দিন দাসদাসী ডাকিতেন না।

পথ হাঁটিয়া প্রণীত প্রকৃতই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। উৎপলার স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে তাঁহার শ্রান্তি দূর হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় উত্তপ্ত উদ্বেগময়, চক্ষু জলভর-পরিনম হইয়া উঠিল। উৎপলা তাহা দেখিতে পাইলেন না। হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর পবিত্র অঞ্চল স্পর্শ করিয়া মুদ্রিত চক্ষে মনে মনে প্রণীত কাতর প্রার্থনা করিলেন ;—

"ভগবান্ আমাকে রক্ষা কর।"

সে রাত্রিতে প্রণীতসেনের সুনিদ্রা হইল না। (ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

ধর্ম্মমঙ্গল

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য, একখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কাব্য। ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত শুনা যায়। দীনেশবাবুর মতে ইহাতে উত্তেজনার একান্ত অভাব। আবার কোনও কোনও সমালোচকের মতে "হোমর, ভার্জ্জিল, মিল্টন ও বাল্মীকি পাঠে যে ফল ঘনরাম পাঠেও সেই ফল।" এবম্বিধ মতের পার্থক্য থাকিলেও ১লা অগ্রহায়ণের (১২৮৬) "সাধারণী"র সহিত সমস্বরে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বাঙ্গালী যুবক! শুধু যুবক কেন, বাঙ্গালী বৃদ্ধ! তুমি ঘনরাম পড়িবে না কেন? ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে পড়িবার অনেক জিনিষ আছে—তাহা অস্বীকার করা যায় না—শুধু পড়িবার নয় ইহাতে শিখিবারও অনেক জিনিষ আছে।

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য মনসার ভাসানের মত একখানি চরিত-কাব্য; ইহাতে মনুষ্য-চরিত্রের বহুবিধ বিকাশ লক্ষিত হয়, কিন্তু এই কাব্যেও অলঙ্কার বড় বিরল। অলঙ্কারের কিছু অভাব থাকিলেও ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যকে মনসার ভাসানের মত গ্রাম্য কাব্য বলা যায় না। মনসার ভাসানে কবির কাব্যের পারিপাট্যের দিকে একেবারে দৃষ্টিই ছিল না, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে কিন্তু কবির সেদিকে বেশ দৃষ্টি আছে; ভাবালঙ্কারের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও ধর্ম্মমঙ্গলে শব্দালঙ্কারের অভাব নাই, এবং কবি এই বাহ্যালঙ্কার বেশ নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গলে অনুপ্রাস খুলিয়াছে ভাল, ইহার শব্দের ললিতগতি ললিতকুমারের লোভনীয়। নামের গুণে আমরাও আনুপ্রাসিক হইয়া পড়িলাম! শব্দযোজনার বেশ চাতুর্য্য আছে বলিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য গ্রাম্য কাব্যের একটু উপরে উঠিয়াছে।

(১)

চকোর চকোরী নাচে চাহিয়ে চপলা।
মনে হইল নিকটে আইল মেঘমালা॥
কুহু কুহু কোকিল ছাড়িছে যেন রা।
শিখী পুচ্ছ করি উচ্চ পেয়ে মেঘ রা॥

(২)

বিষ্ণু মায়া ছায়া নিদ্রা তুমি সর্ব্বভূতে।
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা জাতি লজ্জা শান্তি তুষ্টি দয়া।
সর্ব্বথাই শক্তিরূপা তুমি মা অভয়া ॥
শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষান্তি তুমি নানা সর্ব্বভূতে।
ভগবতি ভকতবৎসলা নমোস্তুতে ॥
নমঃ নারায়ণি। নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনি।
মহামায়া মহাদেবি মহিষমর্দ্দিনি ॥
নমঃ জয়া যশোদানন্দিনি জয়যুতে।
জগন্ময়ি জগৎজননি নমোস্তুতে ॥

(৩)

প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রসাদ প্রভুর পদ
পঙ্কজ পরম পবিসর।
সেবিয়া সোনার রায় ধ্যান ধরি ধর্ম্মরায়
ধরাতলে ধূলায় ধূসর।
প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম
বিশ্ববীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিদান ॥

(৪)

ইছাই আনন্দ মনে, নানাবিধ আয়োজনে,
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী।
আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে, আবাধিতে হেমযন্ত্রে,
মন্ত্র-বশে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী ॥
তুমি ত্রিলোকের মাতা, শক্তি ভক্তি মুক্তি দাতা
বিশ্বগতি ব্রহ্মার জননী
প্রলয় পালন সৃষ্টি প্রসবে তোমার দৃষ্টি
তুমি মতি গতি সবাকার ॥
তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর
তো বিনা স্মরণ লবে কার ॥

ভকতবৎসলা মাতা চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা
মোর নহে ভকতের দশা।
শুনি দীন দয়াময়ী পতিতপাবনী অই
নাম মাত্র আমার ভরসা ॥

যে কাব্যে ভাষার এমন ধারা বাঁধুনি, পদ-যোজনার এমন কারদানি, সে কাব্যকে নিতান্ত গ্রাম্যকাব্য বলা চলে না। বরঞ্চ এ কাব্যখানিকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে কতটুক সত্য, কতটুকুই বা কল্পনা স্থান পাইয়াছে, সে বিষয়ের বিচারভার ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করিবেন, আমাদের তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে ইহাতে যতটুকুই ঐতিহাসিক সত্য থাকুক, কবি যে লাউসেনের জীবন-চরিত লিখিবার উদ্দেশ্যেই এই কাব্যখানির প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা কাব্যখানি ঐতিহাসিকই হোক, অথবা কল্পনামূলকই হোক, যখন আমরা ইহার কাব্যাংশ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন তাহাতে আমাদের বড় ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাব্যকলার কতটুকু বিকাশ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জানিতে পারিলেই আমরা সফলকাম হইব।

কবির ভাষার উপর বেশ প্রতিপত্তি আছে এ কথা বলাতে এমন বুঝায় না যে, কবি গ্রাম্যশব্দ একেবারে ব্যবহার করেন নাই; বরঞ্চ প্রাদেশিক শব্দ তিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বোধ হয় তিনিই প্রথম যাবনিক শব্দ কাব্য মধ্যে মিশাইয়া দিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাচীন কবিগণ সর্ব্বত্রই বিষয়োপযোগী ভাষা ব্যবহারের

পক্ষপাতী; তাই তাঁহাদের ভাষা কোথাও বেশ সংস্কৃত, কোথাও বা অত্যন্ত সহজ, এমন কি কোথাও কোথাও তাহা রীতিমত গ্রাম্য। "নাপাল" নিবিড়, নিছুটী, নাবড় পাতি (পত্র) বাও জুঁখিয়া প্রভৃতি শব্দ প্রাদেশিক। আবার সূর্য্যার্থক পতঙ্গ, জলার্থক জীবন, অহি প্রভৃতি শব্দ খাঁটি সংস্কৃত, তারপর চলিত কথা তো ছত্রে ছত্রেই আছে। কথিত শব্দের সুন্দর ব্যবহারে কবির কাব্যের শোভার কিছু হানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বরঞ্চ কথিত শব্দের সাহায্যে কবি অনেক স্থলে এমন মুখরোচক অনুপ্রাসের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা ভারতচন্দ্রেরও বোধ হয় অনুকরণীয় হইয়াছিল।

ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননি চিনি চাপাকলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা॥
মজা মত্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।
কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোনও সই॥

ফারসী কথার মিশ্রণ; যথা—

(১) পৌরুষ বাড়ালে কেহ পান করি পোস্ত।
খেয়ে বলে ঘোষাল খানিক খাও দোস্ত॥
(২) গা আছাড়ী কান্দে রাজা ঠেকি মায়াফান্দে।
ফকীর হইনু বলি ফুকারিয়া কান্দে॥
(৩) গাথিয়া জুতার মালা দিলেক গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখিল কলায়॥
(৪) রাজকর খরচা খয়রাৎ হেন জানি।
পরাধীন পরাণ বিফল হেন গণি॥
(৫) আনন্দে অবনীপতি জল্লাদ শিখর।
শিকার করিতে রাজা সাজিল লস্কর॥

এই প্রকার দোমিশালি ভাষা ক্রমে যে আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা ভারতচন্দ্র পাঠ করিলেই জানা যায়। শুধু ভাষা নহে, বিজেতৃ যবনগণকে লইয়া হাস্য-পরিহাস করার প্রথাও ঘনরাম চক্রবর্ত্তীই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বোধ হয় অনেকটা গায়ের জ্বালা মিটাইবার প্রয়াস হইতেই এই প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছিল। ঘনরামের সময়ে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের পদানত হইয়া পড়িয়াছিল, মির মিঞাদের প্রভাব বাড়িতেছিল, তাহা কথায় কথায় এই কাব্য মধ্যে উহাদের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়।

মীর নিয়া মোগল মহলে দিল দাগা।
বাদা বলে ফতেমা বিবি কুপায় খেলে বাঘা॥
আহ উহু খরাপে পাছে আসে অন্তঃপুরে।
দেখহ ভায়া গাজি মিঞা বাঘটা কতদূরে॥
বলিতে বলিতে বাঘা দাগা দিল গিয়া।
ল্যাজটা নাবায়ে লম্ফে নাকসাট দিয়া॥
ভয়ে মিয়াগণ যত ছুটারে হুতাশে।
বোবা হোলো তোবা তোবা কেহ কহে ত্রাসে॥
হাম্মাম আদম বা খোদার কদম।
হুতাশে একদা হাবা হইল বেদম॥

তা প্রবল শত্রুকে পাকচক্রে একটু নাকালে ফেলিয়া হাসিবার ইচ্ছা কার না হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ঘনরাম চক্রবর্ত্তী মুসলমান-দের বলবীর্য্যের অপলাপ করেন নাই, তাহা-দের সম্বন্ধে যাহা যথার্থ সত্য তাহাও বলিয়া গিয়াছেন—

সমর কুশল বলি মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক কটী সবে খায় বাঁটী
বলে পাসরে আপনা॥

এই কয়টী ছত্রে মুসলমানগণের প্রভুত্বের সূত্র প্রকটিত হইয়াছে, আমরা যাহা হারাইয়া-ছিলাম তাহা উহাদের ছিল তাই তাহাদের

অভ্যুদয়, আমাদের পতন। তবে সুখের মধ্যে এইটুকু যে, সে পতন যতই গভীর হউক সত্যের অপলাপ করিয়া বা নিজেদের বড়াই করিয়া শত্রুর কুৎসা করিয়া পসার বৃদ্ধি করার প্রবৃত্তি তখনও আসে নাই।

যাক সে কথা—আমরা কবির ভাষার কথা বলিতেছিলাম, তাহাই আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিতে ইচ্ছা করি। কবি ঘনরামের সময়ে কাব্যাদি সাহিত্য লিখিত হইত বটে, কিন্তু তখন ছাপার ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণের অধিগম্য করিতে হইলে কবিতাগ্রন্থ গান করিয়া শুনান হইত। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যও এইরূপে গীত হইত, এইজন্য কবি ইহাকে "সঙ্গীত" আখ্যা দিয়াছেন। "সঙ্গীত" জিনিষটা সকলেরই ভাল লাগে, সেজন্য ছোট বড, পণ্ডিত অপণ্ডিত, স্ত্রী, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই উহা শুনিতে আসিত। "ধর্ম্মের গান" অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল এবং তাহার শ্রোতৃবর্গ বাছাই করিয়া লওয়া হইত না। এরূপ স্থলে কবি যদি সর্ব্বদা সপ্তমে চড়িয়া থাকেন এবং কাব্যটীকে খুব জাঁকালো করিবার অভিপ্রায়ে বাছিয়া বাছিয়া সংস্কৃত কথা ছাড়িতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার "সঙ্গীতের" উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। এই কারণে প্রাচীন কবিগণ অধিকাংশ স্থলেই সহজ ও কথিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই আজও বঙ্গের আপামর সাধারণ রামায়ণ মহাভারতের অমৃতময়ী কথার সহিত পরিচিত থাকিয়া চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতি কাব্যের রসাস্বাদ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছে। রামায়ণাদি গান এখন দেশ হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কিন্তু এখনও যে দুই অক্ষর যোজনা করিতে শিখিয়াছে, সে-ই রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া হৃদয় সরস করিতে পারিতেছে। কাব্যের উদ্দেশ্য মূলতঃ আনন্দ-দান, গৌণতঃ মনুষ্যহৃদয়কে ঊর্দ্ধে উত্থাপন। অতএব উহা যত অধিক লোকের অধিগম্য হয় ততই ভাল।

প্রাচীন কবিরা এইজন্য তাঁহাদের কাব্য মধ্যে কথিত ভাষার প্রসার করিয়া দুইটী উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন—প্রথম, জনসাধারণকে কাব্যরসের আস্বাদপ্রদান এবং দ্বিতীয়, ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পথ পরিষ্কৃত করা। তাঁহারা ঐ কথাগুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাদেশিকভাষা-সংগ্রাহকগণের অশেষ সুবিধা হইতেছে। এই হিসাবেও প্রাচীন কাব্যগুলির চর্চ্চা হওয়া অত্যাবশ্যক। এখনকার একটা মত এই যে, ভাষাকে সজীব রাখিতে হইলে কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার ভিতর ব্যবধান যত কম থাকে ততই মঙ্গল এবং এই মতাবলম্বী অনেক সুধী সহজ কথিত ভাষায় গদ্যও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এখন আবার প্রাচীন কবিগণের অবলম্বিত পথই প্রশস্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে এবং অনুসৃতও হইতেছে। তবে এ পথের একটা বিষম বিপদ—গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতা। আমরা অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা এই দুই শব্দ আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার করিলাম। প্রাচীন কাব্যের অনেক স্থলে এই দুই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সহজ কথায় কাব্য গ্রথিত করিয়া

তাঁহারা জনসাধারণের যে উপকার করিয়াছিলেন তাহা এই দোষগুলি দ্বারা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। কবি ঘনরাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য এই সহজ ভাষার উপকরণেই গঠিত করিয়াছেন এবং সেই ভাষা লইয়া বেশ কৌশলবিন্যাস করিয়াছেন। অবশ্য কেহই এরূপ আশা রাখেন না বা রাখিতে পারেন না যে, ঘনরামের ভাষা ভারতচন্দ্রের ভাষার মত সুসজ্জিত বা চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষার ভিতরও এমন একটা অনায়াস ভঙ্গি, সহজ-সারল্য ও আন্তরিকতা আছে যাহাতে অনুপ্রাসবহুল হইলেও তাহা কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট নহে এবং সেই সেই স্থলে কবির সরসতা ও সহৃদয়তা যেন আরও অধিক মাত্রায় উছলিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। কাব্যের যেখানে সেখানে এই কথার নিদর্শন পাওয়া যাইবে, অতএব আমরা উদাহরণ বাহুল্যে সময়ক্ষেপ করিতে চাহি না। ফলতঃ তাঁহার ভাষার মধ্যে যে রসিকতার প্রবাহ আছে তাহা পুনর্ব্বার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আবির্ভূত হইয়াছে। লিখিত ও কথিত ভাষার সুন্দর সম্মিলন —ইহাই ঘনরামের ভাষার বিশেষত্ব। বিশেষত্ব বলিলাম এইজন্য যে, যদিও সকল প্রাচীন কবিই এইরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি ঘনরামেই উহার কলানৈপুণ্যের প্রথম বিকাশ। আমরা একটীমাত্র চিত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিব—সে চিত্র রঞ্জার বাসরচিত্র,—

হাসিয়া হরষে দাসী আসি লঘুগতি।
বাসরে যতনে জ্বালে রতনের বাতী॥
কিবা শোভা করে সেই শয়নের শালা।
মাঝে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা॥
চারুচিত্র চৌপলচামরে গেছে ছেয়ে।
অনিমিষ রহে চক্ষু যদি দেখে চেয়ে॥
যতনে ছাউনি চারু চামরের চাল।
বিচিত্র বসন কত রতনমিশাল॥
চারি ভিতে বিরাজে বিনোদ বনমালা।
পুরট পালঙ্কে তথি পড়িল প্রবলা॥
মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফুলঝাটী।
নেলিন পালঙ্ক তায় পাতাইল পাটী॥
গুজরাটী ছিট ভোট সেই তার খাসা।
দু'দিকে বালিশ রাখে আলিসবিনাশা॥
নর্ত্তিত অমিত হেন রচিত শিয়র।
শোভিত তড়িতযুত যথা জলধর॥
দু'পাশে পরটপথ পাটের থোপনা।
পালঙ্ক চৌদিকে চিত্র দোখরি দোলনা॥
রচিত মসিরা তায় চাপা চন্দমালি।
সৌরভগৌরবে কত গুঞ্জরিছে অলি॥
রচিল সুখদশয্যা যেন পয়ঃফেন।
শয়ন করিবে তায় রায় কর্ণসেন॥

ইহাতে ছন্দের যে চঞ্চলগতি ও নৃত্য আছে তাহা আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই নাই; ইহার মধ্যে যে অনুপ্রাসের সহজ লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আবার ঈশ্বর গুপ্তের ;—

বিবিজান চলে যান লবেজান্ করে।

ইত্যাদি কবিতায় দেখা দিয়াছে। নিতান্ত নিত্যব্যবহৃত চলিত কথার সাহায্যে ঘনরাম এইরূপ অনুপ্রাসের ছটা প্রকাশ করিয়াছেন—বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যে প্রথম—

(১) "লুট করি মোট বান্ধে চিঁড়া লাড়ু মুড়ি।"
(২) ফকীর হইনু বলি ফুকারিয়া কান্দে।
(৩) কালসাঁজি হ'তে কাল, কাল হ'লো নিন্দ।

(৪) মীনমুখে মাছরাঙ্গা মানায় মহত।
 প্রিয়া মুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥
(৫) ঘোর রবে বুকণি উঠিছে ঘন ঘন।
 প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন॥

বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশকল্পে ঘনরামের ভাষা অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বঙ্গভাষাকে গ্রাম্যভাষা হইতে অনেকটা উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাকে সাধুভাষায় উন্নীত করিতে পারেন নাই। সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র। ভাষা সজ্জিত করিবার অনেক উপাদান ভারতচন্দ্র ঘনরামের কাছে পাইয়াছিলেন, তবে ভারতচন্দ্র আরও অনেক স্থল হইতে তাঁহার বাক্য সুসজ্জিত করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিশেষতঃ ছন্দ সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব-কবিদিগকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করায় তাঁহার কাব্যে ছন্দের যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, ঘনরামে সে বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি পয়ার, ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী এই তিনটী প্রচলিত ছন্দ লইয়াই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘনরাম চক্রবর্ত্তীই প্রথমে ঐ প্রচলিত ছন্দগুলির মধ্যে একটা চঞ্চল হিল্লোল একটা তালের তরল নৃত্য প্রদান করিয়া ঐগুলিকে সচরাচর প্রচলিত পয়ারাদি অপেক্ষা একটু স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিয়াছেন। এক আধটা নূতন ছন্দ যে তিনি আবিষ্কৃত করেন নাই তাহা নহে, অথবা বোধ হয় এ কথা বলিলেই ঠিক হয় যে এক আধটা নূতন রকমের ছন্দ তিনি বৈষ্ণব-কবিদের কাছ হইতে লইয়াছিলেন, কিন্তু সে ছন্দের সদ্ব্যবহার তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অর্থাৎ ছন্দটাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন নাই, তাহা না হইলেও ঐটা পরে যে একটা সুশ্রাব্য ছন্দে পরিণত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিতে পাইব। ছন্দটী ত্রিপদীরই প্রকার বিশেষ, যথা—

 রাজার বিবাহ উল্লাসে
সবিতা সম ছটা সম্মুখে দ্বিজ ঘটা
 রাজা বসিল অধিবাসে॥
আরোপি হেমঘটে প্রথমে পাণি পুটে
 পূজা প্রণামে কৈল তুষ্টি।
কেশব দিনপতি হরিহর হৈমবতী
 প্রজাপত্যাদি গ্রহ ষষ্ঠী।
 ইত্যাদি।

ইহার বীজ বৈষ্ণবকবিতায়

মুখমণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোরহ
 ভালহি অষ্টমিক চাঁদ।
মধুরিপু নরম ভরম যাহা ঐ ছন
 তাহে কি গণিয়ে মতিমন্দ॥

ইত্যাদি ছন্দে।

এবং ইহার পরিণতি রবিবাবুর—

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধিহে।
পূজার তরে হিয়া, উঠে গো ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে।

এই ছন্দে।

এই ছন্দেরই অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া ঘনরাম আর একটী ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—

রঙ্গিণী রণজই দুন্দুভি বাজই
 ঘনঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মল্লপুত যৈছন যমদূত
 সমযুত যুঝে খানসামা॥

দাদালিয়া দলবল মহীমাঝে মাতল
মানব মহিমে দানা দম্ভে।
ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দানাগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে॥

এ ছন্দও সুসজ্জিত বেশে ভারতচন্দ্রে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু বিষয়ের দোষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার উপায় নাই। এই দুইটী ভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলে নূতন ও বৈচিত্র্যময় ছন্দ আরও পাই। ঘনরাম সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের প্রয়াস পান নাই।

মিত্রাক্ষর রচনায় ছন্দের পারিপাট্যের উপর কাব্যের অনেকটা সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণীশক্তি নির্ভর করে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। মিত্রাক্ষরের যেমন অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে, আবার তেমনি অনেক বিষয়ে অসুবিধাও আছে। আমাদের মনে হয় যে কতকগুলি রস—যেমন বীর রস প্রভৃতি—অমিত্রাক্ষরের সাহায্যে তেমন সুন্দর করে অভিব্যক্ত হয় না। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে অনেকগুলি যুদ্ধের বর্ণনা আছে, কিন্তু কোনটাতেই যেন উত্তেজক শক্তি নাই—বর্ণনার দোষে ততটা নয় যতটা ছন্দের দোষে, মিত্রাক্ষরের স্বাভাবিক লঘুত্ব ও চপলতার দোষে। নচেৎ ঘনরামের সময়ও বাঙ্গালী "ভেতো" বাঙ্গালীতে পরিণত হয় নাই, তখনও কবির কল্পনায় কেবল বাঙ্গালী পুরুষের নহে, বাঙ্গালী রমণীরও অদ্ভুত বীরত্বের কথা উদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল। কলিঙ্গা ও কানাড়ার যে বীরত্ব-কাহিনী কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কেবল কথার বীরত্ব নহে, কাজের বীরত্ব। মাইকেলের প্রমীলা নির্ভীক-হৃদয়া বটে, কিন্তু তাহার যথার্থ বীরত্ব ছিল কি না তাহা আমরা জানিতে পারি না, কারণ তাহার বীরত্ব ও অসমসাহসিকতা কেবল কথায় পর্য্যবসিত থাকিয়া গিয়াছে, কাজে প্রকাশিত হইবার অবসর পায় নাই। কলিঙ্গা ও কানাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং একজন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে ও অন্যজন যুদ্ধ জয় করিয়া আততায়ীর দর্প চূর্ণ করিয়াছে। অথচ কলিঙ্গা ও কানাড়াকে—বাঙ্গালী আমরা—একেবারে ভুলিয়া গিয়া প্রমীলার

"রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে।"

ইত্যাদি দর্পোক্তি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম—মাইকেলের সময় হইতেই আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রাচীন বিষয়ের প্রতি আস্থাহীন ও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছি, এবং দ্বিতীয়—মাইকেলের ছন্দের প্রবল আকর্ষণ। মাইকেলের তেজোব্যঞ্জক কথায় কলিঙ্গা ও কানাড়ার তেজোব্যঞ্জক কার্য্যকেও যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর একটা অদ্ভুত বীর রমণীর চরিত্র ঘনরামের কাব্যে আছে, কিন্তু সে বিষয় এখন উত্থাপন না করিয়া তাঁহার চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ-প্রতিভার কথা বলিবার কালে বলা যাইবে। আমরা এতক্ষণ এই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মিত্রামিত্র-ছন্দ-ভেদে রস-প্রকটনে অনেক তারতম্য হয়। মিল গুছাইতে গিয়া তেজের কথা যেন তেমন জোরের সহিত বলা হইয়া উঠে না; ওজস্বিতার দিকে দৃষ্টি না গিয়া মিলের দিকে দৃষ্টি যাওয়াতে ভাষার ও ছন্দের সবলতা রক্ষা করা যায় না। বীররসের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে অমিত্রাক্ষরই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়।

কিন্তু ঘনরামের সময়ে অমিত্রাক্ষর ছিল না, তাই তাঁহার বীররসের চিত্রগুলি অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ ও আকর্ষণীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এতৎসত্ত্বেও বাঙ্গালী রমণীর শৌর্য্য ও বীরত্ব আঁকিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিবার প্রশংসা একমাত্র ঘনরামেরই প্রাপ্য।

আমরা এতক্ষণ ঘনরামের ভাষা ও ছন্দের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, এবার ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের বাহ্যোপকরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা বলিয়াছি যে ঘনরাম ভাবালঙ্কার বড় একটা ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার উপমাদি অলঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। তবে রসের স্থলে অলঙ্কারের সুব্যবহারও দেখা যায়। যথা—

(১) চকোর চকোরী নাচে চাহিয়ে চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥

(২) নিশিনাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রামায়া।
উপনীত গোবিন্দ তনয় সুত-জায়া॥
রাতুল বরণরুচি অরুণ উদিত।
নিরখিয়া নিশাপতি হইল লজ্জিত।
উড়ুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ॥

(৩) কবরী রচিয়া দিল চন্দনের রেখ।
মঘমালা-তড়িত জড়িত পবতেক॥
কপালে সিন্দূর ফোঁটা প্রভাতের রবি।
চন্দন চন্দ্রিমা কোলে কজ্জলের ছবি॥

(৪) নূতন যৌবন শোভা শরীর সুঠাম।
কলেবর কান্তি কিবা কনধৌত দাম॥

(৫) বাণিজ্যে ভারতভূমে এসেছি সবাই।
ফুরাল বাজার হাট নিজঘরে যাই॥

(৬) বায়স কেমনে হবে বিনতার সুত।
শৃগাল হইবে হরি এ বড় অদ্ভুত॥
খদ্যোত কেমনে হবে সবিতা সমান।

(৭) শালূর সমুখে যেন সামান্য সাপিনী।
কুঞ্জর নিকরে যেন গুঞ্জরে সিংহিনী॥

কিন্তু প্রকাণ্ড ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের মধ্যে এইগুলি যেন একপ্রকার অদৃশ্যই হইয়া আছে। এই জন্য এ কথা বলিলে কোনও দোষ হয় না যে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে অলঙ্কার নাই বলিলেও চলে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান দোষ ইহার বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব। এই দোষ আমরা কবিকঙ্কণেও দেখিয়াছি; ধর্ম্মমঙ্গলে ইহার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। একই কথা ইহাতে বারবার দেখা যায়। বহুবার এক বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে, কবি একই ভাষার সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করেন। বরং ভাবের পুনরাবৃত্তি সহ্য যায়, কিন্তু তাহার সহিত যদি কথারও পুনরাবৃত্তি আসিয়া জোটে, তাহা হইলে অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া পড়ে। এইরূপ পুনরাবৃত্তি এই কাব্যে এক আধবার নহে, রাশি রাশি আছে, এই জন্য কাব্যের যথেষ্ট সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। যদি কেবল এই দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে দীনেশ বাবুর নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনা ন্যায্য বটে :—"পাঠক এই কাব্যের আদ্যন্ত ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোন স্থলে তাঁহার চক্ষুকোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভব নাই। বর্ষাকালে জানালা খুলিয়া অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে; অবিরত জলের টুবটাব্ শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ুবেগে তরুরাজির শির-আন্দোলন লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহূত জাগিয়া উঠে;

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের একঘেয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুবটাব শব্দের ন্যায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে।" এবং—"উপসংহারে বক্তব্য ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত একঘেঁয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।"

কিন্তু এ সমালোচনা সমগ্র ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের যথাযথ সমালোচনা নহে তবে ইহা যে আংশিক সত্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দীনেশ বাবু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার ভাল অংশগুলিই তিনি বাদ দিয়াছেন, এবং সেই সকল অংশগুলি বাদ দিয়া নিজের একটা মত খাড়া করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই আমরা আভাস দিয়াছি যে ধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যে ভাল জিনিষ আছে, এবং এমন উৎকৃষ্ট বস্তু আছে যাহার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব, এবং এখন এইটুকু বলিয়া রাখিব যে, কবি ঘনরামকে হোমর, ভার্জিল, বাল্মীকি বা মিল্টনের সহিত তুলনা করা অতিবাদ হইলেও; তাঁহার কাব্যে এমন বস্তু আছে যাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরের ও শিক্ষার আধার হওয়া উচিত। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী খুব ক্ষমতাপন্ন কবি, এ কথা আমরা বলিতে চাহি না; মুকুন্দরামের কবিত্ব ইঁহার কবিত্ব অপেক্ষা অনেক পরিপুষ্ট. এমন কি কোনও কোনও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের কবিত্বও ইঁহার কবিত্ব অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সে কথা বলিতে বাধা নাই। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর অদ্ভুত নাট্যকৌশল ঘনরামে নাই, ভারতচন্দ্রের চিত্রাঙ্কণ প্রতিভার পরিচয়ও আমরা ঘনরামে দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি ছিল না, এ কথা আমরা বলি না, বরং যে দু'এক স্থলে তিনি প্রকৃতির সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সরলতার নিদর্শন দেখিতে পাই, ভাষাও উপভোগ্য, তবে গ্রাম্যতা বর্জ্জিত নহে।

ইহাতে যেমন—

কুসুম কাঞ্চন কুন্দ করবী টগর।
জাতী যূথি ওড় জবা অতি শোভাকর॥
মনোহর মল্লিকা মালতী সুমাধবী।
বিকশিত চন্দ্রমালা চাঁপা হেমছবি॥
সুরঙ্গ তুলসী কত মনোহর ফুল।

আছে, তেমনি আবার

বন বেত বৈঁচি বাবলা বাজি বেলা।
ঝোপ ঝাপ ঝাউঝাঁটি ঝিটি সবসলা॥

আছে। যেমন

চারিভিতে তরুলতা পশুপক্ষিগণ।
সমাকুল শতদলে খঞ্জনী খঞ্জন॥
চকোরী চকোর নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥

এবং

প্রিয়া মুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত।

ইত্যাদি সুন্দর বর্ণনা আছে, তেমনি

টেঁটারি টৌটক টিয়া চটকা চটকী।
ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী॥

ইত্যাদি গ্রাম্যবর্ণনাও আছে।

আবার কেবল প্রকৃতির বর্ণনাও আছে—

(১) দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত মন॥

প্রফুল্ল কুসুমাকীর্ণ গন্ধে আমোদিত।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরী গায় গীত॥
নূতন পল্লবে ফলে সুশোভিত বন।
পক্ষিগণ সুস্বর সংগীতে হরে মন॥
মন্দ মন্দ বহে তায় বসন্তের বা।
(২) কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গুঞ্জরে।
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য মহোৎসব করে॥
ডালে বসে ডাকে শুক প্রেমে পুলকিত।
ভ্রমর ভ্রমরীগণে গানে বিমোহিত॥
(৩) গত ঋতু বরষা, শরত উপনীত।
আদরে অমল ইন্দু আকাশে উদিত॥
বিকশিত কমল প্রকাশে পতি পুনা।
শরৎ কুসুমে কত কাননের ভূষা।
(৪) প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ তোলে দুকূল উথলে॥
কুল কুল কুরব কমলে কাণে কাণ।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ।
ঘোর রবে ঘূর্ণী উঠিছে ঘন ঘন।
প্রমাদ পাড়িল প্রাণ প্রচণ্ড পবন।
চড় চড় চড়ম চৌদিকে ভাঙ্গে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারে সমূল॥
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেণ।

তা অধিক প্রশংসার যোগ্য না হউক, এই চিত্রগুলি যে উপভোগের সামগ্রী নহে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানি যে সর্ব্বত্র সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইহাতে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা কাব্যের অঙ্গ না হওয়াই উচিত ছিল; ইহার রুচি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় তাহাও বলা যায় না; ইহার ভাষা অনেক স্থলে ভদ্রোচিত নহে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি নিতান্ত একঘেয়ে, এবং ইহাতে অনুকরণ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত পরিস্ফুট। এত দোষ সত্ত্বেও কিন্তু আমরা দীনেশ বাবুর সহিত একমত হইয়া বলিতে পারি না যে, এই কাব্যে ঘুমের ঘোর ভিন্ন আর কিছুই নাই। বরঞ্চ বলিতে হয় যে, এই কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা অনেক কথা শিখিতে পারি, অনেক কথা জানিতে পারি এবং ইহা হইতে ভাবিবার বিষয়ও অনেক পাইতে পারি। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানি একটা বিরাট গ্রন্থ এবং আমরা দুর্গা বলিয়া ইহা আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছি। দীনেশ বাবুর কাছে ধৈর্য্যের জন্য প্রশংসার্হও বোধ করি, হইয়াছি। কথিত আছে শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত লিখিয়া নিজ মাতুল মম্মথ ভট্টের কাছে সমালোচনার্থ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে বাপু তোমার কাব্যখানি যদি আগে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে কাব্যে দোষদর্শন করিবার জন্য আমাকে চারিদিকে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইত না। ইচ্ছা করিলে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত সকল দোষ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে ভূরি ভূরি বাহির করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই। আধুনিক সমালোচন-পদ্ধতি অবলম্বনেও ইহাতে রাশি রাশি দোষ বাহির হইতে পারে। তাহা হৌক,—তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য বাঙ্গালী মাত্রেরই আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত, পাঠ করিলে সময়ের অপব্যয় হইবে না। কেন হইবে না তাহা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

গ্রহদিগের কক্ষা

ক প্রকারে অনন্ত মহাকাশে সহস্র সূর্য্যের সমান অসংখ্য জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হইল এবং এক একটি জ্যোতিষ্ককে ঘেরিয়া যে সকল গ্রহ-উপগ্রহ ধূমকেতু অবিরাম ছুটাছুটি করিতেছে তাহারাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, এই মহাপ্রশ্ন প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সহিত মানবের মনে উদিত হইয়াছিল অনৈতিহাসিক যুগ হইতে যে, কত কিম্বদন্তী কত অনুমান এই ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়া আছে, সত্যই তাহার ইয়ত্তা হয় না। জড়ের নব নব ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া এবং জড়কে নব নব মূর্ত্তিতে দেখিয়া যে বিজ্ঞান এখন উন্নতির পথে প্রতিদিনই অগ্রসর হইতেছে, তাহাও প্রাচীন মানবের মনের সেই প্রাচীন প্রশ্নটির উত্তর দিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। এই চেষ্টা কতদিনে সার্থকতা লাভ করিবে জানি না। যুগে যুগেই সৃষ্টিতত্ত্বের নূতন নূতন কথা শুনা যাইতেছে, আমাদের পিতামহগণ, যে সিদ্ধান্তের পরিচয় পাইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের একটা কিনারা হইল ভাবিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে আমরা তাহাকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি এবং কোনো নূতন সিদ্ধান্ত দ্বারা সৃষ্টি-রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই প্রকারে অবিরাম পুরাতনের বর্জ্জন এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা চলিতেছে বলিয়া আমাদের খেদ করিবার কিছুই নাই, প্রত্যেক সিদ্ধান্তই আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন নূতন সম্পদ প্রদান করিতেছে, এবং সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলাইতে গিয়া আমরা নব নব প্রাকৃতিক তত্ত্বের সন্ধান পাইতেছি। প্রকৃতির কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমরা এই প্রকারে যাহা লাভ করিতেছি তাহা বাস্তবিক অতুলনীয়।

জর্ম্মান্ পণ্ডিত কাণ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গে আভাস দিয়াছিলেন, এই যে বুধ বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ পরিবৃত হইয়া সূর্য্য মহাকাশে বিরাজ করিতেছে তাহা কোন জ্বলন্ত বাষ্পাকার নীহারিকা রাশি হইতেই উৎপন্ন। ফরাসী গণিতবিদ্ লাপ্লাস্ (Laplace) সাহেব কাণ্টের ঐ কথারই সমর্থন করিয়া তাঁহার নীহারিকাবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত জর্জ্জ ডারুইন প্রভৃতি মনীষিগণ নীহারিকাবাদের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। নীহারিকাবাদের মূল অবলম্বন করিয়া যে সকল জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না, এখন সেগুলিই তাঁহাদের নজরে পড়িতেছে এবং অব্যাখ্যাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়া কোন নূতন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে নূতন সিদ্ধান্তের আভাস দিতেছেন, তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাপক জর্জ্জ ডারুইন্ তাঁহার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া যে এক অব্যাখ্যাত জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই আভাস দিব।

পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ছোট বড় গ্রহগুলি যে পথে সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সহস্র সহস্র বৎসরের পর্য্যবেক্ষণে গ্রহগণকে সেই সকল পথ হইতে একটুও বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। এই ব্যাপারটি আমাদের খুব সুপরিচিত হইলেও বড়ই বিস্ময়কর। কেবল ইহাই নয়, —সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের দূরত্ব পরিমাপ করিলে, দূরত্ব-গুলির মধ্যে যে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহা আরো বিস্ময়কর। ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ছয় তিনের দ্বিগুণ, বারো আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যাদি। কাজেই শূন্যকে ছাড়িয়া দিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক রাশিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাশির দ্বিগুণ হইতে দেখা যায়। এখন যদি প্রত্যেকের সহিত চারি যোগ করা যায়, তবে সংখ্যাগুলি—৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২ এবং ১০০ হইয়া দাঁড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের দূরত্বের অনুপাত প্রায় ৪, ৭, ১০ ইত্যাদিরই অনুরূপ।

গ্রহগণের দূরত্বের এই অদ্ভুত নিয়মটি জর্ম্মান্ জ্যোতিষী বোড (Bode) সাহেব হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন জ্যোতিষীই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সৌর-জগতের সীমান্তবর্ত্তী নেপ্‌চুন্ গ্রহটিকে ও তাহার উপগ্রহগণকে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে দেখা যায় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া গ্রহ-বিন্যাসের নিয়মটি যে, প্রকৃতির একটা খেয়াল এ কথা কখনই বলা যায় না। গ্রহগণের কক্ষার (অর্থাৎ পরিভ্রমণ-পথের) স্থিরতা এবং সূর্য্য হইতে তাহাদের দূরত্বের শৃঙ্খলা যে, সৃষ্টির সময়কার কোন বিশেষ অবস্থার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

জর্জ্জ ডারুইন্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নিহারিকাবাদে অবিশ্বাসী হইয়া বলেন, এই যে নানা গ্রহ-উপগ্রহাকীর্ণ সৌরজগৎ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে এক সূর্য্যই বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্য হয় ত কোন নিহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, কিন্তু পৃথিবী, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ প্রথমে সেই নিহারিকার অঙ্গীভূত ছিল না। বৃহদাকার সূর্য্যই মহাশূন্য হইতে উল্কাপিণ্ডাকার বহু জ্যোতিষ্ক টানিয়া লইয়া নানা গ্রহাদির উৎপত্তি করিয়াছে। জর্জ্জ ডারুইন্ তাঁহার নব সিদ্ধান্তের এই মূল কথাটিকে ধরিয়াই গ্রহ-উপগ্রহাদির কক্ষার স্থিরতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ডারুইন্ যে গবেষণা করিয়াছেন তাহার আমূল উচ্চ অঙ্গের গণিতে পূর্ণ, আমরা গণিতের কথা যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া বিষয়টি মোটামুটি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

জ্যোতির্ব্বিদ্যার যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জ্যোতিষ্ক-লোকের অতীত জীবন আলোচনার ফলেই সুলভ হইয়াছে। দূর ভবিষ্যতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যবস্থা কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহার আভাস বর্ত্তমান অবস্থায় পাওয়া যায় না; ইহারা অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইবার সময়ে যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহাই জীবনের ধারা দেখাইয়া দেয়। এই কারণে

কোন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে গ্রহ-নক্ষত্রের জটিলতা-বর্জ্জিত প্রথম অবস্থার কথা স্মরণ করিতে হয় এবং সেই অবস্থাটাই ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে কি প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিতে হয়। জর্জ্জ ডারুইন্ এই প্রকারেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মনে করা যাউক যেন সৌরজগতে সূর্য্য এবং আর একটি জ্যোতিষ্ক ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই জ্যোতিষ্কটিকে বৃহস্পতিই বলা যাউক; ইহা যেন কোন চক্রাকার পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তা'র পরে মনে করা যাউক, একটি উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র গ্রহ সৌরজগতে প্রবেশ করিল এবং যে সমতলে বৃহস্পতি সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, নূতন জ্যোতিষ্কটি সেই তল অবলম্বন করিয়া কোনো নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিয়া চলিল। এই প্রকার অবস্থায় এই তৃতীয় জ্যোতিষ্কটির গতিবিধি কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সহজ বুদ্ধিতে হয় ত একটা উত্তর দিয়া ফেলি। কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া এত সহজ নয়। নিপুণ গণিতবিদ্‌গণকেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন তিনটি জ্যোতিষ্কের গতিবিধি নির্দ্ধারণে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। গণিতের চুলচেরা গণনার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া আমরা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, সূর্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় দুইটা বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র গ্রহটির গতি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িবে। নিজের গন্তব্যপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য বা বৃহস্পতির নিকটবর্ত্তী হইলে তাহা অতি দ্রুত-বেগে উক্ত গ্রহদের নিকটে ছুটিয়া যাইবে এবং কোনো গতিকে যদি উহাদের কবল হইতে রক্ষা পায়, তবে সে অতি মন্থর গতিতে দূরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু সূর্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় দুইটা প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ককে ফাঁকি দেওয়া অধিক দিন কখনই চলিবে না; সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে গিয়া এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন তাহা ভীম গতিতে সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কাজেই সূর্য্য ও বৃহস্পতির রাজ্যের নবাগত ক্ষুদ্র অতিথিটির আর অস্তিত্বই থাকিবে না।

এখন মনে করা যাউক, যেন সূর্য্য ও বৃহস্পতির রাজ্যে একটি গ্রহাকার অতিথির পরিবর্ত্তে শত শত ছোট উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিয়া বিচিত্র পথে বিচিত্র গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ছোট হওয়া বড় বিপদ্; বড় ছোটকে নিজের অধীনে রাখে; তার পরে ছোটরা যে দল পাকাইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে, তাহারও উপায় থাকে না, কারণ ছোটদের শক্তি অল্প। কাজেই এই শত শত অতিথির দশা পূর্ব্ব উদাহরণের একক অতিথির অনুরূপই হইবে। রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবা-মাত্র কতকগুলিকে সূর্য্য এবং আর কতক-গুলিকে বৃহস্পতি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অবশিষ্ট অতিথিরা হয়ত দুই চারবার সূর্য্য বা বৃহস্পতির অতি নিকটে আসিয়া পলাইতে পারিবে, কিন্তু একেবারে মুক্তিলাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটিবে না। ইহাদের অধিকাংশই সূর্য্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে, এবং অবশিষ্টগুলি বৃহস্পতির ভাগে পড়িবে। কোন্ উল্কাপিণ্ড সৌররাজ্যে প্রবেশ করিয়া কতদিন পরে সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে নির্ব্বাণ লাভ করিবে

তাহা বলা কঠিন। যে দিক ধরিয়া এবং যে গতিতে উল্কাপিণ্ডগুলি সৌরজগতে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রত্যেকের নিষ্কাশনের কাল সেই দিক ও গতির উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেটি খুব অনুকূল গতি ও দিক্ লইয়া বৃহস্পতি বা সূর্য্যের অধিকারে প্রবেশ করিবে, তাহার জীবনও দীর্ঘ হইবে। সহস্র সহস্র উল্কাপিণ্ডের ক্ষুদ্র-গ্রহের মধ্যে অন্ততঃ দু'চারিটির এইপ্রকার অনুকূল পথে অনুকূল গতি লইয়া প্রবেশ করা একটুও আশ্চর্য্য নয়। বাস্তবিক সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে আমাদের সুপরিচিত গ্রহদের বা ইহাদের নিরাপদে পরিভ্রমণ করা অস্বাভাবিক। জর্জ ডারুইন্ বলিতে চাহিতেছেন, সৌরজগতের বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি যে সকল গ্রহ নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে তাহারা সকলেই অনুকূল গতি ও দিক্ লইয়া সূর্য্যের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল এই কারণেই তাহাদের কক্ষা স্থির রহিয়াছে। যাহারা প্রতিকূল অবস্থায় আসিয়াছিল, তাহারা সূর্য্য বা অপর কোন প্রতাপশালী গ্রহের টানে ঐ সকল জ্যোতিষ্কে পড়িয়া নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে, ইহারা এখন সূর্য্য বা অপর কোন বৃহৎ গ্রহের অঙ্গীভূত।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, মানুষ যেমন স্বাস্থ্য হিসাবে অল্পায়ু বা দীর্ঘ-জীবী হয়, নক্ষত্র-জগতের গ্রহ উপগ্রহগণও ঠিক সেই প্রকারে তাহাদের গৃহ প্রবেশকালের গতিবিধির অবস্থা অনুসারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, মানুষের জীবন এক দুই দশ বা শত বৎসর বাসী জ্যোতিষ্কের জীবন দুই চারি দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি বৎসর ব্যাপী। কোন গতিকে সূর্য্যের আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ করিবার মত অবস্থা লইয়া যে গ্রহটি সৌরজগতে প্রবেশ করিয়াছে সেটি হয় ত দুচার লক্ষ বৎসর বাঁচিবে, এবং যাহারা আরও অনুকূল অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের জীবন সম্ভবতঃ কোটি কোটি বৎসরেও অবসান হইবে না। কিন্তু মৃত্যুমুখ হইতে তাহারও নিস্তার নাই। চিরস্থির কক্ষায় ঘুরিতে পারে এ প্রকার নিরাপদ পথ ধরিয়া এবং তদনুসারে গতিসম্পন্ন হইয়া হয় ত কোন গ্রহ গৃহ প্রবেশ করে নাই।

মানুষের জীবনটা যেমন ক্ষুদ্র, তাহাদের অভিজ্ঞতাও তেমনি অল্প। অধিক কি, আমরা দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকারও খবর লিপিবদ্ধ রাখি নাই। সুতরাং যে জ্যোতিষ্ক দশ কোটি বৎসর ধরিয়া নিরাপদে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যের কবলিত হইবে, আমরা যদি তাহাকে স্থির-কক্ষা গ্রহ বলি, ইহাতে বোধ হয় ভুল হয় না। জর্জ ডারুইন ও তাঁহার শিষ্যগণ এই শ্রেণীর দীর্ঘজীবী গ্রহ-গণকেই স্থিরকক্ষা-সম্পন্ন বলিতে চাহিতেছেন।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সৌর জগৎ বা অপর কোন নক্ষত্র-জগতের অতিথি গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলি যেন মোটামুটি স্থিরকক্ষা হইল, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহা-দের সুদীর্ঘ বা অনন্ত জীবনের মধ্যে আর কোন বিপদ্ নাই? জর্জ ডারুইন্ এই প্রশ্নের একটা বড় অশুভ উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যে আমাদের পৃথিবী একটা নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্টকালে সূর্য্য,

প্রদক্ষিণ করিতেছে, কোন কারণে যদি সে তাহার কক্ষা হইতে একটু বিচলিত হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! এই যে, একটু অকল্যাণ হইল, তাহা কালে কালে বৃদ্ধি পাইয়া এক সময়ে এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে, তখন আর পৃথিবীর নিস্তার থাকিবে না; অল্পায়ুঃ ভ্রাতৃগণের ন্যায় তাহাকেও সূর্য্যের গ্রাসে পড়িতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগণের ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে কি না জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পণ্ডিতগণ এই প্রসঙ্গের যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ধ্বংসের সম্ভাবনাই দেখা যায়। জর্জ ডারুইন্ যখন সূর্য্য এবং বৃহস্পতি বা অপর কোন জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গণনা করিয়াছিলেন, তখন নবাগত উল্কাপিণ্ডদের গুরুত্বহীন বলিয়াই ধরিয়াছিলেন এবং আরও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মহাকাশে পরিভ্রমণকালীন তাহারা বাহির হইতে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য হিসাবের জটিলতা-বর্জ্জনের জন্যই তিনি এই প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারের কথা মনে করিলে বুঝা যায়, উল্কাপিণ্ডগুলি আকারে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহাদের ভার আছে এবং ভ্রমণপথেও তাহারা বাধা প্রাপ্ত হয়। কাজেই আমাদের গ্রহ-উপগ্রহগণ এখন যে কক্ষায় সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা হইতে কালক্রমে উহাদিগকে অল্পায় বিচলিত হইতেই হইবে এবং বিচলিত হইলে নিশ্চয়ই ধ্বংসমুখে পড়িতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, গ্রহ-উপগ্রহের মৃত্যুবীজ তাহাদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে মানবজাতির বিচলিত হইবার কারণ নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহগণের মৃত্যুর আরও শত শত বীজ প্রোথিত হইয়াছে এবং সেগুলি অঙ্কুরিত হইতেও আরম্ভ করিয়াছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে এগুলির কুফলেই সৃষ্টিলোপের সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব্বের কথাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলির মোটামুটি হিসাবে স্থির-কক্ষা আছে, এবং কতকগুলির নাই। যাহাদের নাই, তাহারা জীবন-সংগ্রামে কিছুদিন যুঝিয়া বৈরিহস্তে আত্মসমর্পণ করে। যাহাদের আছে, তাহারা বাহিরের প্রবল শত্রুর সহিত আপোস করিয়া এবং বাহিরের সহিত নিজের চালচলন মিলাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এখানেও সেই বৃদ্ধ ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সূত্র তলায় তলায় কাজ করিতেছে!

কি প্রকারে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলাদি গ্রহযুক্ত এই বিশাল সৌরজগতের সৃষ্টি হইল এখন বোধ হয় বুঝা কঠিন হইবে না। প্রথমে সূর্য্য এবং বৃহস্পতিই সৌরজগতে রাজত্ব করিত; তারপর দলে দলে উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র গ্রহাকার নূতন অতিথির আগমন হইল। এগুলি যথেচ্ছ প্রকারে যথেচ্ছ পথে ছুটিয়া চলিত। সূর্য্য এবং বৃহস্পতি সুবিধা বুঝিয়া অধিকাংশকে গ্রাস করিয়া পুষ্টাঙ্গ হইল; সৌরজগতে ছোটখাট উল্কাপিণ্ড বা ধূলিকণাও রহিল না; যাহারা সৌরাধিকারে প্রবেশকালে অনুকূল গতিবিধি লইয়া আসিয়াছিল, কেবল তাহারাই টিকিয়া থাকিল।

এই টিকিয়া-থাকা অতিথিগণই এখন এক এক নির্দ্দিষ্ট পথে, নির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদিগকে লইয়াই সৌরজগৎ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, প্রায়ই তাহাদের গোড়ার একটি নিয়মের সন্ধান পাইয়াছেন। জর্জ ডারুইন্ সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যান দিতেছেন, তাহাতে তিনি এখনো কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান পান নাই। ঠিক কোন্ অবস্থায় সৌরজগতে প্রবেশ করিলে নবাগত গ্রহগণ চির নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ করিতে পারে, তাহার সূত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নাই, তা'ছাড় কোন্ গ্রহের কক্ষা স্থির এবং কোনটির কক্ষা বিচলনশীল তাহা নির্ণয় করিবার নিয়ম আজও ধরা পড়ে নাই। কিন্তু এই সকল মূল সূত্রগুলি যে শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—বোড সাহেব গ্রহগণের দূরত্বের মধ্যে যে সুশৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

সমগ্র বিশ্ব যে গোড়ায় এক মহানিয়মের অধীন হইয়া মূর্ত্তিমান্ হইয়া পড়িয়াছে, আজকালকার নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর গঠনের সহিত বিরাট সৌরজগতের সংগঠনের তুলনা করিলেও ইহার লক্ষণ দেখা যায়। জর্জ ডারুইন্ যেমন একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের চারিদিকে শত শত ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব মানিয়া জগতের অভিব্যক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর গর্ভে অপর বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্ সেইপ্রকার শত শত অতি পরমাণুকে (Corpuscles) নিয়ত ভ্রাম্যমান দেখিতে পাইয়াছেন। জ্যোতিষ্কদিগের ন্যায় অতি-পরমাণুদিগের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত, সংযোগ বিয়োগ এবং এক এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না, বরং তাহারই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং যদি বলা যায়, কোনও এক শুভদিনে বিরাট্ জ্যোতিষ্ক জগতের অভিব্যক্তির সূত্র আবিষ্কৃত হইলে, অতি-সূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে যে সূক্ষ্মতম ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডগুলি রহিয়াছে, তাহারও মূল তত্ত্ব জানা যাইবে, তাহা হইলে বোধ হয় অধিক কিছুই বলা হয় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কেন?

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে!

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে।
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—অবতারবাদ

(কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শনের ৫৬৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় ব্রাহ্মসমাজের আলোচনা কেন করি

কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া ব্রাহ্ম সমাজের মতামত লইয়া এতটা নাড়াচাড়া করিতেছি কেন, কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। কাহারও কাহারও নিকটে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রীতিকরও মনে হইতে পারে। অতএব কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল।

আমি যে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি, এমন অনুচিত স্পর্দ্ধা করি না। এই তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আমি যে কোনও গভীর গবেষণা করিয়াছি বা করিতেছি এমনও নহে। পণ্ডিতেরা যেভাবে এসকল নিগূঢ় তত্ত্বের বিচার-আলোচনা করেন, সে ভাবে আমি এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। সে পাণ্ডিত্যের দাবি আমার নাই। আমার নিজের জীবনের অন্তরঙ্গ-ইতিহাসের বিবর্ত্তন-ক্রমকে অবলম্বন করিয়াই,—শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই যে পরমতত্ত্ব, এই সত্য আমার চিত্তে স্ফূরিত হইতেছে। অপরে কোন্ পথ দিয়া এই সত্যলাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা আমি জানি না। আমার নিজের পথটাই কেবল আমি চিনি। এই পথটাই কেবল আমি দেখাইতে পারি। এ পথের কথা বলিবারই অধিকার আমার আছে। আর আমি ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া আসিয়াই ক্রমে এই পথে পৌঁছিয়াছি। অতএব আমার নিকটে যে ভাবে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মতামতের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। আমার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমার পক্ষে এই নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করা সম্ভব; ইহার আর অন্য উপায় নাই। এই কারণে কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া আমাকে বাধ্য হইয়াই ব্রাহ্মমতেরও আলোচনা করিতে হইতেছে। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে এই অন্তরঙ্গ প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

আধুনিক সাধনার তত্ত্বালোচনার প্রণালী

আর সম্ভব হইলেও ইহা কখনই সঙ্গত হইত না। আধুনিক যুগের উদার সাধনা তত্ত্বালোচনার দুইটা প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ যুগে এই পথ ধরিয়াই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। এই পথ দু'টীর একটীকে তুলনার পদ্ধতি এবং অপরটীকে ইতিহাসের পদ্ধতি বলা হয়। ইংরেজীতে প্রথমটীকে Comparative method এবং দ্বিতীয়টীকে Historic method বলে। বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পরের

তুলনায় তাহাদের মধ্যে যে সকল ঐক্য এবং অনৈক্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে ধরিয়া কোন সাধারণ নিয়ম, সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসকে তুলনার পদ্ধতি কিংবা Comparative method বলা যায়। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতেরা, ভারতবর্ষের হিন্দু-আর্য্যেরা, ইরাণের মুসলমানেরা, ইউরোপের খৃষ্টীয়ানেরা আদিতে যে একই মানব-শাখার অন্তর্গত ছিলেন, সম্ভবতঃ একই ভূভাগে বাস করিতেন, এবং নিশ্চয়ই এক আদিম ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক্ ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষার তুলনা করিয়া, তাহাদের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যে বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধুনিক পণ্ডিত-সমাজ এই সকল সিদ্ধান্তের এবং অনুমানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাকেই তুলনার পদ্ধতি কিংবা Comparative method বলে।

কোনও বস্তু বা তত্ত্ব কোন্ মূল বীজ বা সূত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া, কোন্ পথ ধরিয়া, কি কি বিশেষ অবস্থা এবং ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার বর্ত্তমান আকার বা অর্থলাভ করিয়াছে, এই সমগ্র বিবর্ত্তন-ক্রমটীর অভিব্যক্তিই সেই বস্তুর বা তত্ত্বের প্রকৃত ইতিহাস। আর কোনও বস্তুর এই বিবর্ত্তন-ইতিহাসটীর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তাহার প্রকৃতি এবং গতি নির্ণয় করাই ঐতিহাসিক পদ্ধতির কিংবা Historic method এর উদ্দেশ্য। আধুনিক সাধনা এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের এবং তত্ত্বের ক্রমবিকাশের বিবরণটী ধরিয়াই তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম এবং সত্তা মত্ত নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এই পথেই আমিও কৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও আমার অন্তরঙ্গ-জীবন

শাস্ত্র-দর্শনাদি পড়িয়া আমি এ তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। শ্রীগুরুর কৃপায় আমার অন্তরঙ্গ-জীবনের বিবর্ত্তন-ধারাকে অবলম্বন করিয়াই এই তত্ত্ব আমার চিত্তে আপনি স্ফূরিত হইতেছে। শাস্ত্র-বাক্য আমার অন্তরে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই; বরঞ্চ বহু স্বতঃস্ফূরিত তত্ত্বই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। দর্শনের আলোচনা করিয়া আমি এ তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। বরঞ্চ গুরুদেবের অযাচিত-কৃপাগুণে যখন এই তত্ত্বের সামান্য সাক্ষাৎকার পাইলাম, তখনই ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তের আশ্চর্য্য সমন্বয় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমি যে কৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি তাহা আমার ভিতরের বস্তু বাহিরের নহে। ইহা অন্তরঙ্গ-অভিজ্ঞতার কথা, শাস্ত্রের বা দর্শনের কথা নহে। তবে তাহা শাস্ত্রবিরোধীও নহে, দর্শনেরও বহির্ভূত নহে। শাস্ত্র-বিরোধী হইলে, ইহাকে নিজের মনের খেয়াল মনে করিতে পারিতাম্। দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে ইহার সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য না থাকিলে, এতটা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়ত কঠিন হইত। সে বিরোধ যখন নাই, এই সামঞ্জস্য

যখন আছে, তখন এই তত্ত্বকে কোন মতেই মানস-কল্পনা কিংবা সত্যাভাস বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না।

এই তত্ত্ব আমার অন্তরে একটা বিশেষ পথ অবলম্বন করিয়া ফুটিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গ জীবনে ইহার প্রকাশের একটা বিশেষ ক্রম দেখিতে পাই। এই বিবর্ত্তন-ক্রমটী লক্ষ্য করিয়া কোন্ মূল হইতে কোন সূত্র ধরিয়া, কি কি অবস্থার ভিতর দিয়া, এই তত্ত্ব আমার চিত্তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস রচনা করিতে পারা যায়। এই ইতিহাস আমার মানসিক জীবনের ইতিহাসের একটা বিস্তৃত ও বিশেষ অধ্যায়। এই ইতিহাসের ধারাকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের অন্তরঙ্গ-অভিজ্ঞতার এবং মানসিক ক্রমবিকাশের কাহিনীটীরও স্বল্পবিস্তর আলোচনা এবং বিবৃতি করিতে হয়। এরূপ না করিলে আমাকে কেবল পড়া-কথা বা শোনা কথাই কহিতে হইবে। সে কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই, বলিলেও তার কোন বিশেষ মূল্য হইবে না। আর আমার নিজের অন্তরঙ্গ-জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াই এই কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতেছি বলিয়া, ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজের মতামতের আলোচনাও করিতে হইবে। কারণ এই পথে ভ্রমিতে ভ্রমিতেই আমি পরমতত্ত্ব যে কৃষ্ণতত্ত্ব তাহার সন্ধান পাইয়াছি।

কালধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম

কিন্তু এই যে আমার অন্তরঙ্গ-জীবনের কথা বলিলাম, তাহাও ত কেবল আমার নিজের কথা নহে। এখন এই বাঙ্গালাদেশে আমার মতন লক্ষ লক্ষ লোক আছেন, যাঁহাদের অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে আমার জীবনেতিহাসের অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। তাঁরা যা ভাবেন আমিও তাহাই ভাবি। আমি যে ভাবে চিন্তা করি তাঁরাও মোটের উপরে সেই ভাবেই চিন্তা করেন। আমার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থা যাহা, তাঁহাদিগের চারিদিকের অবস্থা এবং ব্যবস্থাও তাহাই। আমি যে সকল সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছি ও বাড়িয়া উঠিয়াছি, তাঁহারাও সেই সকল সংস্কারের মধ্যেই জন্মিয়াছেন ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন। আমি যে নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাঁহারাও সেই শিক্ষাই পাইয়াছেন। যে সকল আগন্তুক চিন্তা, আদর্শ এবং ভাব আমার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছে তাঁহাদের চিত্তও সে সকলের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়াছে। আমরা সকলে, এই যুগে জন্মিয়া, এই নূতন শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া, একই প্রকারের সন্দেহেতে স্বল্পবিস্তর আন্দোলিত এবং একইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া, তটস্থ হইয়া আছি। আমরা সকলেই এক সাধারণ কালধর্ম্মের অধীনে বাস করিতেছি। এই কালধর্ম্মকে আধুনিক ইংরেজীতে Time spirit বলে। এই কালশক্তি অতিশয় বলবতী। যিনি যতই বড়াই করুন না কেন, এই কাল-শক্তির প্রভাব প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আর এই কালধর্ম্মগুণেই আমাদের নিজ নিজ অন্তরঙ্গ-জীবনের সঙ্গে আমাদের সম-সাময়িক সমাজের জনসাধারণের অন্তরঙ্গ-জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ঐক্য

রহিয়াছে। এই জন্যই আমার কথা কেবল আমারই কথা নহে, কিন্তু আমার মতন এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের কথাও তাহাই। এই জন্যই তাঁহাদের নিকটে আমার অন্তরঙ্গ কথারও একটা দাম আছে, আমার নিকটে তাদের নিজের কথারও একটা বিশেষ মূল্য আছে।

এই কালধর্ম্ম প্রভাবেই আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ইহাদের কেহই এই কালধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই। পরন্তু এই কালধর্ম্মই তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ান সমাজের সংসর্গে আসিয়া, ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া এবং ইংরেজের আইন কানুনের অধীন হইয়া, দেশের লোকের মনে যে সকল নূতন চিন্তা, ভাব এবং আদর্শ জাগিয়া উঠে, তাহারই প্রেরণায় ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি হয়। এই সকল নূতন চিন্তা, ভাব এবং আদর্শের সম্মুখীন হইয়া প্রাচীন হিন্দু সমাজে যে সকল অভিনব সমস্যার উদয় হয়, ব্রাহ্মসমাজ তাহারই একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই। বিদেশীয় আদর্শের প্রকাশে স্বদেশের সমাজে নীতি ও আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল সন্দেহ জাগাইয়াছিল, তাহার নিবৃত্তি করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হয়। সে সকল সন্দেহ এখনও নিঃশেষ নিরস্ত হয় নাই। যে সকল চিন্তা, ভাব এবং আদর্শকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, সে সকল চিন্তা, ভাব এবং আদর্শ এখনও স্বল্পাধিক পরিমাণে আমাদিগের শিক্ষিত-সমাজের চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায়, ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভূত না হইয়াও, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, দেশের অনেক লোক যে ব্রাহ্মভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজ তো একটা আকস্মিক উল্কাপাতের মতন শূন্যগর্ভ হইতে এদেশের উপর আসিয়া উড়িয়া পড়ে নাই। যে সকল অবস্থায় পড়িয়া, যে প্রয়োজনের প্রেরণায়, ব্রাহ্মসমাজের মত ও ভাব বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সমগ্র দেশ সেই সকল অবস্থায় পড়িয়া সেই প্রয়োজনের তাড়না অনুভব করিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের একান্ত বিরোধী যাঁহারা তাঁহারাও ইহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। যে সন্দেহের তাড়নায় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রাচীন ও প্রচলিত পন্থা পরিহার করিয়া নূতন পথের সন্ধানে চলিয়াছেন, দেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আধুনিক-ভাবাপন্ন প্রায় সকল লোককেই সেই সকল সন্দেহে স্বল্পাধিক বিচলিত করিয়াছে। কেহ বা এই সন্দেহকে চাপিয়া রাখিয়া যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মতন প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানাদির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কেহ বা নূতন এবং পুরাতনের মধ্যে একটা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দ্বারা গতানুগতিক সমাজধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা প্রচলিত ধর্ম্মের ও সমাজের বাহিরের কাঠামটাকে ঠিক রাখিয়া তাহারই মধ্যে আধুনিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। ইঁহারা

সকলেই বর্ত্তমান কালধর্ম্মের অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হইয়াও, এমন কি প্রকাশ্যতঃ ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত প্রতিবাদী হইয়াও, ইঁহার সকলেই এই কালধর্ম্মবশে, স্বল্পবিস্তর ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছেন। এই কারণে ব্রাহ্মমত এবং ব্রাহ্মভাব কেবল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যেই আবদ্ধ রহে নাই, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টীয় সংস্কার ও হিন্দুর পুনরুত্থান

ইংরাজী শিখিয়া প্রথমে এদেশের লোক খৃষ্টীয় মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের উপরে যে কঠোর আঘাত করিতে আরম্ভ করে, তাহার ফলে দেশের ইংরেজীনবিশেরা খৃষ্টিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, এই আশঙ্কা এককালে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই আশঙ্কা নিবারণ করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রভাবকে প্রতিহত করিতে যাইয়াই, ব্রাহ্মসমাজকে বহুল পরিমাণে একদিকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের এবং অন্যদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, না করিলে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এ কাজটী কখনই হইতে পারিত না। ভাষ্যকার শঙ্করকে যে অর্থে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন; সেই অর্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান্ বলা যাইতে পারে। যে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ এদেশে খৃষ্টীয় মতের প্রভাব প্রতিহত করেন, সেই যুক্তিবাদের ও ধর্ম্মনীতির আঘাতেই তাঁহারা আবার প্রাচীন এবং প্রচলিত হিন্দুসিদ্ধান্ত এবং হিন্দুসংস্কারকেও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। যে যুক্তিতে বাইবেলের প্রামাণ্য নষ্ট হইল, সেই যুক্তির সম্মুখে বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্যও টিকিতে পারিল না। যে যুক্তিবলে ঈশ্বরত্ব নষ্ট হইল, সেই যুক্তির সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বও রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষাতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও নষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রাহ্মচিন্তা এবং ব্রাহ্মভাব দেশময় ছাইয়া পড়িল। কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই প্রভাব প্রতিহত করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আর যে পথে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ খৃষ্টীয় প্রভাব প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, সেই পথে যাইয়াই এই নব্য হিন্দুত্বও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। যে অর্থে ভগবান্ ভাষ্যকারকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান্ বলা যাইতে পারে, সেই অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নব্য হিন্দু সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম বলা অসঙ্গত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্বে" যে অনুশীলন ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। আর যে ভিত্তির উপরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সনাতন বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অপেক্ষা আধুনিক যুক্তিবাদের সম্বন্ধই বেশী ঘনিষ্ঠ। যে প্রণালীতে মেথু আর্ণল্ড এবং রেনাঁ প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদিগণ যীশুখৃষ্টের

জীবন ও চরিত্রকে খৃষ্টীয়ান্ কিম্বদন্তীর জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও মোটের উপরে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই, তাঁর "কৃষ্ণ চরিত্র" রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব" এবং "কৃষ্ণচরিত্র" যতটা পরিমাণে যুক্তিবাদী ব্রাহ্মগণের মনোমত হইয়াছে, সেই পরিমাণে কিছুতেই ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদিগের মনঃপূত হয় নাই; ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। ব্রাহ্মমতের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্বের" এবং "কৃষ্ণচরিত্রের" যতটা মিল আছে, হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে ততটা মিল নাই। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের "ধর্ম্মব্যাখ্যা" সম্বন্ধেও মোটের উপর এই কথাই বলিতে পারা যায়। তর্কচূড়ামণি মহাশয় আধুনিক ইংরেজী শিক্ষালাভ না করিয়াও কতটা পরিমাণে যে ইংরেজীভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন, তাঁর "ধর্ম্মব্যাখ্যাই" ইহার প্রমাণ। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন শিক্ষা ও সাধনার আলোকে প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কারকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। আর তিনি কতটা পরিমাণ যে, আধুনিক যুক্তিবাদের এবং নব্য ব্রাহ্মভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, এ সকলে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কারণেই হিন্দু পুনরুত্থানের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম বলা কিছুতেই অসঙ্গত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কোনও নিন্দার কথাও নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ যে অস্ত্রের দ্বারা প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের শরীররক্ষকদিগকে সেই অস্ত্র সাধন করিয়াই এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। অন্য অস্ত্র এক্ষেত্রে নিতান্তই অনুপযোগী হইয়া পড়িত। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া, যাহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারও যে বহুল-পরিমাণে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিলে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় কেবল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরাই যে ব্রাহ্মভাবাপন্ন কিছুতেই আর এ কথা বলা চলে না।

ফলতঃ যে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে আদিতে ব্রাহ্মমতের উৎপত্তি হয়, সেই ইংরাজী-শিক্ষা এখনও এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। আগে যত লোকে এই শিক্ষা পাইতেন এখন তদপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোক তাহা পাইতেছেন। অন্য দিকে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় সাধনা যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া যে একটা অভিনব সমন্বয়ের ভূমিতে পৌছিবার চেষ্টা করিতেছে, আমাদের দেশের প্রচলিত উচ্চ-শিক্ষা তাহারও বড় সন্ধান রাখে না। অতএব যে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদ ইউরোপীয় সাধনাকে বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে একান্ত অভিভূত করিয়াছিল তাহা এখনও আমাদিগকে অভিভূত করিয়া আছে। এই যুক্তিবাদকে ইউরোপ নানা দিক্ দিয়া দ্রুত-বেগে ছাড়াইয়া উঠিতেছে, কিন্তু আমাদিগের ইংরেজীশিক্ষিত সমাজ এখনও সেই যুক্তি-বাদের মধ্যেই দিশাহারা হইয়া পড়িয়া রহিয়া-

ছেন। এই যুক্তিবাদের উপরেই মামুলী ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা। আর এই যুক্তিবাদের প্রভাবেই যাঁহারা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, এমন কি যাহারা ব্রাহ্ম সমাজের ঘোরতর বিরোধী, তাঁহারাও পচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তকেই আশ্রয় করিয়া পড়িয়া আছেন। তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাদের অনেকেই নিতান্ত নিরাকার-বাদী এবং

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃষ্টমেতৎ বিনশ্যতি—

যাহা দেখা যায় না তাহার ভাবনা অসম্ভব, অথচ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সকলেই বিনাশ-শীল বলিয়া, ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া, প্রতিমাদির পূজা সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহেরা কালী দুর্গা প্রভৃতিকে যে চক্ষে দেখিতেন, নব্য হিন্দুগণ সে চক্ষে দেখিতে পারেন না। কেহ বা লোক-সংগ্রহার্থে তামসভাবে এ সকল অনুষ্ঠান করেন, কেহবা মনঃ সংযমের সহজ উপায়রূপে এ সকল প্রতিমার আশ্রয় করেন, আর কেহ বা আধ্যাত্মিক রূপক জ্ঞানে এ সকলের পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রতিমা পূজায় আভ্যন্তরীণ সত্যটুকুকে প্রকাশ করিয়া আধুনিক সাধনার সঙ্গে তাহার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, এ সকল দেবমূর্ত্তি যে হিন্দুর চক্ষে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর-মূর্ত্তি নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সাধকের সমাধি-লব্ধ ইষ্টমূর্ত্তি মাত্র, এ কথাটাও অল্প লোকেই জানেন এবং বোঝেন। দেশপ্রচলিত প্রতীকোপাসনার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত একদিকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এবং অন্যদিকে আধুনিক ইউ-রোপীয় যুক্তিবাদ এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির একটা সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য হয় নাই। আর যতদিন না এ সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য হইয়াছে, ততদিন বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কিছুতেই আধুনিক ব্রাহ্মমতের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যেমন এই প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে সেইরূপ অন্য সকল বিষয়েও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিবাদি-গণের বহুবিধ তত্ত্বসিদ্ধান্তকে একটু ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেই তাহার মধ্য হইতে মামুলী ব্রাহ্মমতগুলি বাহির হইয়া পড়ে। কিছুদিন হইতে আমাদের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবভাবের প্রতি যে একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যেও কতটা পরিমাণে যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব লুকাইয়া আছে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেহ বা কাব্যরসলোলুপ হইয়া রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর কেহ বা ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মের আসনে শ্রীকৃষ্ণকে এবং জীবের পদে শ্রীরাধিকাকে বসাইয়া আপনি শ্রীমতী হইয়া ভগবানের ভজনা করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। প্রকৃত বৈষ্ণবসাধনায় ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ভক্তের রাধাভিমান গুরুতর অপরাধ মধ্যে পরিগণিত। আর আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত বৈষ্ণবেরা যে এ অভিমান সাধন করিতে চান, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের বৈষ্ণবত্ব নহে কিন্তু মামুলী ব্রাহ্মত্বই প্রতিপন্ন হয়। সখী-ভাবে যুগলমূর্ত্তির সেবাই বৈষ্ণব ভজনার চরম আকাঙ্ক্ষা। শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে শ্রীরাধার পদসেবা করিতে হইবে। শ্রীরাধার চরণাশ্রয় করিলেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ হয়। অন্যথা

হয় না। ইহাই বৈষ্ণবের কথা। ইহাই অন্তত মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। অথচ আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব জীব ও ভগবানের মধ্যে এ অধিকার ব্যবধান টুকু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। ইহাতেই তাঁহারা কতটা পরিমাণে যে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় ব্রাহ্মমতের আলোচনা করিতেছি বলিয়া কেবল যে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বিচার করিতেছি তাহা নহে। যে সকল অসত্য বা সত্যাভাস আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রকাশ্য-ভাবে কিম্বা প্রচ্ছন্নভাবে অল্প বিস্তর আছে, এই প্রসঙ্গে তাহারও আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অসত্য এবং সত্যাভাস ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরে এবং বাহিরে দেশের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই এ প্রসঙ্গের সবিস্তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে, প্রত্যুত এ তত্ত্ব পরিষ্কার জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়।

শাস্ত্র ও স্বানুভূতি

ব্রাহ্মেরা কোনও শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যে কেবল ব্রাহ্মসমাজেরই মত তাহা নহে। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোকেই বাস্তবিক কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। অতএব শাস্ত্র-প্রামাণ্য আছে কি না দেশের শিক্ষিত সাধারণের জন্যও এই প্রশ্নের যথাযথ বিচার হওয়া আবশ্যক। যতদিন না এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষে অবিচলিত বিশ্বাস সহকারে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। অন্য পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের কোনও শাস্ত্র নাই। কোনও শাস্ত্র অভ্রান্ত ও সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য নহে,—ইহাও ব্রাহ্মসমাজের একটী নাস্তিবাচক কিম্বা অভাবাত্মক মত। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে এই ব্রাহ্ম-মতকে বর্জ্জন করিতে হয়।

ব্রাহ্মসমাজ একেবারে যে কোনও শাস্ত্র মানেন না, তাহাও নহে। তাঁরা কেবল অভ্রান্ত শাস্ত্রই অস্বীকার করেন। অর্থাৎ যে শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে এমন শাস্ত্র স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন হানি হয় না। লৌকিক ন্যায়ের বিচারে, শুদ্ধ শব্দার্থের হিসাবে, কথাটা আপাততঃ অত্যন্ত অদ্ভুত শোনায়। কারণ যাহা অভ্রান্ত নহে তাহাই শাস্ত্র, লৌকিক ন্যায় এই কথাই বলে। সুতরাং কেহ যদি বলেন আমি শাস্ত্র মানি, কিন্তু অভ্রান্ত শাস্ত্র মানি না, তার প্রতিপক্ষ এমনই বলিতে পারেন, তবে তুমি শাস্ত্র মান না। এরূপ প্রতিবাদের উত্তরে ব্রাহ্মকে এই কথাই বলিতে হইবে যে আমার কথার এ অর্থ নয়। আমি যে শাস্ত্র মানি তাহাও অভ্রান্তই। কিন্তু যে শাস্ত্র কোনও পুস্তক বিশেষে আবদ্ধ নহে, যাহা সত্য, তাহাই আমার শাস্ত্র। "সত্যং শাস্ত্র-মনশ্বরম্" ব্রাহ্মধর্ম্ম এই কথাই বলেন।

কোনও শাস্ত্রবাদী এ কথা অস্বীকার করিবেন না। যিনি যে শাস্ত্র মানেন, তিনিই তাহাকে অনশ্বর অর্থাৎ নিত্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। খৃষ্টীয়ান বাইবেলকে নিত্য সত্যের প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। মুসলমান কোরাণ সরীফকে এই চক্ষেই দেখেন। হিন্দুও তাঁর বেদকে নিত্য বলিয়াই

গ্রহণ করেন। সুতরাং "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম" বলিয়া ব্রাহ্মমতাবলম্বী তাঁর শাস্ত্র প্রামাণ্যকে অপরাপর ধর্ম্মের শাস্ত্র প্রামাণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। ইহা দ্বারা বেদ, বাইবেল, কোরাণাদিতে যাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের শাস্ত্র প্রামাণ্যের অসারতা এবং ব্রাহ্ম-সমাজের শাস্ত্র প্রামাণ্যের সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই কথার দ্বারা ব্রাহ্ম সিদ্ধান্তের সঙ্গে শাস্ত্রবাদী সিদ্ধান্তের পার্থক্য ও বিরোধ কোথায়, তাহাও ধরা পড়ে না।

সত্যের প্রামাণ্য কি? এই প্রশ্নের আলোচনাতেই কেবল ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের সঙ্গে শাস্ত্রবাদীদিগের সিদ্ধান্তের পার্থক্য এবং বিরোধ কোথায় ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মমতে আত্মপ্রত্যয়ই সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য। ইংরেজীতে এই আত্মপ্রত্যয়কে Intuition বলে, আমাদের শাস্ত্রে ইহাকেই স্বানুভূতি বলে। মামুলী ব্রাহ্মগণ এই আত্মপ্রত্যয়, Intuition বা স্বানুভূতিকেই সত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে। শাস্ত্র যেখানে এই স্বাভিমতের সমর্থন করে সেইখানেই তাহা সত্য। যেখানে স্বাভিমতের সঙ্গে শাস্ত্রের বিরোধ দাঁড়ায়, সেখানে শাস্ত্র অসত্য এবং অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। অতএব ব্রাহ্মগণ সত্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেও তাহাদের নিজ নিজ স্বানুভূতিকেই সত্যের একমাত্র চূড়ান্ত প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রে প্রকৃত ভাবে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে স্বানুভূতির যে স্থান নাই তাহা নহে, তবে সত্যের প্রামাণ্য কেবল স্বানুভূতি নহে, কিন্তু শাস্ত্রও। গতানুগতিক ধর্ম্মে স্বানুভূতিকে কার্য্যতঃ উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্রকেই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে। ব্রাহ্মগণ যেমন নিজ নিজ স্বাভিমতকে জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের কষ্টিপাথররূপে ব্যবহার করেন এই স্বানুভূতির উপর করিয়াই যাবতীয় শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয় করেন একান্ত শাস্ত্রবাদী হিন্দু খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানও সেইরূপ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকেই সর্ব্বপ্রকারের আকাঙ্ক্ষিত স্বাভিমতের কষ্টিপাথর-রূপে ব্যবহার করেন। এবং এই শাস্ত্রের প্রমাণ করিয়াই নিজেদের এবং অপরের স্বানুভূতির বা আত্মপ্রত্যয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করেন। ব্রাহ্মের সত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য স্বানুভূতি। আর যাবতীয় প্রামাণ্য আছে তাহা এই স্বানুভূতির মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। শাস্ত্রবাদী সম্প্রদায়ের সত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য শাস্ত্র ইহার আর যাবতীয় প্রামাণ্য আছে, তৎ-সমুদয় সেই শাস্ত্রমুখাপেক্ষী হইয়া শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। ব্রাহ্মমতে স্বানুভূতি এবং শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ হইলে স্বানুভূতির সাক্ষ্যই নিঃসন্দিগ্ধরূপে গৃহীত হয়। শাস্ত্রানুগত অন্য সম্প্রদায় সকলের শাস্ত্রের সঙ্গে স্বানুভূতির বিরোধ হইলে শাস্ত্রই গৃহীত এবং স্বানুভূতিই বর্জ্জিত হয়। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুগত বলিয়া এইখানেই মামুলী ব্রাহ্মমতের সঙ্গে তাহার পার্থক্য এবং বিরোধ রহিয়াছে।

কিন্তু কেবলমাত্র স্বানুভূতিকেই কি সত্যের চূড়ান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়? তলাইয়া দেখিলে ব্রাহ্মগণও এ কথা বলিবেন না। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি যাহা বলে, তাহাই যদি পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলে যে মতেতে আর সত্যেতে,

কল্পনাতে আর বস্তুতে কোনই প্রভেদ থাকে না। আমার স্বানুভূতি আমার নিকটে যতই বলবতী হউক না কেন, অপরের নিকটে ত তার সে মূল্য নাই। বিশেষতঃ আমার কোনও বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে যখন অপরের অনুরূপ অনুভূতির বিরোধ উপস্থিত হয়, আমি যাহাকে স্থাণু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অপরে যখন তাহাকেই মানব বলিয়া দেখে, তখন আমার প্রত্যক্ষের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষের যে বিরোধ উপস্থিত হয়, স্বানুভূতি সে বিরোধের মীমাংসা কিছুতেই করিতে পারে না। কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে সত্যের চূড়ান্ত প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলে কি বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া যায়, "অন্ধের হস্তি-দর্শন-ন্যায়" তাহারই প্রমাণ প্রদান করে। ফলতঃ আত্মপ্রত্যয় বা Intuitionবস্তুটী যে কি ইহার সত্য জ্ঞান লাভ হইলে, কোন মতেই আর কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে সত্যের অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না।

সত্য কথা এই যে আত্মপ্রত্যয় বা Intuition বা স্বানুভূতির সঙ্গে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের কোনও প্রকৃত বিরোধ নাই। আত্মপ্রত্যয় বা Intuition সত্যের অন্তরঙ্গ প্রামাণ্য মাত্র। শাস্ত্র তার বহিরঙ্গ প্রামাণ্য। আর এই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুই অঙ্গেতেই যখন যাবতীয় বস্তু বা সত্য নিজ স্বরূপে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন কেবল অন্তরঙ্গের দ্বারাও তাহার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, কেবল বহিরঙ্গের দ্বারাও হয় না। বস্তু বা সত্য বিশেষের প্রামাণ্য একদিকে আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি এবং অন্য দিকে শাস্ত্র। এই বিবিধ প্রামাণ্যের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরেই সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্রপ্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। শাস্ত্রকে ছাড়িয়াও স্বানুভূতির প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। শাস্ত্র এবং স্বানুভূতি যখন পরস্পরের সমর্থন করে তখনই কেবল সত্যের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা হয়।

এই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি বস্তুটা কি? মামুলী ব্রাহ্মমত যে ভাবেই এই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিকে গ্রহণ করুক না কেন; ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ এই আত্মপ্রত্যয়ের সার্ব্বজনীনতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত জনে মনে করে যে, সে যা' ভাবে তাহাই বুঝি তার আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি। কিন্তু স্বানুভূতি আর খেয়াল বা কল্পনা এক বস্তু নহে। ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ যাহাকে এই প্রত্যয় বা স্বানুভূতি নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা মানব বুদ্ধির নিত্য-ধর্ম্ম। যাবতীয় মানবের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া এই আত্মপ্রত্যয় কিম্বা স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই সম্পাদিত হয়। মানব বুদ্ধির একটা ছাঁচ আছে, এই ছাঁচে ফেলিয়াই সভ্য অসভ্য সকল মানুষ জগতের যাবতীয় বস্তু, বিষয় এবং রসের জ্ঞান লাভ করে। এই ছাঁচটা কেবল আমার বুদ্ধিরই ছাঁচ নহে, কেবল তোমার বুদ্ধিরও ছাঁচ নহে, এই ছাঁচ সকল মানববুদ্ধির সাধারণ এবং সার্ব্বজনীন ছাঁচ। আর আমাদের বুদ্ধির ছাঁচটা সকলেরই এক বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিবিধ বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহার মধ্যেও একটা নিগূঢ় ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মানব-বুদ্ধির সার্ব্বজনীন ছাঁচটাকেই প্রকৃত পক্ষে আত্মপ্রত্যয় বলে।

কোন বস্তু বা বিষয় জানিতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি এই সার্ব্বজনীন ছাঁচটীর উপর তাহাকে ফেলিয়া তাহার জ্ঞান লাভ করে। এই ছাঁচটী মানব-বুদ্ধির মূল প্রকৃতির অন্তর্গত। এইজন্য ইহা সার্ব্বজনীন বস্তু। কিন্তু যতক্ষণ না বাহিরের বস্তু বা বিষয় আমাদের বুদ্ধির এই ছাঁচের উপর পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধির এই ছাঁচটী যে কি তাহা আমরা জানি না। এই ছাঁচের উপর বাহিরের বিষয় আসিয়া পড়িলেই এই ছাঁচটীকে আমরা ধরিতে পারি, এবং তাহার সাহায্যে এই বাহিরের বিষয়েরও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

আমাদের বুদ্ধির ভিতরেই দেশ, কাল, কার্য্যকারণসম্বন্ধ, প্রভৃতির ছাঁচ নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ দেশের, কালের, কার্য্য কারণসম্বন্ধের জ্ঞানের মূল সূত্রটী আমাদের বুদ্ধির ভিতরেই আছে। এই মূল সূত্রটী আমরা বাহির হইতে আহরণ করি না। কিন্তু অন্যদিকে আকাশে বিস্তৃত কোনও পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ যতক্ষণ না করিয়াছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধির অন্তর্নিহিত দেশজ্ঞানের যে ছাঁচটী বা সূত্রটী বা আত্মপ্রত্যয়টী রহিয়াছে তাহাও ফুটিয়া উঠে না। দেশের জ্ঞান আর দূরত্বের জ্ঞান একই কথা। আকাশে প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই জ্ঞান লাভ করি। দর্শন এবং শ্রবণ এই দুই উপায়েই আমরা দূরত্বের জ্ঞান লাভ করি। আর আমাদের চক্ষু কিম্বা কর্ণ কোনও দৃশ্য-বিশেষ বা শব্দবিশেষকে গ্রহণ করিতে যে শক্তি ক্ষয় করে, তাহারই ওজনে কোন বস্তু বা শব্দ কত নিকটে বা কত দূরে রহিয়াছে ইহা আমরা বুঝিয়া থাকি। যাহাদের চক্ষু এবং কর্ণ দুইই নাই তাহারা বস্তুবিশেষকে স্পর্শ করিবার জন্য হস্তপদাদির সঞ্চালন করিতে যাইয়া যে শক্তি ক্ষয় করে, তাহারই দ্বারা দূরত্বের ওজন করিয়া থাকে। আর এই দূরত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া, তার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের জ্ঞানও লাভ করে। যে শক্তির দ্বারা প্রকৃত পক্ষে আমরা নৈকট্য এবং দূরত্ব বুঝি তাহার কোন বিস্তৃতি নাই, অথচ আমরা এই শক্তি ব্যয় করিয়াই বিস্তৃতি বা extention এর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইহার অর্থ এই যে আমাদের বুদ্ধির অভ্যন্তরে আকাশ প্রত্যয় বলিয়া একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় আছে। কিন্তু যতক্ষণ না আকাশে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার হইয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রত্যয় জাগ্রত হয় না। বহির্বিষয়ের সংস্পর্শেই এই আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে। এবং একদিকে বহির্বিষয়ের জ্ঞান এবং অন্যদিকে এই আত্মপ্রত্যয়ের স্ফূর্ত্তি এই দুই মিলিয়াই আমাদের আকাশের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। যেমন আকাশের জ্ঞান সম্বন্ধে, সেইরূপ কালের জ্ঞান সম্বন্ধেও, বাহিরের ঘটনার পারম্পর্য্যের সাক্ষাৎকারে অন্তরের বুদ্ধিনিহিত কাল-প্রত্যয় জাগ্রত হইয়া, পরস্পরে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। দূরত্ব যেমন আকাশ জ্ঞানের প্রাণ, ঘটনার পারম্পর্য্য সেইরূপ কাল-জ্ঞানের প্রাণ। বাহিরের ঘটনা যতক্ষণ একটার পর আর একটা ঘটিয়া একটা পারম্পর্য্যের প্রতিষ্ঠা না করে, ততক্ষণ আমাদের কালজ্ঞান জন্মায় না। কালের

জ্ঞানের একটা অন্তরঙ্গ প্রত্যয় বা ছাঁচ আমাদের বুদ্ধির মধ্যে আছে। কিন্তু বাহিরের ঘটনাবলী পরম্পরের অনুসরণ করিয়া যতক্ষণ না আমাদের ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার বা মনোগোচর হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এই কালপ্রত্যয় জাগ্রত হয় না। গভীর নিদ্রা কালে কখন ঘটনা-পারম্পর্য্য আমাদের মনোগোচর হয় না, তখন আমাদের কাল প্রত্যয় জাগ্রত হয় না এবং কালের জ্ঞানও জন্মায় না। স্বপ্ন দেখিলে তাহার সাহায্যে নিদ্রিত সময়েও কতকটা কালের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে স্বপ্নে যে সকল ঘটনাপরম্পরা আমাদের মানসগোচর হয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তখন আমাদের কালপ্রত্যয় জাগ্রত হইয়া রহে। যেমন দেশ-জ্ঞানের এক বাহিরে আকাশে বিস্তৃত পদার্থের অনুভূতি ও ভিতরে দেশসম্বন্ধিনী আত্মপ্রত্যয় এই দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছি, সেইরূপ কালজ্ঞানেরও এক বাহিরে প্রকাশিত ঘটনা-পরম্পরা ও অন্তরে নিহিত কাল-প্রত্যয় এই দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠা আছে। ইহার একটীকে ছাড়িয়া অপরটীকে লইয়া কালের জ্ঞান জন্মে না ও জন্মিতে পারে না। কার্য্য-কারণসম্বন্ধের যে জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহারও এইরূপ দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠা আছে। এক বাহিরের ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং অপর ভিতরে বুদ্ধিনিহিত কার্য্যকারণ প্রত্যয়। এইরূপ আমাদের বুদ্ধিনিহিত স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি প্রত্যয়কে বা intuitionকে আশ্রয় করিয়াই আমাদিগের সর্ব্ববিধ জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু ভিতরের এই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়গুলি বাহিরের বস্তুসাক্ষাৎকারের উপরে সর্ব্বদাই নির্ভর করে। যতক্ষণ না এই বস্তুসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, ততক্ষণ এ সকল অন্তঃপ্রত্যয় বা আত্মপ্রত্যয় সজাগ ও কর্ম্মক্ষম হয় না। আর এই সকল স্বতঃসিদ্ধ অন্তঃপ্রত্যয় বা আত্মপ্রত্যয়কে আশ্রয় না করিয়া বাহিরের বস্তুরও কোনও জ্ঞানের বা সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আর এই জন্যই এই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি সত্যের আংশিক প্রামাণ্যমাত্র, পূর্ণপ্রামাণ্য নহে।

জড়বিজ্ঞানের সত্য

জড়বিজ্ঞানের সত্য সম্বন্ধে সকলেই এ কথাটা স্বীকার করেন। এখানে কেহ কেবল আত্মপ্রত্যয় বা ব্যক্তিগত স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া কোনও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যান না। ইহার প্রধান কারণ এই যে একটা মনোজগৎ আর একটা জড়জগৎ, এই বিবিধ অভিজ্ঞতার উপরে জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমরা যে জড়ের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বুঝি ইহার অর্থ এই যে আমাদের মনে যে ছাঁচ আছে, আমাদের বুদ্ধির ভিতরে, আমাদের আত্মপ্রত্যয়রূপে যে সকল সম্বন্ধের ঠাঁট-প্রতিষ্ঠিত আছে, তারই অনুরূপ করিয়া এই জড়জগতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে একটা mental order আছে। বাহিরে জড়জগতে একটা natural order আছে। এই বাহিরের natural order আমাদের ভিতরের mental order'এরই অনুরূপ, তারই প্রতিকৃতি। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান অর্থই প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। কোনও বস্তু বা বিষয়কে প্রণালীবদ্ধ করিতে হইলেই

একটা কোনও বিশেষ নিয়মের দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে হয়, একটা বিশেষ শৃঙ্খলায় তাহাকে আনিতে হয়, একটা বিশেষ ছাঁচে তাকে ঢালিতে হয়। যে নিয়মের, যে শৃঙ্খলার, যে ছাঁচের সাহায্যে আমরা জড়ের জ্ঞানকে অর্থাৎ জড়জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সকলকে শ্রেণীবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ করি, তাহা জড়ের ভিতরে নাই, আমাদের মনের ভিতরেই সে নিয়ম, সে শৃঙ্খলা ও সে ছাঁচ পাইয়া থাকি। ইহাই আমাদের mental order. এই mental orderএর ছাঁচে ফেলিয়াই আমরা জড়রাজ্যে order বা শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করি। এখন প্রশ্ন এই—এইরূপে আমরা যে জড়-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহা সত্য না কল্পনা? জড়ের ভিতরে বাস্তবিক এ সকল সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলা আছে না নাই? যদি থাকে তার প্রামাণ্য কি? এই প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই এই কথা বলিতে হয় যে, আমাদের যে mental orderএর ছাঁচে ফেলিয়া আমরা জড়ের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়া, জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, সেই mental order বস্তুর বা সত্যের একদিকমাত্র ব্যক্ত করে। বাহিরের, জড়ের নিজস্ব যে natural order, তাহা বস্তুর বা সত্যের অন্যদিক্ ধরিয়া আছে। এই অন্তরঙ্গ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঐ বহিরঙ্গ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, অতিশয় অঙ্গাঙ্গী। এরা পরস্পরের অংশ ও অঙ্গ। এরা পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণ করে, প্রমাণ করে, প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ mental orderএর সাক্ষ্য যখন natural orderএর প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখনই জড়-বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই mental orderকেই আত্মপ্রত্যয় বলা যাইতে পারে। ইহা সত্যের অন্তরঙ্গ প্রামাণ্য মাত্র। এই natural order তার বহিরঙ্গ প্রামাণ্য। দুই যখন মিলিয়া একই কথা বলে, তখনই প্রকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। Mental order ভিতরের বস্তু, ব্যক্তিগত কথা, স্বাভিমত বা স্বানুভূতি-পর্য্যায়ভুক্ত। Natural order বাহিরের বস্তু, ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতির কথা নহে, সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার কথা। শাস্ত্র-পর্য্যায়ভুক্ত। আর এই দু'য়ের একবাক্যতার উপরেই জড়জ্ঞানের সত্যের ও প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

অতএব, একদিকে আমাদের মনোরাজ্য কিম্বা mental order, আর অপরদিকে জড়রাজ্য বা natural order, এই দুইটী বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ ভিত্তির উপরেই যাবতীয় জড়-বস্তুর এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের প্রামাণ্য (verified and verifiable) ও প্রণালীবদ্ধ (classified) জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রামাণ্য ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানকে science, এবং আধুনিক বাংলায় বিজ্ঞান বলে। জড়-বস্তুর প্রকৃতির ও সম্বন্ধের এই প্রামাণ্য এবং প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানই জড়বিজ্ঞান। এই জড়বিজ্ঞান যে সকল সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত। এই সত্য কেবল ভিতরের আত্মপ্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কেবল বাহিরের বিষয়-প্রত্যক্ষের উপরেও প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরেও প্রতিষ্ঠিত। আর এই জন্যই

জড়বিজ্ঞানের সত্যসমূহ সম্বন্ধে, লোকে বড় বেশী সন্দিহান হয় না।

ধর্ম্মের সিদ্ধান্তকে যদি বিজ্ঞানের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিতে হয়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রেও কেবল আত্মপ্রত্যয়ের বা স্বানুভূতির উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিলে চলিবে না। জড় জগতের আলোচনা করিয়া আমরা দেখি যে আমাদের ভিতরে যেমন একটা অন্তরঙ্গ মনোরাজ্য আছে, সেইরূপ আমাদের বাহিরে, আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ানুভূতিনিরপেক্ষ একটা বিশাল জড়রাজ্যও পড়িয়া আছে। আমাদের সহজ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সকলই আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইষণ-পদবাচ্য। জড়ের সম্বন্ধ সকল দেশেতে প্রতিষ্ঠিত। এই দেশের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়-পর্য্যায়ভুক্ত। এই দেশ জ্ঞান সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চেষ্টার সঙ্গে এই জ্ঞান জড়িত। আর এ জড়াজড়িটা অতি অদ্ভুত রকমের। দেশজ্ঞান ও দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-চেষ্টা, ইহারা ছায়াতাপের মত পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আছে। যেখানে দর্শন বা শ্রবণাদি সেই খানেই, তার মূলে, তার সঙ্গে সঙ্গে, দেশের জ্ঞান বা দেশ-সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয়ও জাগিয়া রহে। এই আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত কেবল দর্শনাদির দ্বারা কোন জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। আবার শ্রবণদর্শনাদি ইন্দ্রিয়-চেষ্টা যতক্ষণ না হইয়াছে ততক্ষণ এই যে আত্মপ্রত্যয় তাহাও জাগ্রত হয় না। এখানে আগে দেখা বা শোনা আর তার পরে আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম, কিম্বা আগে আত্মপ্রত্যয়ের প্রকাশ,তার পরে দেখা বা শোনা —এরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। আতপ এবং ছায়ার মধ্যেও এরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। চিন্তা করিবার সময়, জ্ঞানের দ্বারা ছায়াতাপের বিচার করিতে যাইয়া, আমরা আতপকেই আগে এবং ছায়াকে তার পরেই ধরি, ইহা সত্য বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে আতপের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়ার প্রকাশ হয়, দুই-ই যুগপৎ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, কাল-নির্ণয়ে আতপ পূর্ব্বে এবং ছায়া তার পরে প্রকাশিত হয় না। ইংরেজী-দর্শনের ভাষায় যেমন এ ক্ষেত্রে ছায়ার সম্পর্কে আতপকে কেবল logical prius মাত্র বলিবে, কিন্তু chronologically prior বলিবে না, সেই রূপ দেশজ্ঞানরূপ আত্মপ্রত্যয়কে দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-চেষ্টার logical prius মাত্র বলা যায়, chronologically prior বলা যায় না। চিন্তার প্রণালীতে দেশজ্ঞান আগে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ পরে। কিন্তু বাস্তব জীবনের নিত্য ও সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতাতে এই দুই ছায়াতপের মতন একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আতপ ব্যতীত ছায়ার অস্তিত্ব অসম্ভব ও অসাধ্য। আবার ছায়ার সঙ্গ ছাড়িয়া কদাপি আতপেরও প্রত্যক্ষ এবং প্রতিষ্ঠা হয় না। জ্ঞানের অন্তরঙ্গ আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি বা ইনটুইষণ, এবং তাঁর বহিরঙ্গ ইন্দ্রিয় চেষ্টা ও বিষয়সাক্ষাৎকার, এতদুভয়ের সম্বন্ধ সর্ব্ব বিষয়েই এই ছায়াতাপের মতন নিত্য ও অঙ্গাঙ্গী। একেকে ছাড়িয়া অপরের জ্ঞান বা ক্রিয়া সম্ভব হয় না। আমার স্বানুভূতি বাহিরের বস্তুর সৃষ্টি করে না, সে বস্তুর জ্ঞানই কেবল সম্ভব করে। আবার বাহিরের বস্তুও আমার জ্ঞানের বা যে প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার সৃষ্টি

করে না ; তাহার প্রকাশ করে মাত্র। আর ইহারা পরস্পরের সাহায্যে, একে অন্যকে জাগ্রত ও প্রকাশ করিয়াই আমাকে যাবতীয় বিষয়জ্ঞান-লাভে সমর্থ করে। এই জন্যই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি বা ইনটুইষণ এবং ইন্দ্রিয়-চেষ্টা ও বিষয়সাক্ষাৎকার এই দুই অঙ্গেতে জগতের যাবতীয় জড়বস্তুর বস্তুত্বজ্ঞান কিম্বা reality পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এতদুভয়ের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরেই জড় বিজ্ঞানের যাবতীয় সত্যের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব আত্মপ্রত্যয়ের যথার্থ অর্থ বুঝিলে, কি প্রকারে এই আত্মপ্রত্যয় আমাদের জ্ঞানসাধনের সহায়তা করে, ইহা ভাল করিয়া একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আত্ম-প্রত্যয়বাদীকেও তাঁর আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইষণ বা স্বানুভূতি যে স্ব-তন্ত্র এবং স্ব-পর্য্যাপ্ত নহে, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু এই আত্ম-প্রত্যয়ও বহির্বিষয়ের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জাগ্রত এবং কার্য্যকরী হয় না, ইহাও অতি সত্য কথা। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয় এবং বিষয়সাক্ষাৎকার এই দুই মিলিয়া আমাদের যে বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন করে, সে জ্ঞানও সম্পূর্ণ প্রামাণ্য নহে। আমি যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহা স্বতঃপ্রামাণ্য সত্য, সন্দেহ নাই। কারণ এ সকল আমার প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর প্রত্যক্ষ আপনি আপনার প্রামাণ্য ; প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের বা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, তাহা সকলটাই আমার প্রত্যক্ষের কথাও নহে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বদাই আমার বহুবিধ অনুমান মিশিয়া থাকে। এই অনুমান মিশিয়া থাকে বলিয়াই, আমার রজ্জুতে কখনও কখনও সর্পবোধ এবং স্থাণুতে মানববোধ জন্মে। গৃহপ্রাঙ্গণের রজ্জুখণ্ডকে যে আমি সর্পজ্ঞান করি, ইহার কারণ কি ? বস্তুতঃ চক্ষু এখানে সর্প দেখে না। সর্পের একটা বা দুইটা ধর্ম্মসম্পন্ন একটা বস্তুবিশেষই দেখে মাত্র। রজ্জুর সঙ্গে সর্পের আকার এক, রজ্জুটা যদি একটু তির্য্যাগভাবে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সর্পের তির্য্যকৃগতির সঙ্গেও তার একটা সাদৃশ্য জন্মে। আর আমার চক্ষু প্রকৃতপক্ষে এইটুকু মাত্রই প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু আমার মন এই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার উপরেই এই সম্মুখের বস্তুটা যে সর্প এই অনুমান করিয়া লয়। চক্ষু যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা সত্য, স্বতঃপ্রামাণ্য। চক্ষু স্বয়ংই তার স্ব-পর্য্যাপ্ত সাক্ষী। কিন্তু চক্ষু বর্ত্তমানে যে বস্তু দেখিতেছে, মন তারই সঙ্গে অতীতে, অন্য ক্ষেত্রে যে সর্প দেখিয়াছিল, তার স্মৃতি জড়াইয়া এই বস্তুই যে সেইরূপ একটা সর্প, এই অনুমান করিয়া লয়। আর এই অনুমানের ভূমিতেই এই ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় ; সত্য প্রত্যক্ষের ভূমিতে কোনওরূপ ভ্রান্তি জন্মে না ও জন্মিতে পারে না। এখানে রজ্জুর সঙ্গে সর্পের আকারগত ঐক্য দেখিয়াই আমি ইহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমি যাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এই আকার মাত্র। এইটুকু পর্য্যন্তই আমার সত্য স্বানুভূতি। কিন্তু এই

আকার যে সর্পের, ইহা প্রত্যক্ষের কথা নহে; অনুমানের কথা। অথচ আমি এই অনুমানকেও আমার প্রকৃত স্বানুভূতির অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া, এই রজ্জুই যে সর্প এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আর আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমার এই স্বানুভূতি নিজে কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারে না। এখানে আমার মতন আর দশজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আমার স্বানুভূতিকে হয় সপ্রমাণ না হয় অপ্রমাণ করিতে পারে। প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান যতটুকু তার সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোনও মত-বিরোধ হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। অনুমানের ভূমিতেই কেবল তারা একরূপ অনুমান করিতে পারে, আমি অন্যরূপ অনুমান করিতে পারি এবং এইরূপে আমাদের পরস্পরের অনুমানের মধ্যে বিরোধ বৈষম্য ঘটিতে পারে, এইজন্য আমার প্রকৃত প্রত্যক্ষ এ ক্ষেত্রে কতটুকু, আর ইহার সঙ্গে আমার অনুমানই বা কতটা মিশিয়া আছে, আর দশজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়াই কেবল ইহা ধরিতে হয়। লোকে নানা ক্ষেত্রে নানা সময়ে সর্পের সাক্ষাৎকারে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাই সর্পের সত্য লক্ষণ। মানবের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই এই লক্ষণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর আমাকে এক্ষেত্রে এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমার নিজের অনুভূতির মধ্যে সত্য কতটুকু ও অনুমান কতটুকু ইহার বিচার ও পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহার আর অন্য উপায় নাই। মানবমণ্ডলীর এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে কষিয়াই আমার নিজের প্রত্যক্ষের বা স্বাভিমতের সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিতে হয়। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যখন আমার স্বানুভূতিকে সমর্থন করে, তখনই কেবল ইহার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মানবজ্ঞানের সকল বিভাগেই এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা শাস্ত্রের আসন প্রাপ্ত হয়। জড়বিজ্ঞানের শাস্ত্রে মানব-সমাজের জড়বস্তু সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত রহিয়াছে। জীব বিজ্ঞানের বা Biologyর কিম্বা মনোবিজ্ঞানের বা Psychologyর শাস্ত্রও জীবের ও মনের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহারই দ্বারা রচিত হইয়াছে। এইরূপে আদিকাল হইতে মানুষ ধর্ম্মজীবনের যে বিবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলে লিপিবদ্ধ হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র আপন আপন তথা-কথিত স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া চলিলে, সত্য-লাভ কখনওই সম্ভব নহে। কারণ এই অভিজ্ঞতার সাহায্য ও সাক্ষ্য ব্যতীত, আমরা যাহাকে স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয় বলিয়া মনে করিতেছি, তার মধ্যে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের কতটুকু আর অনুমানই বা কতটুকু ইহা কিছুতেই ধরা পড়িতে পারে না।

আমাদের জ্ঞানেতেই যে কেবল প্রত্যক্ষ সত্য এবং অপ্রত্যক্ষ অনুমান বা কল্পনা মিশিয়া আছে, আর শাস্ত্রেতে যে সকল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে কি এরূপ অনুমান বা কল্পনা মিশিয়া নাই? এ কথাটা এখানে উঠিতে পারে। গতানুগতিক পন্থাকে আশ্রয় করিয়া যাঁরা শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানিয়া চলেন,

তাঁরা যাহাই বলুন না কেন, কোন ধর্ম্মেরই তত্ত্বদর্শী মীমাংসকগণ তাঁহাদের শাস্ত্র বাক্যের এইরূপ স্ব-তন্ত্র ও স্ব পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্যের দাবী করেন না। ফলতঃ শাস্ত্রের এরূপ স্ব তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য নাই বলিয়াই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি, এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই মীমাংসার আবশ্যক হয়।

শাস্ত্র
|
সন্দেহ
|
বিচার
|
সমন্বয়
|
সঙ্গতি

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জৈমিনী-দর্শনে এই পঞ্চাঙ্গ প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। আর যেখানে কোনও শাস্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর রহিয়া যায়, সেখানে সে শাস্ত্রকে নিঃসঙ্গ ও স্ব পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করা আদৌ সম্ভব হয় না। কারণ শাস্ত্র-বাক্যের একাধিক অর্থ করা যায় বলিয়াই শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে। আর সন্দেহের উদয় হইলে বিচার অবলম্বন করিয়াই তার নিরসন করিতে হয়, ইহার আর অন্য উপায় নাই। ইংরেজী-দর্শনে যাহাকে criticism বলে, আমাদের মীমাংসা শাস্ত্রের এই বিচারও তাহাই। যুক্তি-প্রয়োগে কোনও বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার পদ্ধতিকেই বিচার বলে। আর স্বানুভূতিকে বর্জ্জন করিয়া কোনও বিষয়ে যুক্তিপ্রয়োগ সম্ভব হয় না। কারণ আমাদের যুক্তির মূল সূত্রগুলি আমাদের এই স্বানুভূতির কিম্বা আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই নিহিত আছে। শাস্ত্রবাক্য এ সকল সূত্রের প্রতিষ্ঠা করে না, স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয়ই ইহাদিগকে প্রকাশিত করে। শাস্ত্র সর্ব্বদাই স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয়ের এই সকল মূল সূত্রকে ধরিয়া আপনার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই জন্যই একদিকে যেমন স্বানুভূতি বা আত্ম-প্রত্যয় সত্যের স্ব তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য নহে, সেইরূপ অন্যদিকে শাস্ত্রেরও এই প্রকারের কোনও স্ব তন্ত্র ও স্ব পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য নাই। ইহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্যে, পরস্পরকে সংশোধিত ও সপ্রমাণ করিয়াই আপন আপন প্রামাণ্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে, শাস্ত্রকে ছাড়িয়া অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে মানব-জাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া স্বানুভূতি আপনার মধ্যে সত্য কতটুকু ও অনুমান কতটুকু ইহার মীমাংসা কিছুতেই করিতে পারে না। আবার স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্রও আপনার সত্য অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ অর্থ মাত্রেই বস্তুগত, শব্দগত নহে। কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ যার হয় নাই,সে বস্তুর কেবল নাম-রূপের বর্ণনা শুনিয়া বা পড়িয়া তাহার পক্ষে কখনওই সে বস্তুর সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। এইজন্য সর্ব্বদা জ্ঞাত বস্তুর উপমাদির সাহায্যেই মানুষ অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরিজ্ঞাত কমলালেবুর আকারের উপমার দ্বারাই ভৌগোলিকেরা বালক-বালিকাদিগকে এই পৃথিবীর অজ্ঞাত আকারের জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। সেইরূপ প্রত্যেক সাধকের স্বানুভূতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার নিজস্ব প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারাই

ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারের অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকে। এইরূপে স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্রের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না; শাস্ত্রকে বর্জ্জন করিয়াও স্বানুভূতির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ান-মণ্ডলী একদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও, অন্যদিকে স্বানুভূতির প্রামাণ্য মর্য্যাদাও রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক খৃষ্টীয়ান্ সাধককে তাঁর বিচার বুদ্ধির অনুযায়ী শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিবার অধিকার দিয়াছেন। এই অধিকারকেই ইংরেজীতে right of private judgment (রাইট্ অব্ প্রাইভেট্ জজ্‌মেণ্ট) বলে।

কিন্তু এই অধিকারে কার্য্যতঃ স্বানুভূতিতেই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করে এবং শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির অধীন করিয়া প্রকৃতপক্ষে সত্য নির্ণয়ে স্বানুভূতির সঙ্গে শাস্ত্রের যে একটা সমকক্ষতা আছে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য অপেক্ষা হীনতর নহে। কিন্তু অন্ততঃ তারই সমান। ইংরেজীতে এই দ্বিবিধ প্রামাণ্যকে পরস্পরের সঙ্গে Co-ordinate মাত্র বলা যায়, ইহার একটীকে অপরের subordinate বলা যায় না। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট মণ্ডলী যে ভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহাতে স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের এই Co-ordinate সম্বন্ধ বা সমকক্ষতা রক্ষা পায় না। এইজন্যই এই বিষয়ে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ সিদ্ধান্ত আধুনিক যুগের যুক্তিবাদের সমক্ষে বেশী দিন টিকিতে পারিল না। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের right of private judgment যুক্তিবাদী-দিগের ব্যক্তিগত স্বানুভূতিরই নামান্তর মাত্র। আর শাস্ত্র বা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যকে আপনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য যদি ব্যক্তিগত অনুভূতির সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে এই স্বানুভূতিই সত্যের অনন্যপ্রতিযোগী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, শাস্ত্রের মর্য্যাদা বাক্যের মর্য্যাদার মতন কেবলমাত্র একটা লোকাচারে বা দেশাচারে মাত্র পরিণত হয়। প্রকৃত অধিকার তার কিছুই থাকে না।

আর এই ভাবেই আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও এক প্রকারের শাস্ত্রমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা আছে। ব্রাহ্মগণ শাস্ত্র মানেন না যে, তাহা নহে। কিন্তু যে শাস্ত্র বা যে শাস্ত্রের যতটুকু তাঁহাদের স্বাভিমতের সঙ্গে মিলিয়া যায়, বা তাঁহাদের নিজেদের যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থিত হয়, সেই শাস্ত্র বা সেই শাস্ত্রের ততটুকুই ব্রাহ্মগণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। যেটা বা যেটুকু তাঁহাদের স্বাভিমতের বা যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থিত হয় না, সেটা বা সেটুকু তাঁরা অসত্য ও অপ্রামাণ্য বলিয়া নিঃসঙ্কোচে বর্জ্জন করেন। ইহাকে শাস্ত্র মানা বলা যায় না।

ফলতঃ যেমন য়ুরোপীয় প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ মণ্ডলীমধ্যে সেইরূপ আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজেও এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের সত্য প্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অন্য পক্ষে গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্মেও শাস্ত্রপ্রমাণ যে স্ব-তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত নহে, এ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মগণ যে ভাবে শাস্ত্রবর্জ্জিত স্বানুভূতিকেই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন, গতানুগতিক হিন্দু সমাজও সেইরূপ স্বানুভূতিবর্জ্জিত শাস্ত্রকে সত্যের অনন্তপ্রতিযোগী প্রামাণ্য মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছেন। স্বানুভূতি এবং শাস্ত্র আপন আপন প্রামাণ্যের জন্য যে পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, হিন্দুর মীমাংসায় ও সাধন তত্ত্বে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু গতানুগতিক হিন্দুর চিন্তাতে এই কথাটা ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হইলে, হিন্দু-সমাজের অসঙ্গত শাস্ত্রানুগত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ ভাবে স্বানুভূতিকে সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা পাইতে হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা প্রতিবাদের মুখেই জন্মগ্রহণ করে। ইহা একটা প্রতিবাদী বা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম। আর প্রতিবাদ সর্ব্বদাই সত্যের একদেশ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। হিন্দুর ঐকান্তিক ও অসঙ্গত শাস্ত্রানুগত্যের প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই ব্রাহ্মগণ স্বানুভূতিকে আশ্রয় করেন। কেবল স্বানুভূতি আশ্রয়েই এই অসঙ্গত শাস্ত্রানুগত্যকে নষ্ট করিতে পারা যায়। ইহার আর অন্য অস্ত্র নাই। কিন্তু এইভাবে স্বানুভূতিকে সত্যের শ্রেষ্ঠকে প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, ব্রাহ্ম-সমাজ স্বানুভূতির অধিকারের ও প্রামাণ্যের যে একটা সীমা আছে, এ কথা ভুলিয়া গেলেন। গতানুগতিক হিন্দু যেমন শাস্ত্র-প্রামাণ্যের স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়া ধর্ম্মকে যুক্তি-বিচার-বর্জ্জিত প্রাণহীন ও অর্থহীন ক্রিয়াকলাপে পরিণত করিয়াছিলেন, প্রতিবাদী ব্রাহ্মও সেইরূপ স্বানুভূতি-প্রামাণ্যের স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়া, সত্যকে ও সাধনাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিলেন। আর উভয় পক্ষের এই একদর্শিতার জন্যই এ পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মের বিবাদের কোনও একটা প্রশস্ত মীমাংসার পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। একদিকে গতানুগতিক হিন্দু, আর অন্যদিকে মামুলী ব্রাহ্ম, ইহাদের কেহই এ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা যে কোথায় তার সন্ধান করিতে পারেন নাই।

নব্য ব্রাহ্মের এই অক্ষমতা মামুলীয় হইলেও, প্রাচীন হিন্দুর ইহা কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে। কারণ হিন্দুর সাধনা ও সিদ্ধান্ত অতি পুরাতন কালেই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্যের পথ আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দুর প্রমাণ শাস্ত্রই ইহার সাক্ষী। আধুনিক যুরোপীয় প্রমাণ শাস্ত্র বা লজিক্ সত্যের দ্বিবিধ প্রমাণ মাত্র স্বীকার করে।—এক প্রত্যক্ষ এবং অপর অনুমান ও উপমান। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকেই আধুনিক যুরোপীয় প্রমাণ শাস্ত্র সত্যের মূল প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করে। অনুমান ও উপমান—deduction এবং induction—এই প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের আশ্রয়েই কার্য্য করে। যুরোপীয় প্রমাণ শাস্ত্রের সঙ্গে হিন্দুর প্রমাণ শাস্ত্রের এ পর্য্যন্ত কোনও বিরোধ নাই। হিন্দুর প্রমাণ শাস্ত্রও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানকে প্রমাণ-মধ্যে গণনা করে। আর হিন্দুও এখানে প্রত্যক্ষ বলিতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বোঝেন এবং এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই যে, অনুমান উপমানাদির প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাও স্বীকার করেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর একটা প্রমাণও আছে—হিন্দু তাহাকে

আগম বলে। পুরাতন য়ুরোপীয় প্রমাণ-শাস্ত্রও আগমের বা Revelationএর প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনায় কার্য্যতঃ সে প্রামাণ্য লোপ পাইয়াছে। আর যে সকল লোকে Revelationএর প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁরাও এই প্রামাণ্যের সত্য মর্ম্ম গ্রহণ করেন বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টীয়ান যাকে Revelation বলেন, হিন্দু তাকেই আগম বলেন। তবে আগম কি ভাবে ও কোন্ যুক্তিতে প্রত্যক্ষের সমকক্ষ প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে, হিন্দু মীমাংসা যেরূপে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, খৃষ্টীয়ান্-দর্শনে সেরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না সন্দেহ।

হিন্দুর প্রমাণ-শাস্ত্র বলে, প্রত্যক্ষ যেমন স্বতঃপ্রামাণ্য, আগমও সেইরূপই স্বতঃ-প্রামাণ্য। প্রত্যক্ষের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণান্তরের কোনও অপেক্ষা থাকে না, থাকিতে পারে না। চক্ষে আমি যে রূপ দেখি, কর্ণদ্বারা যে শব্দ শ্রবণ করি, রসনায় যে রস আস্বাদন করি ও ত্বকের দ্বারা যে স্পর্শ লাভ করি, আমার দৃষ্টি, শ্রুতি প্রভৃতিই তার চূড়ান্ত প্রামাণ্য, আমি যা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, অপরে তার সাক্ষ্য দিতে পারে না। অপরে যদি তাহা নাও দেখে তথাপি আমার দৃষ্টি অসিদ্ধ হইবে না। আমি এই প্রত্যক্ষের উপরে যে সকল অনুমানের প্রতিষ্ঠা করিয়া সে অনুমান-জড়িত অনুভূতিকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই, তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নাই; কিন্তু মূল প্রত্যক্ষ আপনি আপনার প্রামাণ্য। আর এই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যেমন আপনি আপনার প্রমাণ, সেইরূপ আগমও আপনি আপনার প্রমাণ—প্রমাণান্তরের দ্বারা আগমের সাক্ষ্য কদাপি সমর্থিত হয় না ও হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ এবং আগম দুই একজাতীয় সমকক্ষ প্রমাণ।

আর হিন্দু যে এই কথা বলেন, ইহার অর্থ এই যে, তার চক্ষে আগমও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তাহাও এক জাতীয় প্রত্যক্ষই বটে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আর আগম অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ এইমাত্র। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে, অর্থাৎ জগতের রূপরসাদির সাক্ষাৎকারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষের যে অপরোক্ষ অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই প্রমাণ শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ বলে। এই অপরোক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া অনুমান-উপমানাদির সাহায্যে যে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত বটে, কিন্তু তাহা গৌণ প্রমাণ, মুখ্য-প্রমাণ নহে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-রাজ্যে এই অপরোক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রত্যক্ষ একমাত্র স্ব-তন্ত্র ও এখানে স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। সেইরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের বিবিধ সত্যের ও সম্বন্ধের অপরোক্ষ অনুভূতির উপরেই আগমের প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মতন এই অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বা আগমেরও একটা স্ব-তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য আছে। এই ভাবেই হিন্দুর প্রমাণ-শাস্ত্র আগমের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানবের যাবতীয় অভিজ্ঞতা কি কেবল এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-রাজ্যেই আবদ্ধ, না তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়াতীত

চিৎরাজ্যের যথাযথ জ্ঞানলাভ করাও সম্ভব? যারা অতীন্দ্রিয়-বিষয়ের অস্তিত্ব বা সত্য স্বীকার করে না, তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ এবং এই প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমান-উপমানাদির অতিরিক্ত কোনও প্রমাণান্তরের প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের চার্ব্বাকেরা ইন্দ্রিয়াতীত কোনও কিছুতে বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং তাঁহারা নিঃসাধ্যকারেই আগমের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় জড়বাদও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকাব করে না। সুতরাং আধুনিক জড়বাদীও নিঃশঙ্কোচেই আগমের *প্রামাণ্য অগ্রাহ্য* করিতে পারেন। কিন্তু যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত চিৎরাজ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্ভব ও সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁদের পক্ষে আগমে বিশ্বাস করা একান্তই অপরিহার্য্য। আগমে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে অবিশ্বাস করিলে তাঁহাদের আস্তিক্যের আর কোনও ভিত্তি থাকে না।

এই আস্তিক্য-কথা আমাদের শাস্ত্রের ও সাধনার একটা বিশেষ কথা। অন্য দেশের শাস্ত্র-সাধনায় ইহার অনুরূপ কোনও কিছু আছে বলিয়া জানি না। অতীন্দ্রিয় সত্তা বা সত্য আছে এই প্রতীতিকেই আমাদের শাস্ত্রে আস্তিক্য বলে। সচরাচর যাহাকে ঈশ্বর-বিশ্বাস বলে, তাহা আর আস্তিক্য এই জন্য ঠিক একই কথা নহে। কপিল ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ বলিয়াও কখনই নাস্তিক পদবী প্রাপ্ত হন নাই। পাতঞ্জলির যোগ-সূত্র ঈশ্বর স্বীকার করে বলিয়া সেশ্বর সাংখ্য নাম পাইয়াছে। কপিল ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়াছেন বলিয়া, সাংখ্য-দর্শনানিরীক্ষ্য আখ্যা পাইয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য-দর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শন এই সূত্রের কোনটীই নাস্তিক্য অপবাদ প্রাপ্ত হন নাই। আমাদের দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল চার্ব্বাকেরাই নাস্তিক্য নাম পাইয়াছেন। আর ইহার অর্থ এই যে, সাংখ্য নিরীশ্বর হইয়াও অতীন্দ্রিয়-সত্তা বা সত্য যে আছে ইহা অস্বীকার করেন নাই। সাংখ্য ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, বলিয়াও আগমের প্রামাণ্য মানিয়াছেন। আর এই জন্যই সাংখ্য-দর্শন চার্ব্বাক-দর্শনের মতন নাস্তিক্য-বিশেষণে বিশিষ্ট হয় নাই। আমাদের শাস্ত্র-সাধনায় যাঁরা কেবল ঈশ্বর মানেন না, তাঁদের নাস্তিক বলে না। আস্তিকও ঈশ্বর না মানিতে পারেন। এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের এবং এই প্রত্যক্ষপ্রচলিত অনুমান-উপমানাদির দ্বারা যতটুকু আপাত ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তার অতীত ও তাহা হইতে ভিন্ন একটা বিশাল অতীন্দ্রিয় রাজ্য আছে, যাঁরা ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁরাই আস্তিক। অর্থাৎ নাস্তিক আর নিরীশ্বর আমাদের ভাষায় এক কথা নহে। জড়বাদীই কেবল আমাদের দেশে নাস্তিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফলতঃ আধুনিক কালে সচরাচর যাহাদিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন বলিয়া লোকে আস্তিক বলিয়া গ্রহণ করে, আমাদের শাস্ত্রীয় অর্থে তারা সকলে আস্তিক্য-মর্য্যাদার অধিকারী কি না, ইহা সন্দেহেরই কথা। ইহাদের অনেকেই যে ভাবে, যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বনে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে তাঁহাদের আস্তিক্য প্রমাণিত হয় না।- ইহারা আগমে বিশ্বাস করেন না।

প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানাদি প্রমাণের উপরেই উহাদের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইলেও এই সাকার ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি জগতের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ যে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা ঠিক অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্ব নহে। মানবের অন্তর্নিহিত আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞান যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করে, এবং মানব-বুদ্ধি বিশ্বরচনায় যে অদ্ভুত উপায়-উদ্দেশ্যের যোগাযোগ দেখিতে পায়, আর মানব-অন্তরে যে স্বাভাবিক শ্রেয় ও প্রেয়ের বোধ আছে বলিয়া সে ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হয়। মানব-প্রকৃতির এই ত্রিবিধ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই উনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ গুরুশাস্ত্রবর্জ্জিত এই আধুনিক ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইংরেজিতে ইহার প্রথমটীকে argument from causation, দ্বিতীয়টীকে argument from design, এবং তৃতীয়টীকে argument from moral intuitions of mankind and the moral government of the world বলে। আর এই ত্রিবিধ যুক্তিই ঠিক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক তারই সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এই ঈশ্বর-তত্ত্বে বিশ্বাস করিবার জন্য আমাদের প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধিই যথেষ্ট। ইহার জন্য কোনও প্রকারের সত্য অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয় না। আমার মনে হয় সাংখ্যকার এই ঈশ্বর-তত্ত্বকেই অসিদ্ধ বলিয়াছেন। এ তত্ত্ব যে অতর্ক-প্রতিষ্ঠ নহে, ইহাই বা অস্বীকার করা যায় কি? এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানাদিই যথেষ্ট, ইহার জন্য আগমের শরণাপন্ন হইতে হয় না। এই কারণেই এই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করাও অপরি-হার্য্য নহে। যুক্তিতর্কের দ্বারাই যথাসম্ভব ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। জড়-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানাদির আলোচ্য বিষয়ে এই সকল বিজ্ঞানের শাস্ত্র বা মানব-জ্ঞানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ বিবরণ যতটা প্রামাণ্য-মর্য্যাদার দাবী করিতে পারে, ধর্ম্মজীবনের সত্যাসত্য নির্ণয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল তদপেক্ষা বেশী প্রামাণ্য-মর্য্যাদার দাবী করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের একান্ত বহির্ভূত কোনও চিৎরাজ্য যদি থাকে, তাহা হইলে এই প্রত্যক্ষের এবং এই প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমান-উপমানাদির প্রমাণ ত সে ক্ষেত্রে কিছুতেই প্রযুক্ত হইবে না। এবং সে রাজ্য সম্বন্ধে অস্তি নাস্তি কোনও কথাই বলিতে পারিবে না। সেই রাজ্যের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অন্যবিধ সাধন অবলম্বন ও তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেই অন্যবিধ প্রামাণ্যের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। হয় এই সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত—আর মন পর্য্যন্ত যে এখানে ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহার স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে—কোনও কিছু নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং সে অবস্থায় আগম অস্বীকার করাতে কোনও ক্ষতি নাই। আর না হয় ইন্দ্রিয়াতীত সত্য আছে, আমাদের

বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় উভয়বিধ ইন্দ্রিয় যে বস্তুর সাক্ষ্যলাভ করে না ও করিতে পারে না, এমন সত্বস্তু আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। এবং সে অবস্থায় এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিকারের বহির্ভূত কোনও প্রামাণ্যও স্বীকার করা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আমাদের প্রমাণ-শাস্ত্র এই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যে বিশ্বাস করে বলিয়াই প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানের অতিরিক্ত আগম বলিয়া আর একটা প্রমাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর যে যুক্তিবলে এই আগমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আস্তিক্য-বুদ্ধিকে একান্তভাবে পরিহার না করিয়া সে যুক্তিকে অগ্রাহ্য বা বর্জ্জন করা সম্ভব নহে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মেঘনা-দর্শনে

যেই কালে ধান্য ভরা পুণ্য বাঙ্গালায়
নীলকর বিষধর বিষপোড়া মুখ
বুনেছিল নীলক্ষেত্র বাণিজ্য আশায়
অনল শিখায় ফেলি কৃষকের সুখ ;
সেই কালে, একদিন, পড়ে কি গো মনে
ভীষণ-তরঙ্গ নদ ! উদয়ে তোমার
গ্রাসিতে আসিয়াছিলে বিকট-বদনে,*
দীনের বন্ধুত্ব হেতু জনম যাহার।
যেই শিশু-করে হবে দুষ্টের দমন,
তাহারে বক্ষেতে ধরে যেই ভাগ্যবান্,
কেমনে নাশিবে তারে আসন্ন শমন,
উপেক্ষিয়া নিয়তির আদিষ্ট বিধান।
তাই তব জল হ'তে হইল উদ্ধার,
নীলদর্পণের জ্যোতি নাশিতে আঁধার।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

---

* "দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন, হঠাৎ নৌকা জলমগ্ন হইতে লাগিল, দীনবন্ধু নীলদর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন।"—বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধুজীবনী।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

এখন দেশীয়েরা সর্ব্বদাই বলেন যে ইংরাজেরা তাঁহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন না, অন্ততঃ সমভাবে দেখেন না, একটু দূরে রাখেন, কথাটা কতদূর সত্য আমি জানি না; কিন্তু উপযুক্ত লোককে তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, এমন কি আপনাদের ভিতরের লোক বলিয়া টানিয়া লন। জগদীশ বাবু, যে কোন কর্ম্মচারীই হউন (ডিভিসনাল কমিশনার, কিম্বা ইন্‌স্পেক্‌টার জেনারেল, পুলিস, কিম্বা অপর উচ্চপদস্থ সাহেব) তাঁহাকে রিটারন্ ভিজিট না দিলে, তিনি তাহার সহিত আর মিলিতেন না।

ত্রিপুরায় জগদীশ বাবু কিছু দিন ছিলেন, সেখানকার কলেক্‌টার জোন্‌স্ সাহেব, জজ গেভিদ সাহেব এবং অপরাপর সাহেবেরা উঁহাকেই নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু কখন মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্তকে করিতেন না; রমেশচন্দ্র ওখানে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং বাসাবাড়ী না পাওয়াতে, জগদীশবাবুর বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন। একদিন জোন্‌স সাহেবকে জগদীশবাবু বলিলেন "দেখুন, আপনারা আমাকে নিমন্ত্রণ করেন. রমেশচন্দ্রকে করেন না, এ বড় অন্যায় কথা, রমেশ আপনাদের সিভিল-সার্ভিসভুক্ত, আর আমার বাসায় থাকেন, এমত স্থলে তাঁহাকে বাদ দেওয়া নিতান্ত গর্হিত।" জোন্‌স্ সাহেব উত্তরে বলিলেন, "রমেশ ছেলে মানুষ, সে বুড়ার দলে আসিয়া সুখ পাবে না, তাই তাঁহাকে আমরা আহ্বান করি না।" জগদীশবাবু বলিলেন, "সে যাই হোক, এখন তাহাকে আহ্বান করিতে হইবে।" সেই দিন হইতে রমেশবাবু ইংরাজ-দলে মিশিতে সক্ষম হইলেন। একদিন সাহেবেরা আমোদ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের দেশীয় বস্ত্র পরিয়া আসিতে হইবে।" জগদীশবাবু বলিলেন, "আমাদের কোন আপত্তি নাই, মহিলারা (লেডিস্) না বিরক্ত হয়েন। তাঁহাদের মত লওয়া হইয়াছে জানিয়া, ইঁহারা ধুতি, চাদর, সার্ট পরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন, মিষ্টার দত্তের ধুতি কিম্বা চাদর সঙ্গে ছিল না। জগদীশবাবু সে সব তাঁহাকে দিলেন। রমেশবাবুর তখন বয়স অল্প, ধুতি চাদর পরিয়া কার্তিকটি সাজিয়া যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া, তিনি যখন সাহেবদের দলে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার সেই লজ্জা-লোহিত তরুণ-মূর্ত্তি দৃষ্টে সাহেবমেম-মহলে বেশ একটু স্ফূর্ত্তির স্ফুরণ অনুভূত হইয়াছিল। রমেশ বাবুকেও সে দিন বাঙ্গালী পোষাকে, সেই দলে বেশ মানাইয়াছিল। বাঙ্গালীকে হ্যাটকোট বা চোকা-চাপকান অপেক্ষা যে ধুতি চাদরে অধিক মানায়,সে দিন তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্যই সে দিন এ অনুরোধ করা হইয়াছিল।

অলৌকিক কথার উল্লেখ আমরা সহজে করিতে চাহি না, কিন্তু নিম্নে যে ঘটনাটি বিবৃত হইতেছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক ভদ্রলোকে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এক দিন খুব গরমের সময়, দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া

গিয়াছে, জনপ্রাণীও ঘরের বাহিরে নাই, রৌদ্রতাপ যেন যথার্থ গ্রাস করিতে আসিতেছে, এমন সময়ে একটা নগ্না স্ত্রীলোক, একটা বালকের ছোট হাত একখানি কামড়াইতে কামড়াইতে তমলুক সহরের সমস্ত রাস্তা পর্য্যটন করিতেছিল, যারা তাকে হঠাৎ দেখিয়াছে, তাহারা ভয়ে গৃহের ভিতর পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে, মূর্ত্তি যেমন ভীষণ, তেমনি বিকটাকার। যেদিন এই ঘটনা হইল, তাহার পরদিন হইতে ভয়ানক ওলাউঠা রোগ তমলুকে দেখা দিল, যথেষ্ট মানুষ মরিতে লাগিল, হাহাকার উঠিল, তখন সকল ভদ্র-লোক একত্রিত হইয়া জগদীশবাবুর নিকট যাইলেন, এবং ঘোর বিপদের সময়, কি করা আবশ্যক, তাহার পরামর্শ করিলেন। জগদীশ বাবু বলিলেন, "এ ঘোর দুর্দ্দিনে—মহামারীর সময়, সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদন ব্যতীত আর কে আছেন, সকলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে, তাঁহার পবিত্র নাম লও, সকল বিপদ আপদ চলিয়া যাইবে। সঙ্কীর্ত্তনের সুরে একটি গান বাঁধিয়া দিলেন, ইতর-ভদ্র সকল লোক, নগ্ন পদে, সেই গান গাহিতে লাগিল। সুর সেই হরির চরণে গিয়া মিশিল, তিন দিন কীর্ত্তনের পর, ব্যাধি একেবারে জল হইয়া গেল; লোকে আনন্দে আপ্লুত হইল, এবং জগদীশ বাবুর যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিল। তমলুক মহকুমার লোকেরা জগদীশবাবুকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, ট্যাঙ্গরাখালি হাটের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "জগদীশগঞ্জ" রাখিলেন, এখনও জগদীশগঞ্জ রহিয়াছে, এটি টাউনের একটি বড় হাট।

বালেশ্বরের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। জগদীশবাবু বালেশ্বর জেলার কার্য্য লইয়াছেন মাত্র, এমন সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া কাছারিতে যাইতে পারেন নাই। বাটীতেই আফিস হইতেছিল, সেরেস্তাদার একটি রিপোর্ট পাঠ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, জগদীশ বাবুর জেলায় যাইবার পর ছয় মাস পূর্ব্বে বালেশ্বর থানার একজন কনেষ্টবল রোঁদ দিয়া থানায় ফিরিবার সময় দেখিল, একটা লোক পাকা দেওয়ালে সিঁদ দিয়া একটা গর্ত্ত ফুটাইয়াছে, এবং ঐ গর্ত্তের ভিতর পা গলাইয়া দেখিতেছে যে, প্রবেশ করিবার কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না; জ্যোৎস্নার সামান্য আলোক ছিল, কিন্তু কনেষ্টবল সকলই দেখিতে পাইল, দেখিয়া সে দৌড়াইয়া গিয়া সে লোককে ধরে এবং চীৎকার করিয়া বলে "বাটীতে কে কোথায় আছ, ছুটিয়া আইস, তোমাদের দেয়ালে চোর সিঁদ দিয়াছে এবং তাহাকে আমি ধরিয়াছি, শীঘ্র আইস বিলম্ব করিও না।" কোন লোক উপস্থিত হইবার আগে চোর নিজ হস্তস্থ সিঁদকাঠি দিয়া কনেষ্ট-বলের বক্ষে জোরে আঘাত করিল, কনেষ্টবল চোর ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল, এই অবকাশে চোর পলায়ন করিল, কনেষ্টবল পড়িয়া রহিল। বাটীর লোকজনেরা যখন অকুস্থানে পৌঁছিল, তখন দেখিল, কনেষ্টবল সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে, ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত তীব্রবেগে ছুটিতেছে, কনেষ্টবলের জ্ঞান ছিল, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি ছিল না; তাহাকে ধরাধরি করিয়া নিকটবর্ত্তী থানাতে লইয়া যাওয়া হইল, রক্তস্রাব বন্ধ হইল না, কনেষ্টবল মরিয়া গেল, তাহার মৃতদেহ সিভিল

সার্জ্জনের পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইল, সাহেব রিপোর্টে লিখিলেন যে সিঁদকাঠির মত অস্ত্র দ্বারাই এ লোকটা সম্ভবতঃ আহত হইয়াছে, ক্ষতস্থান দেখিলে বোধ হয়, লোকটা ধস্তাধস্তি করিয়াছে, আর মৃত্যুর কারণ—অযথা রক্তপাত। এই ঘটনার পর কোথায় সে চোর এবং খুনে, তাহার সন্ধান হইতে লাগিল, স্থানীয় সবইন্‌স্পেক্‌টার, ডিভিসনাল ইন্‌স্পেকটার অণ্ডার উড সাহেব, টম্‌সন পুলিস সাহেব, অবশেষে স্বয়ং কলেক্টার বীম্‌স সাহেব ইহার তদন্ত করিয়াছেন, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই। জগদীশ বাবুর নিকট যখন এই নথি পঠিত হইল, তখন সেরেস্তাদার ইহাতে মামুলি হুকুম লিখিয়া আনিয়াছে, "সেরেস্তাবাসদ্" অর্থাৎ ফাইল কর। জগদীশ বাবু কাহাকে সঙ্গে না লইয়া একাকী বালেশ্বরে গেলেন, মাঠে রাখাল বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন রে, তোদের দেশে, এমন একটা খুন হইয়া গেল আর তোরা দেশের লোক সব নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছিস্।" তাহারা উত্তর করিল "আমরা কি করিব, দারোগা বাবু ইহার মধ্যে আছেন, কার সাধ্য কেহ কথা কয়।" জগদীশ বাবু উত্তর করিলেন "তাহা আমি জানি" এবং অনুসন্ধানে জানিলেন যে বাটীতে সিঁদ হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, উহা একজন ধনাঢ্য হিন্দু বিধবার সম্পত্তি, বিধবার অল্প বয়স এবং পুরুষ অভিভাবক কেহ ছিল না, স্ত্রীলোকটীর চরিত্রও ভাল ছিল না, তাহার নিকট দারোগা এবং মৃত কনেষ্টবল যাইত; এই জন্য দুইজনের মধ্যে মনোবিবাদ হয়, দারোগার উত্তেজনায়, বাটীর চাকর-চাকরাণীর সহায়তায় তাহাকে মারা হয়, দারোগা নাথি মারিয়া কনেষ্টবলকে ভূমে পাতিত করিলে, কাপড় চাপিয়া তাহার মুখ বন্ধ করা হয় এবং একটা সরু যন্ত্রের দ্বারা বক্ষে আঘাত করা হয়। যখন রক্তস্রাবে তাহার বাকরোধ হইল, তখন উহাকে বাহিরে ফেলিয়া, দেয়ালে একটা সিঁদ কাটা হয় এবং আপনারা চেঁচার্চেচি করে "চোর ধরেছি, তোমরা এস।" দারোগা এমন ছাপাইয়াছিল যে, সহজে এ কথা প্রকাশ হইত না, কিন্তু ভগবানের প্রসাদে, সব প্রকাশ হইয়া গেল, এবং সমস্ত দোষী ব্যক্তিরা, মায় দারোগা পর্য্যন্ত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, শাস্তি ভোগ করিতে লাগিল। জগদীশ বাবুর খুব সুখ্যাতি হইল এবং সাধারণে আশ্চর্য্য হইয়া, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এক দিন বালেশ্বর জেলার সকল ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ, সব্‌রেজিষ্ট্রার, পোষ্ট-মাষ্টার, বিদ্যালয় এবং পুলিসের ইন্‌স্পেকটার প্রভৃতি একত্রিত হইয়া জগদীশ বাবুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এ ঘটনা সম্বন্ধে আমরা সব জানি, আমাদের কাহার এ খুন বলিয়া ধারণা হয় নাই, আপনার সন্দেহ কিসে হইল?" জগদীশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দেখ, ৩০ বৎসর সরকারী কর্ম্ম করিতেছি, পুলিসেও আসিয়াছি বিশ বৎসরের অধিক, এমন খয়ের খাঁ কনেষ্টবল দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। যে রাত্রে রোঁদ দিতে বাহির হয়, সকলেই একটা আড্ডায় গিয়া ঘুমায়। ধর, কনেষ্টবলটার ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, সে কর্ত্তব্যপরায়ণ তা রোঁদে না হয় বাহির হইল, কিন্তু চোর ধরিতে কোন মতেই সাহসী হইবে না, তফাৎ হইতে চেঁচাচেঁচি করিতে পারে, সাহসের পরাকাষ্ঠা

দেখাইয়া চোর ধরা নিতান্ত অসঙ্গত ও কল্পিত বলিয়া বোধ হইল, আর যখন জানিলাম বাটীর কর্ত্রীটি বিধবা, ধনশালিনী ও মন্দচরিত্রের, তখন সন্দেহ ঘনীভূত হইল, তার পর যখন দারোগার এবং কনেষ্টবলের ওখানে গতিবিধি আছে জানিলাম, তখন তমসাচ্ছন্ন আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল, সকল কথাই বুঝিতে পারিলাম।" সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া এক বাক্যে জগদীশ বাবুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বালেশ্বর হইতে জগদীশবাবু দিনাজপুরে বদলী হন, সেখানে পুলিসের ও দুর্ভিক্ষের— উভয় কর্ম্মই কিছুদিন করিয়াছিলেন। তৎপরে কেবল দুর্ভিক্ষের কার্য্য করেন। রামগঞ্জ বলিয়া একটি সামান্য গ্রাম, দুর্ভিক্ষের প্রসাদে ছোট সহরে পরিণত হইল, বড় বাঙ্গালা, তাঁবু, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চা'লের গোলা এবং শত শত কর্ম্মচারীদের বাসাবাটী লক্ষিত হইল, ইহা একটি সবডিভিসন হইল এবং সবডিভিসনের অধীনে ৬।৭টি সারকেল হইল, জগদীশবাবু সবডিভিসনের কার্য্য পাইলেন এবং সার-কেল অফিসার হইলেন বিখ্যাত স্যার কে, জি, গুপ্ত, খ্যাতনামা বম্বে সিভিলিয়ান পল্যান সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ-কর্ম্মচারী। সার-কেল অফিসারেরা, অবকাশ পাইলেই, জগদীশ বাবুর নিকট থাকিতেন এবং এক বৃহৎ তাম্বুতে আসিয়া বসবাস করিতেন। রিলিফ কমিশনার ছিলেন সিভিলিয়ান মর্লনি সাহেব, তৎপরে রবিনসন্ সাহেব, ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার ছিলেন লাউস সাহেব—যাঁহার নামে দার্জ্জিলিং লাউস স্যানিটেরিয়ম্ হইয়াছে। সাহেবদের জগদীশবাবুর উপর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, একটা উদাহরণ দিই। পল্যান সাহেব বাঙ্গালী কেরাণীদিগের উপর বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে গালি দিয়াছিলেন, তাহাকে একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সাহস করিয়া বলিয়াছিল— "বাঙ্গালী জাতিকে গালি দিতেছেন, কিন্তু জগদীশবাবু ত ঐ বাঙ্গালী জাতিভুক্ত।" তাহাতে সাহেব উত্তর করিলেন, "Dont mention Juggodish Babu He is heaven born আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, ওয়েষ্টমেকট নামক একজন সিভিলিয়ান সাহেব রিলিফ-কমিশনারের পারসন্যাল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন, ইনি জগদীশ বাবুর চারি মাসের ২০০ টাকা করিয়া মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন, বলিলেন যে, "আপনি চারিমাস পুলিসের কার্য্য করিয়াছেন, আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং ঐ চারি মাসের ভাতা আপনি পাইতে পারেন না।" জগদীশবাবু উত্তর করিলেন, "যে তারিখ হইতে গবর্ণমণ্ট তাঁহাকে ডিপিযুট করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তিনি যে কোন কর্ম্মই করুন না, দুইশত টাকা মাসিক ভাতা পাইবার দাবী তাঁহার আছে। সাহেব টাকা দিলেন না, সুতরাং জগদীশবাবু কলি-কাতায় আসিয়া এ কথা চিফ সেক্রেটারী বারনার্ড সাহেবকে জানান বারনার্ড সাহেব টাকা পাঠাইবার জন্য ওয়েষ্টমেকটকে লিখিলেন, তিনি টাকা না পাঠাইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তর্ক করিতে গেলেন, তাহাতে বারনার্ড সাহেব বিরক্ত হইয়া লিখিলেন, "তুমি পত্র পাঠ, নিজের খরচে এই টাকা পাঠাইবে, যদি না পাঠাও, তবে তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য যে জগদীশবাবু

কলিকাতায় বসিয়া টাকাটি সত্বর পাইলেন। দিনাজপুর দুর্ভিক্ষে সুচারুরূপে কার্য্য করার জন্য, জগদীশবাবু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় ড্যাম্‌পিয়ার সাহেব ইঁহাকে বলিয়াছিলেন 'You are a Famine hero" দিনাজপুর-দুর্ভিক্ষে অনেক সুবাদার মেজর, সুবাদার, বেসালদার, হাওলদার পলটন হইতে আসিয়া ইঁহার অধীনে কার্য্য করেন, দেশীয় নেটিভ সিভিল-সার্ব্বিস পাশ-করা লোকও তাঁহার অধীনস্থ ছিল, দুই দলকেই তিনি সমভাবে ব্যবহার করিতেন এবং সকলেই তাঁহার সদ্ব্যবহারে তুষ্ট ছিলেন। দিনাজপুর হইতে জগদীশবাবু ত্রিপুরায় যান, এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত নদীতে ডাকাতি আরম্ভ হইল, জেলার পুলিস সাহেবেরা স্থানীয় বদ্‌মায়েসদের চক্ষে চক্ষে রাখিলেন, কিন্তু কোন ফল ফলিল না, ডাকাতি সমভাবে চলিতে লাগিল। ছোটলাট ইডেন সাহেব অত্যন্ত তম্বি-তাগাদা আরম্ভ করিলেন, জেলার সাহেবেরা নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। জগদীশ বাবু অনেক বিবেচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, এ ডাকাতি সরকারী লোকের কৃত এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য কি না জানিবার জন্য তিনি একজন ইন্‌স্পেকটারকে নিযুক্ত করিলেন, আর তাহাকে বলিয়া দিলেন ঢাকা হইতে সিলেটে নদী দিয়া যে ডাক-বোট যায়, সেই বোট-ওয়ালাদের এই কার্য্য, ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিলে হাতেনাতে ধরা পড়িবে। যে রকম আজ্ঞা দিলেন, সেই রকমই করা হইল, হাতে হাতে সুফল পাইলেন, ডাক বোটওয়ালারা ডাকাতি করিতেছে, এমত অবস্থায় ধরা পড়িল, বিচারে শাস্তি পাইল, ছোট লাট জগদীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন তিনি ত্রিপুরা হইতে দুই বৎসরের ফার্লো ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। (ক্রমশ)

আশা

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া,
আসবে ছুটে দখিন হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে
সুগন্ধ ধন লুটবে॥

আমার লজ্জা যাবে, যখন পাব
দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন॥
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তারে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার টুটবে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Printed by K. C. Chakravarty, Girish Printing Works, 52 Sukea Street, Calcutta.

বঙ্গদর্শন

সম্পাদকের বৈঠক *

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী

উপস্থিত—বিজয় ও সম্পাদক

বিজয়—দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যাপারটা কি, একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন্ তো। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এমন কি প্রয়াগ ও আগ্রা পর্য্যন্ত এতটা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, ইহার হদিস কি, বুঝতে পাচ্ছি না। এদের হঠাৎ এতটা সাহস গজা'ল কিসে? স্বদেশীর সময় তো এরা কিছুই করে নাই, বরং আমাদের আন্দোলনটাকে চাপিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছিল।

সম্পাদক—কথাটা তো এত কঠিন নয়। তোমাদের স্বদেশী আন্দোলন এদেশের ইংরেজ-রাজপুরুষদের সঙ্গে একটা বিবাদ বাধাইয়াছিল; রাজপুরুষেরা ইহার প্রতিবাদী ছিলেন। কাজেই দূরদর্শী রাজনীতিকেরা এই ভয়াবহ ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই।

বিজয়—কিন্তু গান্ধি আফ্রিকার Passive Resistanceএরই ধ্বজা তুলিয়াছেন তো। আফ্রিকার Passive Resistance আর বাংলার Passive Resistanceএ কোনও বেশ-কম আছে কি?

সম্পাদক—বেশ-কম যে আছে, তা তো চক্ষের উপরেই দেখিতেছ। বাংলার Passive Resistanceএর যারা ঘোরতর প্রতিবাদী ছিলেন, প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ বলিয়া যাঁরা ইহার নিন্দা করিয়াছেন, তাঁরাই যখন দক্ষিণ আফ্রিকার এই Passive Resistanceএর এতটা সমর্থন করিতেছেন, তখন দুই যে এক বস্তু নয়, ইহার প্রমাণ তো হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

বিজয়—কথাটা ধর্ত্তে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—আচ্ছা, প্রথমে একটা অতি মোটা কথা বলি। দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট আর এদেশের গভর্ণমেণ্ট তো এক নয়। এদেশের গভর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদে সিডিশন হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদে আইনতঃ কোনও অপরাধ তো

* আশা করি, এ বৈঠক বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বৈঠক বলিয়া কেহই মনে করিবেন না।—বঃ সঃ।

হয় না ও হইতে পারে না। সুতরাং ভারতবর্ষে বসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করাতে কোনও দোষ হয় না, কোনও আপদ-বালাইও নাই।

বিজয়—কিন্তু রিজলী সাহেব নূতন প্রেস্-আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে যাইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তা তো আপনার মনে আছে। তাহাতে তো স্পষ্টাক্ষরেই দক্ষিণ-আফ্রিকার হিন্দু-মুসলমান প্রবাসীদিগের অভাব-অভিযোগ লইয়া এদেশে আন্দোলন করিলেও রাজদ্রোহিতা ও পরজাতিবিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। সে সময় তো আমরা সকলেই ভাবিয়াছিলাম এ বিষয়ে আন্দোলন আলোচনা করাও দূষণীয় ও ভয়াবহ। সে দোষটা কাটিয়াছে কিসে?

সম্পাদক—লাট হার্ডিঞ্জের উদার ও দূরদর্শিনী রাষ্ট্রনীতিতে। লাট মিণ্টোর রাজত্বকালে এইভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কিছুতেই সম্ভব হইত না। দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের অপযশে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে স্পর্শ করে না তাও নয়। এই আন্দোলনের দ্বারা দেশে শ্বেতাঙ্গবিদ্বেষ জাগিবার ও বাড়িবার আশঙ্কা যে নাই, এমনও বলা যায় না। কিন্তু তথাপি লাট হার্ডিঞ্জ এ আন্দোলনটাকে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয়া মারিতে চান না। তিনি জানেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, এই সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে যদি ঘননিবিষ্ট করিতে হয়, তবে বুয়র গভর্ণমেণ্টের এই অর্ব্বাচীনতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। আর বুয়র গভর্ণমেণ্টের এই আত্মঘাতী নীতির সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ও ইংরেজজাতির চেতনাকে ভাল করিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই চেতনাকে ভাল করিয়া জাগাইতে হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকার এই অত্যাচারের ফলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ও সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা প্রবল অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, এটীও প্রমাণ করা আবশ্যক। এইজন্যই লাট হার্ডিঞ্জ এই আন্দোলনকে চাপিয়া রাখিতে চান না, বরং আপনি ইহাতে প্রকাশ্যভাবে ইন্ধন সংযোগ করিয়াছেন।

বিজয়—এটাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় যারা গভর্ণমেণ্টের আইন ভাঙ্গিয়া আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, বড়লাট বাহাদুর মান্দ্রাজের জননায়কদিগের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, কেমন করিয়া যে প্রকাশ্যভাবে তাদের এই বে-আইনী কাজের পোষকতা করিলেন, বুঝিতে পারি না।

সম্পাদক—তুমিই যে কেবল বুঝতে পার নাই তা নয়, বড় বড় রাজনীতিকেরাও ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। যাঁরা নিজেরা বুয়র গভর্ণমেণ্টের এই সংকীর্ণ নীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁরাও লাট হার্ডিঞ্জের এই কাজটা সমর্থন করিতে পারেন নাই। এমন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ হইয়াও লাট বাহাদুর এমন অদূরদর্শিতার পরিচয় কেন দিলেন, টাইমসের এমন কি ডেইলিনিউজ প্রভৃতি লিবারেল সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণও ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁরা লাট হার্ডিঞ্জের এ কাজটার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বিজয়—আমরাও তো এ রহস্যভেদ কর্ত্তে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—এটী ভেদ করিতে হইলে লাট হার্ডিঞ্জের সমগ্র সাম্রাজ্যনীতিটীর মর্ম্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। যে নীতির দ্বারা বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইয়াছে, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা Provincial Autonomyর আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে, বিটিশ ভারতের রাজধানীকে কলিকাতা হইতে তুলিয়া দিল্লীতে বসাইবার আয়োজন হইয়াছে এবং লাট মিন্টো যে দুর্দ্ধর্ষ শাসননীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের অসন্তোষবহ্নিকে নিঃশেষ নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন নানা দিকে অলক্ষিতে তার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, যে নীতির ফলে এ সকল হইয়াছে ও হইতেছে—দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান বিরোধ সম্বন্ধে লাট হার্ডিঞ্জ মান্দ্রাজে যে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সেই সাম্রাজ্য নীতিরই অনুসরণ করিয়াছে। চুটকী রাজনীতি লইয়া যারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের পক্ষে এই সূক্ষ্ম, উদার ও সুদূরদর্শিনী নীতির মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত নহে। যত দেখিতেছি ততই লাট হার্ডিঞ্জ যে আজি-কালিকার ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ এই প্রতীতি দৃঢ় হইতেছে।

বিজয়—লাট হার্ডিঞ্জ আমাদের অনেকেরই চক্ষে একটা জটিল ও দুর্ভেদ্য সমস্যার মতন হইয়া পড়িতেছেন। আমরা তাঁর কাজকর্ম্মের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না।

সম্পাদক—লাট হার্ডিঞ্জকে বুঝিতে হইলে, প্রথমে, আজকালকার সাম্রাজ্যের আদর্শটাকে ভাল করিয়া বোঝা আবশ্যক। ফলতঃ য়ুরোপের লোকেরা সাম্রাজ্যনীতির জন্য যতই ব্যাগ্র হউক না কেন, সাম্রাজ্যের সত্য তত্ত্বটী এখনও ধরিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যের প্রকৃত মর্য্যাদা ও মূল্যই বা কি, ইহাও য়ুরোপ এ পর্য্যন্ত বোঝে নাই। কেবল পররাষ্ট্রাপহরণের দ্বারা সত্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। বহুবিধ দুর্ব্বলতর জাতিকে প্রবলতর ক্ষাত্র-শক্তির বা পশুবলের দ্বারা আপনার পদানত করিয়া রাখিলেও সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে না। প্রথমে এই ভাবেই অনেকগুলি দেশ ও অনেকগুলি জাতি একটা রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু এ সকল দেশ ও জাতিকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে হইলে, ইহাদের পরস্পরের স্বত্ব ও স্বার্থের মধ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়া ইহাদিগকে এক করিতে হয়। এরূপ না করিতে পারিলে, কালক্রমে যে প্রবলশক্তির তাড়নায় তাহারা এক রাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছিল, সেই শক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন যে যেমন পারে সে সেইভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া এই বন্ধনহীন সাম্রাজ্যকে ছারখার করিয়া ফেলে। পুরাকালে মেসিদনীয় সাম্রাজ্য এবং তার পরে রোমের বিশাল সাম্রাজ্য, এই কারণে এবং এই ভাবেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়ে। রোম অতিবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও, আপনার অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে কোনওরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহারা সকলে রোমের অধীনতা মাত্রই স্বীকার করিয়া চলিত, কিয়ৎপরিমাণে রোমক রাষ্ট্রীয়-নীতির স্বত্ব-স্বাধীনতাও সম্ভোগ করিত; মোটামুটি রোমের উদার আইন-কানুনের দ্বারা ইহাদের শাসন-সংরক্ষণও পরিচালিত

হইত; কিন্তু তথাপি রোমক-সাম্রাজ্য যে তাহাদের নিজের বস্তু, রোম অঙ্গীরূপে তাহাদিগকে আপনার জীবন্ত অঙ্গ করিয়া যে নিজের সঙ্গে গাঁথিয়াছে এবং এই রোমক-সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপেও এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যেও যে একটা ঘনিষ্ঠ, জীবন্ত, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, রোমের অধীনস্থ দেশসমূহ এমনটা কখনওই অনুভব করিতে পারে নাই। ইহাদের শাসনশক্তিরই ঐক্য সাধিত হইয়াছিল, স্বার্থের একতা সাধিত হয় নাই। রোমকে ছাড়িয়া ইহাদের আত্ম-চরিতার্থতালাভ অসম্ভব ও অসাধ্য, রোমক সাম্রাজ্যাধীন বিভিন্ন ভূভাগ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে অতিশয় হীনবল ও আত্ম-স্বার্থ-সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িবে,—আর এইজন্যই যে রোমের স্বার্থের ও শক্তির সঙ্গে ও পরস্পরের শক্তি-স্বার্থের সঙ্গে এ সকল অধীনস্থ রাষ্ট্রের স্বত্ব-স্বার্থ জীবন্তরূপে জড়িত রহিয়াছে, একের অভাবে অপর সকলের ক্ষতি, একের অভ্যুদয়ে অপর সকলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী,—এ ভাবটা রোমক-সাম্রাজ্যের মধ্যে ফুটিবার অবসর পায় নাই। চূণ-শুরকীর গাঁথুনী না বাঁধিয়া, কেবল কতকগুলি ইঁট ও কাঠ একটা বিশাল এমারতের আকারে সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইয়া রাখিলে যেমন চক্ষে তাহা একটা প্রাসাদের মতন দেখা গেলেও, সত্য সত্যই তাহার কোনও একত্ব ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না;—এই সকল ইঁট-কাঠের মধ্যে যেমন কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, কোনও অটুট গাঁথুনী গড়িয়া উঠে না;—সেইরূপ পরস্পরের স্বত্ব-স্বার্থের মধ্যে কোনও সত্য ও সজীব বন্ধনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়া, রোমের শাসনাধীন বিশাল ভূভাগে প্রকৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর রোমের সেই শাসন-কেন্দ্র যখন আপনার ভারে আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন এই অপূর্ব্ব সাম্রাজ্যও ঐ গাঁথুনীহীন ইঁট-কাঠের এমারতের মতন খসিয়া ধসিয়া পড়িল। যে যেরূপভাবে পারে, আপনার স্বার্থ ও শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। এই কারণে এবং এইরূপেই যেমন রোমক-সাম্রাজ্যের সেইরূপ মেসিদনীয় সাম্রাজ্যেরও ধ্বংস হইয়াছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে, আধুনিককালে, এই কারণে এবং এই ভাবেই মোগল-সাম্রাজ্যও ছারখার হইয়া গিয়াছে। মোগলেরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে আপনাদের অধিকারভুক্ত মাত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সকলের সঙ্গে দিল্লীর মস্নদের কোনও প্রকারের জীবন্ত ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। দিল্লীর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের কোনও প্রকারের সত্য মমত্বাভিমান জন্মে নাই। এই সাম্রাজ্য আমাদের, আমরা এই সাম্রাজ্যের, ইহার গৌরবে আমাদের গৌরব, ইহার পরাভবে আমাদের পরাভব; ইহার শক্তির দ্বারা আমরা শক্তিশালী, আমাদের শক্তি দ্বারা এই সাম্রাজ্য আপনিও শক্তিমান হইয়াছে; আমাদের ক্ষুদ্রতর স্বার্থ এই সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত; চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি যেমন এই দেহেতে অধিষ্ঠিত, ইহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট শক্তি ও সুখ-সাধনের দ্বারা দেহ যেমন সুখী ও শক্তিসম্পন্ন হয়, দেহের দৌর্ব্বল্যে ও হীনপ্রাণতায় এ

সকল ইন্দ্রিয় যেরূপ আপনা হইতেই দুর্ব্বল ও নির্জীব হইয়া পড়ে,—সেইরূপ দিল্লীর শাসন-কেন্দ্রের সঙ্গে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের একটা ঘনিষ্ঠ, জীবন্ত, পরস্পরাপেক্ষী অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই জ্ঞান ও উপলব্ধি হইতেই কেবল দিল্লীর সম্বন্ধে মোগলাধিকৃত বিভিন্ন প্রদেশের একটা মমত্ব-বোধ জন্মিতে পারিত। দিল্লীর মোগল-রাজশক্তি আপনার অধীনস্থ প্রদেশ সকলের স্বার্থকে ও প্রাদেশিক জীবনকে এইভাবে আপনার স্বার্থের ও জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া ও মিশাইয়া লইতে পারে নাই। সুতরাং দিল্লীর শাসন যতই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, ততই মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সকল আপন আপন বিশিষ্ট স্বার্থ-সাধনে নিযুক্ত হইয়া, একদিকে মোগল শাসন-শক্তি ও অন্যদিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গাঁথুনীবিহীন ইঁট-কাঠের সাজান এমারতের মতন দিল্লীর বিশাল সাম্রাজ্যও খসিয়া ধসিয়া পড়িয়া গেল। কেবলমাত্র ক্ষাত্রশক্তির উপরে যে সত্য ও স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা একান্ত অসাধ্য মেসিদন, রোম, দিল্লী সকলেই ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে।

বিজয়—আপনার কথাগুলি কেমন নূতন-তর ঠেকছে। রোমের লোকেরা বড় বিলাসী হয়ে পড়ল, আত্মভোগে রত হয়ে রাজ্যের কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ও অসমর্থ হইয়াছিল বলিয়াই রোমের সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গেল; আমরা চিরদিন তো এই কথাই শিখিয়াছি। আর মোগল বাদশাহেরাও যখন হীনবীর্য্য ও হতবল হইয়া পড়িলেন, তখনই তাঁদের বাদশাহীও লোপ পাইল, ইতিহাস এই কথাই তো বলে। আর ইহাই তো সত্য বলিয়াও মনে হয়।

সম্পাদক—সত্য বটে, কিন্তু আধখানা সত্য। কোনও বিরাট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে যে শাসন শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, যতদিন তাহা প্রবল ও কার্য্যক্ষম থাকে, ততদিন সে সাম্রাজ্য নষ্ট হয় না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহা exciting cause মাত্র, real cause নহে। ইহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র; মূল হেতু নয়। আচ্ছা, প্রথমে রোমের কথাটাই আর একটু তলাইয়া দেখা যাউক। রোমের সাম্রাজ্য ছারেখারে দিলে কারা? তারা তো সেই সাম্রাজ্যেরই ভিতরকার লোক। রোমের মতন আর একটা প্রতাপশালী সাম্রাজ্য যদি তখন থাক্‌তো; আর সেই সাম্রাজ্য আসিয়া যদি রোমের উপরে চড়াও করিয়া তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত; তাহা হইলে এই বিনাশের বীজ রোমের নিজের ভিতরেই ছিল, এমনটা নাও বা বলিতে পারিতাম। কিন্তু তা তো হয় নাই। রোম যাদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিল, রোম দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, তারাই বিদ্রোহী হইয়া তার বিশাল সাম্রাজ্যকে ছারখার করে। রোম যদি এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোককে কেবল আপনার অধিকারভুক্ত না করিয়া, অঙ্গীভূত করিতে পারিত, তা হ'লে এটা হতো কি? রোমের নিজের শক্তি কমিলেও তখন রোমের সাম্রাজ্য এই সকল প্রদেশের সমবেত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া থাকিত।

বিজয়—তবে কি আপনি বলেন এ সংসারে একটা অমর সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারা যায়? কাল সংসারের সকলকেই ক্ষয়

করে, আর মানুষের গড়া একটা বিরাট রাষ্ট্রতন্ত্র কালের প্রভাব অতিক্রম ক'রে অক্ষয়, অমর হইয়া থাকিবে ?

সম্পাদক—বিশেষ বিশেষ মানুষেরই জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু ঘটে, সমষ্টিভূত যে এই মনুষ্যসমাজ কবে তার উৎপত্তি হইয়াছিল তাও জানি না; কত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে এ সমাজ আছে তাও জানি না, আর কখন যে এ সমাজ একেবারে লোপ পাইবে, তাও বুঝি না। প্রত্যক্ষতঃ ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর অধীন হইলেও, কার্য্যতঃ এই সমষ্টিভূত মনুষ্যসমাজটা কি অমর নহে? যেমন ব্যক্তিবিশেষের সেইরূপ সমাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রবিশেষের কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থান্তর ঘটিতে পারে, ঘটিয়াছে জানি। বেবিলনীয়, আসিরীয়, মিদীয়, প্রাচীন মিশর, মেসিদনীয়, গ্রীক বা রোমক সমাজ কেহ বা নিঃশেষ ধ্বংস পাইয়াছে, কেহ বা নামশেষ মাত্র আছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু সমষ্টিভূত যে বিরাট বিশ্বমানব সমাজ তা তো 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' চিরদিনই আছে। যে সকল ব্যষ্টিভূত সমাজ এই বিশ্বমানব-সমাজের সঙ্গে আপনার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে, তাদের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ সম্ভব, কিন্তু বিনাশ কি অসম্ভব নয়? সর্ব্বত্রই যে বিরাটকে আশ্রয় ক'রে সেই অমৃতত্বায় কল্পতে।

বিজয়—কথাটা বড় উঁচু হইয়া পড়িতেছে।

সম্পাদক—তা ঠিক বলছ বটে। পরমতত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে, নিম্নতর সমাজতত্ত্বের দিক্‌ দিয়াই এ প্রশ্নটার আলোচনা করা যা'ক। আমরা সকলেই কৌমার, যৌবন, জরাদি অবস্থা প্রাপ্ত হই; আর যৌবনের কর্ম্মঠতা জরাতে থাকে না। কিন্তু যখন আমরা পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করি, তখন আমাদের নিজেদের বার্দ্ধক্য ও জড়তায় সে পরিবারের তো সকল সময় প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় না। হয় না কেন? এইজন্য যে, পরিবারটা একটা বিপুল অঙ্গী। পরিবারস্থ সকলে এই অঙ্গীর অঙ্গ। সুতরাং কালবশে এক অঙ্গ যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অপর অঙ্গ তখন তাহাকে আপনার বল দিয়া যথাসাধ্য রক্ষা করিতে যায় এবং তার কর্ম্মভার আপনি মাথায় লইয়া আপনার শক্তি ও ত্যাগের দ্বারা অঙ্গীর দুর্ব্বলতা দূর করিয়া থাকে। আদর্শ পরিবারে বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে, বয়ঃকনিষ্ঠেরা আসিয়া তখন সে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া, পরিবারের শক্তি ও সম্পদ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। আর আপন আপন পরিবার সম্বন্ধে ইহাদের একটা গভীর ও অকৃত্রিম মমতাবোধ হইতেই এটী সম্ভব হয়। এই পরিবার আমাদের, আমরা এই পরিবারের,—এই পরিবারের শক্তিতেই আমাদের শক্তি, ইহার মর্য্যাদায়ই আমাদের মর্য্যাদা, ইহার প্রতিষ্ঠায়ই আমাদের প্রতিষ্ঠা; আর ইহার দুর্ব্বলতায় আমরা দুর্ব্বল, ইহার অপ্রতিষ্ঠায় আমরা অপ্রতিষ্ঠ, ইহার অমর্য্যাদায় আমরা অসম্মানিত হই—এই যে একটা জ্ঞান, বা ভাব, বা ধারণা, বা সংস্কার, ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের স্থায়িত্ব ও একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবটা যতদিন থাকে, ততদিন পরিবারবিশেষের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা অক্ষম, কেহ বা সক্ষম, কেহ বা সবল, কেহ বা দুর্ব্বল, কেহ বা জ্ঞানী

কেহ বা অজ্ঞ, এরূপ ভেদাভেদ থাকে বলিয়া তার সমষ্টিভূত শক্তি, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা কখনও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। আর-একটা প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের প্রবলতর শক্তি-সামর্থ্যের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়া এই পরিবারটী হতমান ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতে পারে, কিন্তু পরিবারের ভিতরকার কেহ দুর্ব্বল হইলে ও অপরের শক্তি সাধ্য থাকিলে, এই দুর্ব্বলতার জন্য সকলের হাতে এ পরিবারের বন্ধন নষ্ট হয় না।

বিজয়—কিন্তু সর্ব্বদাই তো এরূপ হইতেছে। "স্বর্ণলতা" যে বাঙ্গালী জীবনের একখানা অতি খাঁটি ছবি, এ কথা তো আজিও কেহ অস্বীকার করেন নি।

সম্পাদক—আমিও করি না। চারিদিকে যে এরূপ হচ্ছে, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু হচ্ছে কেন, ভেবে দেখেছ কি? একদিন যে ঠিক এরূপ হতো না,—সেও খুব বেশী দিনের কথা নয়,—ইহাও তো অস্বীকার করা যায় না। তবে আজই এতটা পরিমাণে আমাদের পরিবারগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে কেন? আমাদের নিজ নিজ পরিবার সম্বন্ধে এই মমত্ববোধটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই কি এরূপ হচ্ছে না?

বিজয়—নষ্টই বা হয় কেন?

সম্পাদক—তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষাতে আমাদের মধ্যে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান বা Sense of individuality জাগিয়ে দিয়েছে;—আমাদের প্রাচীন পারিবারিক বন্ধন যে শিথিল হইয়াছে, ইহা তার একটা প্রধান কারণ। তারপর খৃষ্টীয়ানী ধাঁথের ব্যক্তিত্বাভিমানী ধর্ম্মনীতি বা individualistic ethics আমাদের স্বাভাবিক স্বার্থপ্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছে। এই ধর্ম্মনীতির প্রভাবে আমরা যাদের জন্ম দিয়াছি তাদের লালন-পালনের ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। পরিবারের অপর কাহারও সম্বন্ধে ছোট ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয় প্রভৃতির প্রতি সেরূপ কর্ত্তব্য দায়িত্ব নাই—এই ভাবটা জন্মিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রবল করিয়া পারিবারিক সম্বন্ধকে শিথিল করিয়াছে। ইউরোপের অর্থনীতির বা Political Economyর শিক্ষাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। আগে আমাদের দেশে পরিবারের সকলে মিলিয়া কোন ব্যবসা-বিশেষে নিযুক্ত থাকিত, এইজন্য একটা অতি সুন্দর Co-operative labour system প্রচলিত ছিল। এখনও একান্নবর্ত্তী কৃষক ও কারিকরদের মধ্যে এ প্রথাটী প্রবর্ত্তিত আছে। আর এইজন্যই এ সকল স্থলে আমাদের পুরাতন আদর্শের পরিবার গঠনটা এখনও বজায় আছে। কিন্তু যে পরিমাণে আমরা চাকুরীজীবী হইতেছি, সেই পরিমাণে এই পারিবারিক শ্রম-সমবায়-প্রথা বা Co-operative labour systemটা উঠিয়া যাইয়া, একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিত্তিটাকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কিন্তু এই প্রশ্নের সম্যক্ বিচার আলোচনা করিতে হইলে, সমগ্র অর্থনীতি, বিশেষতঃ আধুনিক যুরোপীয় পলিটিক্যাল ইকনমির (Political Economy) আলোচনা করিতে হয়। সে অতি বিস্তৃত কথা। তার মধ্যে একবার ঢুকিয়া পড়িলে, যে মূল কথাটা তুলিয়াছ, তার খেই হারাইয়া ফেলিব।

বিজয়—একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠনের সঙ্গে সাম্রাজ্য-গঠনের বা Empire-constitution-এর কোন তুলনা হয় কি ?

সম্পাদক—তুলনা খুবই হয়। প্রথমতঃ একটা পরিবার যেমন কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, সেইরূপ একটা সাম্রাজ্য কতকগুলি রাষ্ট্রের সমষ্টি নয় কি ? এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা কি, তাই একবার তাকাইয়া দেখ। গ্রেট বিটেন্ এবং আয়র্লণ্ডের যুক্তরাজ্য + ভারতবর্ষ + অষ্ট্রেলিয়ার জনতন্ত্র + ক্যানাডা + নিউ-জিলেণ্ড + দক্ষিণ-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র—এই সমষ্টিই কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নহে ? অতএব এই দিক দিয়া দেখিলেও একটা পরিবারে, একটা রাজ্যে এবং একটা সাম্রাজ্যেতে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর প্রশ্ন হয়,—এই সমষ্টিটা কোন্ জাতীয় ? সমষ্টি দ্বিবিধ—ইংরেজিতে একজাতীয় সমষ্টিকে mechanical, আর অপরটিকে organic বলা যায়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ইঁটকে এক জায়গায় স্তূপাকার করিয়া রাখিলে, সে সমষ্টিকে mechanical বলা যায়। আবার এই ইঁটগুলিকে চূণ-সুরকী দিয়া একটা এমারতের আকারে গাথিয়া তুলিলে যে সমষ্টির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা ঠিক এই জাতীয় নহে। তাকে ঠিক organicও বলা যায় না বটে ; তবে বস্তুর দিক দিয়া তাহা organic না হইলেও, ভাবের দিক্ দিয়া একরূপ organicই বটে। ইংরেজিতে যাকে organic relation বলে, আমাদের প্রাচীন দর্শনের পরিভাষায় তাকেই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। আর এমারতের ইঁট-কাঠের সম্বন্ধটা এভাবে organic বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ যে নয়, ইহা বলা যায় না। সমগ্র এমারতটা এখানে অঙ্গী ; দেয়াল, দরজা, জানালা, ছাদ, ভিত, কার্ণিশ, থাম,—এগুলি এই অঙ্গীর অঙ্গ। আবার প্রত্যেক দেয়ালও নিজে অঙ্গী, তার ভিন্ন ভিন্ন ইঁট তার অঙ্গ। এমারতের একখানা ইঁট যদি খসিয়া পড়ে, বা তার একটা কোণ যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সমগ্র এমারতটীর অঙ্গহানি বা প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটে। ইহাই organic relation এর বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের মূল লক্ষণ।

বিজয়—পারিবারিক সম্বন্ধটাকে আপনি কি organic বা অঙ্গাঙ্গী বল্‌তে চান ?

সম্পাদক—তা নয় কি ? কেবল কতকগুলি লোকের সমষ্টিকেই তো পরিবার বলা যায় না। গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখিবার জন্য যে সকল লোক একত্রিত হয়, তারা একটা জনসংঘ মাত্র ; একটা পরিবার তো নয়। একটা জাহাজে সমুদ্রপারে যাইবার সময় অনেকদিন ধরিয়া অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বাস করে, একত্রে খায় দায় ; কিন্তু তাই বলিয়া তারাও একটা পরিবার হয় না। হয় না এই জন্য যে, ইহাদের পরস্পরের সুখ ও স্বার্থের মধ্যে এমন কোনও সম্বন্ধ থাকে না যাহাতে একের লাভে সকলের লাভ ও একের ক্ষতিতে সকলের ক্ষতি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। গড়ের মাঠের ঐ জনতার মধ্যে কোনও এক ব্যক্তির পকেট হইতে যদি হাজার টাকার এক কেত্তা নোট চুরী যায়, তাহাতে তাঁর আশে পাশে যাঁরা দাঁড়াইয়াছিল, তাদের একজনারও এক পয়সার ক্ষতি হয় না। অথবা তিনি যদি হঠাৎ সেখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া মারা যান

তাহা হইলে তাতেও তাঁর চারিধারের অপর কারও সংসারের কোনও ক্ষতি বা পরিবর্ত্তন হওয়া অনিবার্য্য নহে। কিন্তু এ সকল দুর্ঘটনায় তাঁর পরিবারের লোকের সমূহ ক্ষতি হয়। তাঁর অর্থনাশে তারা দরিদ্র, তাঁর প্রাণনাশে তারা অসহায়, হইয়া পড়ে। আর এই জন্যই তাঁর সঙ্গে তাদের ও তাদের সঙ্গে যে তাঁর একটা গাথুনী আছে, ইহা বোঝা যায়। এ গাথুনী কেবল প্রেমের নয়, কিন্তু স্বার্থের, কেবল পরমার্থের নয়, কিন্তু সংসারের। প্রেমের গাথুনী পরিবারের বাহিরের বহুলোকের সঙ্গে বাধিতে ও থাকিতে পারে। পরমার্থের সম্বন্ধ দুনিয়ার সকলের মানুষের সঙ্গেই আছে। কিন্তু তাহাতে পরিবার গড়ে না। যে গাথুনীতে পরিবার, সমাজ, রাজ্য, সাম্রাজ্য প্রভৃতি গড়িয়া উঠে, তাহা নিরাকার প্রেম-বন্ধন নহে, নিতান্ত সাকার স্বার্থের বন্ধন। এই স্বার্থের বন্ধন আছে বলিয়াই—পরিবারের একের স্বার্থসাধন তাহার অন্তর্গত অপর সকলের স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং পরিবারের লোকেদের পরস্পরের আত্ম চরিতার্থতালাভ পরস্পরের অপেক্ষা রাখে বলিয়াই পারিবারিক সম্বন্ধকে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বলা যায়। আর ইহাতেই পরিবারের একত্ব যে mechanical unity নহে, কিন্তু organic unity,—ইহা প্রতিপন্ন হয়। এই পারিবারিক সম্বন্ধটা যেমন অঙ্গাঙ্গী, সাম্রাজ্য সম্বন্ধটাও ঠিক সেইরূপই হওয়া চাই।

বিজয়—এ পর্য্যন্ত তো দুনিয়ায় এমন সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে নাই।

সম্পাদক—উঠে নাই বলিয়াই সর্ব্বত্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা জাতির মধ্যে এতটা বিরোধও জাগিয়া আছে। যত দিন না কোনও সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা সত্য ও জীবন্ত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তত দিন সে সাম্রাজ্য একটা কৃত্রিম ঐক্য বা mechanical unity মাত্র লাভ করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জীবন্ত একত্ব বা organic unity লাভ করে না ও করিতে পারে না। ততদিন দুর্ব্বল যে সে প্রবলের পদানত থাকিয়া তার সম্রাট-অভিমানকে পরিপুষ্ট করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে দিন পায় তখনই এর প্রতিশোধ তুলিবার জন্য অগ্রসর হয়। রোমের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। আর রোমক-সাম্রাজ্য এবং মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মূল কারণ এই যে, এরা একটা কৃত্রিম ঐক্য মাত্র স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু আপনার মধ্যে একটা সত্য ও সজীব একত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

বিজয়—এই একত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই কি স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিয়া মোগল-সম্রাটেরা চিরদিন বুদ্ধিমন্ত ও শক্তিশালী থাকিতে পারিতেন? আর তাঁদের বুদ্ধিহানি ও শক্তিক্ষয় হইলে, সাম্রাজ্য থাকিত কিরূপে, বুঝতে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—বেশ প্রশ্নটী তুলেছ। কথাটা এখন আরো পরিষ্কার হইয়া যাইবে। সত্য বটে স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করা কারোই সাধ্য নয়। মোগল-সম্রাটেরা দু'দিন আগেই হউক, আর দু'দিন পরেই হউক, দুর্ব্বল ও অদূরদর্শী হইয়া পড়িতেন ইহা একরূপ স্থির নিশ্চিত। কিন্তু পরিবারের কর্ত্তা যখন জরাগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য ও অশক্ত হইয়া পড়েন,

তখন কি সর্ব্বদাই সে পরিবারও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ? না, বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা দুর্ব্বল ও অকর্ম্মঠ হইয়া পড়িলে ক্রমে বয়ঃকনিষ্ঠেরা আসিয়া তাঁদের কর্ম্মভার নিজেদের মাথায় লইয়া পরিবারের সমষ্টিগত জীবনের শক্তি ও সম্মান রক্ষা করেন ? একটা সুগঠিত রাষ্ট্রেও তাহাই হয়। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ইঁহারা ব্যক্তিগতভাবে জরাগ্রস্ত, বা অন্যকারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে, যারা সক্ষম তাঁরাই আসিয়া তাদের স্থান গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের জীবন ও শক্তি ও প্রতিষ্ঠা যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন। এটা হয় না কেবল স্বেচ্ছাতন্ত্র-রাজ্যে। আর স্বেচ্ছাতন্ত্র অর্থই এই যে যাহা প্রকৃতপক্ষে দশজনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব, তাহা একজন লোকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী সে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতে চেষ্টা করে। সে অবস্থায় দশজনের শক্তি সমবেত হইয়া রাষ্ট্রের কর্ম্মে নিয়োজিত হইবার যথাযোগ্য অবসর পায় না। আর সেখানে যার হাতে রাজ্যের সকল শক্তি ও সকল কর্ম্ম কেন্দ্রীভূত হয়, সে যখন দুর্ব্বল ও অপটু বা অদূরদর্শী হইয়া পড়ে, তখন কাজে কাজেই রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা এবং শক্তিও আর থাকে না। এই কারণেই স্বেচ্ছাতন্ত্র রাষ্ট্র সকল একদিকে যেমন কোনও অসাধারণ বুদ্ধিবীর্য্যসম্পন্ন রাজার সাধনবলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, সেইরূপ আবার দু'চার পুরুষের মধ্যেই একেবারে নষ্ট হইয়াও যায়। কিন্তু এতটা দ্রুতগতিতে নিয়মতন্ত্র-রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধিত হয় না। আর যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের উপরে আমাদের পরিবার-গুলি গড়িয়াছে, সেই অঙ্গাঙ্গী আদর্শের অনুযায়ী যদি কোনও বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে সে সাম্রাজ্য চিরকাল না হউক, অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজয়—এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়াই কি মোগলের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে ?

সম্পাদক—তাই নয় কি ? যারা মোগল-সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধন করেছে, তাদের কথাটা একবার একটু ভাবিয়া দেখ তো! পশ্চিমে শিখ-খালসার ও দক্ষিণে মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়, এই দুই কারণেই কি প্রধানতঃ মোগল-সাম্রাজ্য নষ্ট হয় নাই ? প্রথমে শিখেদের কথাটা ভাবিয়া দেখ। এরা একটা ধর্ম্মসঙ্ঘই গড়িতেছিলেন, রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মোগল-রাষ্ট্রশক্তি যখন তাঁদের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল, তখনই শিখেদের ধর্ম্মসঙ্ঘ, অসাধারণ ক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন খালসার আকার ধারণ করিতে লাগিল। মোগলের রাষ্ট্রতন্ত্রাধীনে এই নবীন ধর্ম্মসমাজের আত্ম-চরিতার্থতা-লাভ যদি অসম্ভব না হইত, তাহা হইলে শিখ-খালসার অভ্যুদয়ও হইত না, ইহা স্থির নিশ্চিত। মোগলের শাসনশক্তি ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করিতে যাইয়াই, শিখসঙ্ঘের সঙ্গে এই বিরোধ বাধাইয়া দেয়। আর এরূপভাবে অঙ্গবিশেষের সঙ্গে আপনাকে একান্তভাবে একাত্ম বা identify

করিতে যাইয়াই, মোগল প্রভুশক্তি আপনার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গী-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। অঙ্গীর মধ্যে তার প্রত্যেক অঙ্গই নিজ নিজ স্থানে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। সকল অঙ্গেরই যে সে অঙ্গী। সকলের সেবা দ্বারাই তার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। দেহী যদি চক্ষুকে বাড়াইবার জন্য কর্ণ বা রসনা বা ত্বক্‌কে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে, হাতকে আদর করিতে যাইয়া পায়ের যথেচ্ছা বিচরণের ক্ষমতা নাশ করে,—তাহা হইলে শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষা পায় না। অঙ্গীতে সকল অঙ্গই প্রতিষ্ঠিত, সকল অঙ্গের মধ্যে অঙ্গীই তাদের প্রাণ ও প্রেরণারূপে অদৃশ্য ও অলক্ষিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু সকলেতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই অঙ্গী, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, কোনও অঙ্গেতেই নাই, কারণ সে প্রত্যেক অঙ্গেরই অতীত হইয়া আছে। ইহাই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রাণ। গীতার এই দুটি শ্লোক মনে পড়ে কি?

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি, পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

"এই সমুদয় জগৎ আমার অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যাবতীয় ভূত সকল আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি স্বয়ং তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নই। আমার এই ঐশ্বরীয় যোগ দর্শন কর—আর এক দিক দিয়া দেখিলে এ ভূত সকলও আমার মধ্যে স্থিত নহে। অর্থাৎ তাহাদের বিশিষ্ট গুণাদি আমার অঙ্গীভূত হইয়া নাই। আমার আত্মাই ভূত সকলকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, অথচ আমি তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ নহি।" ভগবানের সঙ্গে এই জগতের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এখানে তিনি তারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। পরিবার বাস্তবিক কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ এবং বালক বালিকা নহে। পরিবার একটা তত্ত্ববিশেষ। তাহা পরিবারাস্থগণ সকলের মধ্যে আছে, এঁরা সকলে তাহার মধ্যে আছেন। এই পরিবারের কোনও নিজস্ব মূর্ত্তি নাই, থাকিলে পরিবারের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে ইহা থাকিতে পারিত না। যার নিজের কোনও বিশিষ্ট মূর্ত্তি নাই, সে-ই কেবল একই কালে, সমভাবে বহুবিধ বিশিষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে থাকিতে পারে। এই পরিবার-তত্ত্ব-বস্তু পরিবারের সকলকে ধারণ করিয়া আছে, সকলকে প্রতিপালন করিতেছে, অথচ সকলের অতীত হইয়াও আছে। এইভাবে পরিবার-বন্ধনকে যখন দেখি, তখনই তার প্রকৃত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কিন্তু অমূর্ত্ত হইলেও এই পরিবার-তত্ত্বকে বা পরিবার শক্তিকে কোনও একটা না একটা বিশেষ বিগ্রহ বা আধারকে আশ্রয় করিয়াই আপনার লক্ষ্য সাধন করিতে হয়। এই বিগ্রহ বা আধারই পরিবারের কর্ত্তা। এই কর্ত্তাকে পরিবারের জীবনে, পরিবারের অন্তর্গত সর্ব্ববিধ বিশিষ্ট সম্বন্ধের অতীত হইয়া থাকিতে হয়। পরিবারের যিনি কর্ত্তা, তিনি তাঁর নিজের স্ত্রী বা পুত্র বা কন্যা বা অপর কাহারও সঙ্গে, পরিবারের কর্ত্তা বা প্রতিভূ-রূপে, কোন বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারেন না। তিনি যে চক্ষে পরিবারের অন্তর্গত অপর সকলকে দেখিবেন, সেই চক্ষে

আপনার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিকেও দেখিবেন। এদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের স্বাভাবিক বিশেষত্ব থাকিবে, কিন্তু সমষ্টিগত পারিবারিক জীবনের ও শক্তির আধার ও বিগ্রহরূপে কারো সঙ্গে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইবে না। যতদিন এইটী হয়, ততদিনই কেবল পরিবারের সত্য অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধটী বিদ্যমান থাকে। আর ততদিনই পরিবারের মধ্যে সত্য একত্বও বিরাজ করে। আর ততদিন পরিবারের ভিতরকার লোকের ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বার্থের প্রতিযোগিতায় বা বাদ-বিসম্বাদে, সমষ্টিগত পারিবারিক জীবনের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় না।

বিজয়—মোগলেরা যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে ও এই সকল অংশের সমষ্টিগত যে সাম্রাজ্য তার সঙ্গে একটা সত্য ও ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ গড়িয়া তোলেন নাই,—আপনি এই কথাই তবে বল্‌তে চান্। আর এই জন্যই মোগলের সাম্রাজ্য স্থায়ী হলো না।

সম্পাদক—তাই কি সত্য নয়? এই শিখেদের কথাই আর একটু ভাবিয়া দেখ। মোগল-সম্রাট সমগ্রভারতরাষ্ট্রের প্রতিভূরূপেই বাস্তবিক তার প্রভু হইয়াছিলেন। এখানে পরিবার-গঠনের বা Family-constitutionএর সঙ্গে সাম্রাজ্যগঠন বা Empire-constitutionএর সাদৃশ্যটা একবার মনে কর। পরিবারের কর্ত্তা পরিবারান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতিভূরূপেই কি প্রকৃতপক্ষে পরিবারের প্রভু হন না? সেইরূপ সম্রাটও সাম্রাজ্যান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশ, জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিভূরূপেই বাস্তবিক সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। প্রজাতন্ত্ররাজ্যে যে ভাবে প্রজাসাধারণে মিলিয়া, বিচার-আলোচনা করিয়া, প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করে, সে ভাবে নির্ব্বাচিত না হইলেও, প্রত্যেক রাজাই প্রকৃত পক্ষে তাঁর রাজ্যের ও প্রত্যেক সম্রাটই তাঁর কর্ত্তৃত্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিভূস্বরূপেই তাহাদের শাসন-সংরক্ষণ করেন। পরিবারের কর্ত্তাকেও কোথাও পরিবারভুক্ত লোকেরা হাত তুলিয়া বা ভোট দিয়া কর্ত্তা করে না। তিনি স্বাভাবিক প্রণালীতেই এ পদ পাইয়া থাকেন। কিন্তু নির্ব্বাচিত হন নাই বলিয়া তিনি যে ইহাদের প্রতিভূ, এ কথাটা অপ্রমাণ হয় না। রাজা বা সম্রাট সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। অতএব মোগল সম্রাট সমগ্র ও সমষ্টিভূত যে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য তার শক্তি ও শাসন-অধিকারের প্রতিনিধি ও বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, এ কথা বলা অসঙ্গত নহে। এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যে বা ভারতসমাজে হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম-সমাজ ছিল। এ সকল এই বিরাট সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও অঙ্গ। অথচ শিখেরা যখন আপনাদের নূতন ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল, তখন মোগল সম্রাট তদানীন্তন মুসলমান-সমাজের সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করিয়া, শিখ-মুসলমানের পরস্পরের প্রতিযোগিতায়, স্বয়ং অঙ্গীর ও অংশীর প্রতিনিধি হইয়াও, একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ও অংশের সঙ্গে মিলিয়া অপর অঙ্গ বা অংশকে নিপীড়িত করিতে গেলেন। এরূপ করিয়া কি মোগলেরা সাম্রাজ্যের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা না হইলে তাহার স্থায়িত্ব

সম্ভব হয় না, সেই অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধের সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়া দেন নাই? ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা মোগল ছিলেন, মুসলমান ছিলেন, তাতে কিছু আসিয়া যায় নাই। মানুষমাত্রেই কোনও না কোনও সমাজ ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করে। ব্যক্তিগত ভাবে সকল মানুষকেই কতকগুলি বিশিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্ব আর রাজপদ এক হইতে পারে না। মানুষ জন্মে ও মরে। রাজাও তো মানুষ, সুতরাং তারও জন্ম মৃত্যু আছে। কিন্তু রাজ-পদের লোপ হয় না; রাজসিংহাসন নিমেষকালও শূন্য থাকে না। সমাজের সমষ্টিগত শক্তি ও অধিকার যে কেন্দ্রে যখন প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয়, তাহাই রাজপদ, সিংহাসন সেই প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশেরই চিহ্ন। সুতরাং সমাজ যেখানে রাজপদও সেখানে। শাসন যেখানে সিংহাসনও সেখানে থাকিবেই থাকিবে। তাহাকে Throne না বলিয়া Presidential Chair বলিতে পার; কিন্তু বিভিন্ন নামেতে বস্তুর বস্তুত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয় না। আর সিংহাসন সমাজের একটা নিত্য তত্ত্ব বলিয়া, এক ব্যক্তি যায়, আর এক ব্যক্তি সে সিংহাসনে আসিয়া বসে, কিন্তু মুহূর্ত্তকালও সে আসন শূন্য থাকে না। জলোকা যেমন এক আশ্রয় ছাড়িবার পূর্ব্বে আশ্রয়ান্তর অবলম্বন করে, সেইরূপ রাজপদ বা রাজশক্তিও এক ব্যক্তিকে ছাড়িতে না ছাড়িতে আর এক ব্যক্তিতে যাইয়া অব্যবহিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই অর্থ— The king is dead, long live the king! আর রাজপদ বা রাজশক্তি সময়ে সময়ে যে সকল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তাদের অপেক্ষা বড় ও সর্ব্বদাই তাদের ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত থাকে বলিয়া, রাজারূপে, রাজপদসম্পর্কে, কোনও রাজার নিজের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সকলের প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। ব্যক্তিরূপে, ব্যক্তিগতভাবে, দিল্লীশ্বর মোগল বা মুসলমান হইলেও, সম্রাটরূপে প্রকৃতপক্ষে মোগলও ছিলেন না, মুসলমানও ছিলেন না। সে চক্ষে তাঁহাকে দেখিলে হিন্দু কখনও "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা" বলিয়া অভিবাদন করিত না। কিন্তু শিখেরা যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন মোগল-সম্রাট এ কথাটা ভুলিয়া গেলেন। তাই অঙ্গে অঙ্গে বিরোধ বাধিলে, অঙ্গীর প্রতিভূ হইয়াও তিনি অঙ্গবিশেষের সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করিয়া, সাম্রাজ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিলেন। এইখানেই তাঁর সম্রাটত্ব, অঙ্গিত্ব নষ্ট হইয়া গেল। আর এই কারণেই দিল্লীর সম্রাটশক্তির সঙ্গে শিখের খালসা-শক্তি একাত্মতা অনুভব করিতে পারিল না, প্রত্যুত ইহাকে আপনার প্রতিবাদী বলিয়াই গ্রহণ করিল। আর ক্রমে যখন দিল্লীর শাসনশক্তি শিথিল হইয়া পড়িল, তখন শিখ-খালসা আপনার ক্ষাত্রবীর্য্যের দ্বারা তাহাকে প্রতিহত ও বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র-সমাজও দিল্লীর সঙ্গে আপনার একাত্মতা-সাধনের কোনও অবসর পায় নাই। সুতরাং সময় পাইয়া তারাও দক্ষিণভারতে দিল্লীর অধিকার লোপ করিতে লাগিল। মোগলেরা পররাষ্ট্র দখল করিয়াই আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল পররাষ্ট্রবাসীকে কোনও ঘনিষ্ঠ, সজীব ও স্থায়ী অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধের ভিতর

দিয়া পরস্পরের সঙ্গে ও আপনার সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধিয়া তুলিতে পারেন নাই। সুতরাং দিল্লীর শাসনকেন্দ্র যখন শক্তিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন এই গাঁথুনিহীন সাম্রাজ্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কথাটা পরিষ্কার করিতে পারিলাম কি?

বিজয়—একটা কথা এখনও খুব পরিষ্কার হয়নি। পরিবারগঠন ও সাম্রাজ্যগঠন যে একই আদর্শের হতে পারে, এটা ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। পরিবারের বন্ধন স্নেহ প্রীতির বন্ধন, পরিবারের পরস্পরের মধ্যে একটা সহজ রক্তের টান আছে। সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তো এটা নাই; এর সৃষ্টি করাও তো সম্ভব নয়।

সম্পাদক—কিন্তু রক্তের টানের চাইতে স্বার্থের টান কি বেশী নয়? অনেক সময় তো স্বার্থের আঘাতে অতি ঘনিষ্ঠ রক্তের টান ছিঁড়িয়া যায়। এক ভাই চাকুরীতে ও আর এক ভাই বেকার হইলে রক্তের টান তো তাদেরে অনেক সময় এক করে রাখিতে পারে না। রক্তের জোর যখন স্বার্থের শক্তির সঙ্গে এক হয়, সেইখানেই কেবল পরিবারের বাঁধন টিঁকিয়া থাকে। আমাদের পুরাতন একান্নবর্ত্তী পরিবারে রক্তের একতার সঙ্গে অন্নের একতা, স্নেহের বাঁধনের সঙ্গে সাংসারিক স্বার্থের ও সুখ-সুবিধার বাঁধন জুড়িয়া গিয়াছিল, তাতেই বহুগোষ্ঠি মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিতাম। ফলতঃ co-operative labour-system বা পারিবারিক শ্রমসমবায়-প্রথাই একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিত্তি—পারিবারিক রক্তের ও স্নেহের সম্বন্ধ নয়। যেখানে জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য এই শ্রমসমবায় বা co-operative labour নিষ্প্রয়োজন বা অসম্ভব হইয়া যায়, সেইখানেই দেখ একান্নবর্ত্তী পরিবারও আর থাকে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত চাকুরীয়া-সমাজে এ প্রথা একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। আর সমাজের নিম্নতর স্তরেও যেখানে পূর্ব্বে কৃষক বা তন্তুবায় প্রভৃতি পরিবারের সকলে মিলিয়া চষবাস করিত বা তাঁত বুনিত, সেখানেও এখন যে কেহই একটু সামান্য অক্ষরজ্ঞান লাভ করিয়া আদালতে বা ডাকঘরে চাকুরী পাইতেছে, সেই আপনার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে পরিবার-গঠনের মূলে কেবল রক্তের টান বা সহজ স্নেহ প্রীতি প্রভৃতিই যে আছে, তা নয়—সাংসারিক স্বার্থই এখানে প্রধান বন্ধন।

বিজয়—স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি দেবভাবগুলি যদি এইরূপে স্বার্থ-প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে, এ সকলের দেবত্ব ও মহত্ত্ব থাকে কৈ?

সম্পাদক—স্বার্থটাকেই এমন হীন চক্ষে দেখিতেছ কেন, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা আর উদার স্বার্থ এক বস্তু নয়। ফলতঃ এই স্বার্থ-বস্তুটাই বা কি? 'স্ব'এর অর্থ ই স্বার্থ। আর স্ব বস্তুকে অতি ছোট বলিয়াও ভাবিতে পার, অতি বড়, বিশাল এবং বিশ্বব্যাপক ভাবেও দেখিতে পার না কি? এই 'স্ব'কে যখন কেবল নিজের দেহেতে ও দেহের সুখস্বচ্ছন্দতাতেই আবদ্ধ করিয়া রাখ, তখন স্বার্থ-বস্তুটা অতি ছোট, অতি সংকীর্ণ, অতি হীন ও হেয় হয়। আপনার 'স্ব'কে যদি এইভাবে দেখ, তাহা হইলে নিজের সুখটাই দুনিয়ার আর সকলের

সুখ অপেক্ষা বড় হয়। তখন স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলেই 'স্ব'এর বাহিরে পড়িয়া পর হইয়া যায়। কিন্তু আবার যখন এই 'স্ব'এর ভিতরে স্ত্রীপুত্রাদিকে টানিয়া আন, তখন তোমার 'স্ব'টা তাদের 'স্ব'কে আশ্রয় করিয়া, তোমার সুখ তাদের সুখের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কত বড় হয়, আবার তোমার দুঃখটাও তাদের দুঃখের সঙ্গে মিলিয়া একদিকে কত গুরু ও অন্যদিকে কত মহৎ ও পুণ্যময় হইয়া উঠে, ভেবে দেখ তো। এইরূপে এই 'স্ব'কে তুমি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পার। ক্রমে ক্রমে তখন তোমার এমন অবস্থা হইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্ব তোমার এই 'স্ব'তে মিশিয়া গেলে, তোমার এই অতি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ 'স্ব'টাকেই বিশ্বের 'স্ব' করিয়া তুলিবে। তোমার নিজের স্বার্থ আর বিশ্বের স্বার্থ তখন এক হইয়া যাইবে। বিশ্বের সুখ তখন তোমার সুখ, বিশ্বের দুঃখ তখন তোমার দুঃখ; তোমার অনুভূতি তখন বিশ্বানুভূতিতে, তোমার বাসনা তখন বিশ্ব-বাসনায় পরিণত হইবে। তখন স্বার্থই পরার্থ হইয়া পড়িবে, পরার্থই স্বার্থ হইয়া যাইবে। ইহাই প্রকৃত নির্ব্বাণ-মুক্তি। জগতের মহাজনেরা আপন আপন 'স্ব'কে বিনাশ করিয়া নহে, বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত করিয়াই কঠোর সাধন-বলে আপন আপন সুখদুঃখানুভূতিকে জগতের সুখদুঃখানুভূতির সঙ্গে একান্ত-ভাবে মিশাইয়া, আপনাদিগকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়াই এই মহা-পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।

বিজয়—আপনি নির্ব্বাণের একটা নূতন অর্থ কচ্ছেন না কি?

সম্পাদক—না। সাধুমুখে এই সনাতন অর্থই শুনিয়াছি। আর বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির জীবনে এই বস্তুই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মানব সমাজ যে এই পথেই বিকশিত হইয়া চলিয়াছে, তাই কি অস্বীকার করিতে পার? পরিবার বন্ধন আমাদের ক্ষুদ্র 'স্ব'কে পরিবারের আর দশজনের 'স্ব'এর সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া, নিজের ভোগ বিলাস ও সুখদুঃখ অপেক্ষা তাদের সেবা ও পরিচর্য্যা ও তাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সাধনকে অধিকতর প্রার্থনীয় করিয়া তোলে না কি? আর এই পরিবার-গঠন একের স্বার্থকে দশের স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া, একটা বৃহত্তর স্বার্থের সৃষ্টি করিতেছে। তার পর, সমাজের কথা। সমাজ পরিবার অপেক্ষা বড়। আর সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের স্বার্থকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াই কি আত্মপ্রতিষ্ঠা করে না? সমাজের পরে রাজ্য বা রাষ্ট্র। এখানেও এই বিকাশটাই আরো স্ফুটতর হইয়া উঠে। রাজ্যের বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সমাজের স্বার্থের সমীকরণের দ্বারাই রাজ্যের একত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজ্যের আশ্রয় ব্যতীত সমাজ থাকে না, সমাজের আশ্রয় ব্যতীত পরিবার থাকে না, পরিবারের আশ্রয় ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা পায় না। এইজন্যই এ সকলের মধ্যে একটা নিগূঢ়, ঘনিষ্ঠ, পরস্পরা-পেক্ষী অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। এ যোগ কতকটা সংস্কারের আর অনেকটা কেবল স্বার্থের। স্বার্থের বন্ধন সংস্কারের বন্ধনকে দৃঢ় করে। সংস্কার-বন্ধন স্বার্থের বন্ধনকে সরস ও পবিত্র করে। স্বার্থের প্রেরণা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। সংস্কারের শক্তি-সঞ্চারে সে কর্ম্ম ধর্ম্ম হইয়া উঠে।

বিজয়—এখানে আপনি যাকে সংস্কার বলিতেছেন ভাল করে ধর্ত্তে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—আমরা এক রক্তে জন্মিয়াছি, একই পূর্ব্বপুরুষের বংশধর, এই যে অভিমান, ইহা একটা সংস্কার নয় কি? তার পর, আমরা এক গোত্রের, এক জাতের বা শাসনের লোক এও একটা সংস্কার। আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও পুরাতন ইতিহাস এক আমরা একই সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী, সুতরাং জগতের অন্য সভ্যতা ও সাধনার লোক হইতে পৃথক্, এটাও একটা সংস্কার। এই সকল সংস্কারই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকে সনাতন সমাজধারার সঙ্গে মিলাইয়া, একটা বিশ্বসমাজের প্রতিষ্ঠা করে। এই সকল সংস্কারই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে। এই সকল সংস্কারের আশ্রয়েই আমাদের idealism ফুটিয়া উঠে, আর প্রত্যক্ষ স্বার্থের প্রেরণায় আমাদের activityর প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, স্বার্থের প্রেরণা হইতে কর্ম্মের, আর সংস্কারের প্রভাব হইতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। তার সাংসারিক সম্বন্ধের বেষ্টনীটাকে বাড়াইয়া দিয়া, মানুষের স্বার্থটাকে যত বড় করিবে অর্থাৎ যত বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত করিবে, সেই পরিমাণে তার ধর্ম্মও উদার এবং উন্নত হইয়া উঠিবে। মানুষের এই স্বার্থটাকে এরূপভাবে নূতন নূতন সম্বন্ধের ভিতর দিয়া বাড়াইয়া তোলাই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের বা historic evolutionএর নিত্য লক্ষ্য। এইভাবেই মানব-সমাজ ফুটিয়া উঠিতেছে। এইভাবে পরিবার, গোষ্ঠি, গোত্র, সমাজ, রাজ্য বা রাষ্ট্র, এবং সাম্রাজ্য—এই সূত্র ধরিয়া মানব সমাজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই রাষ্ট্র সম্বন্ধ অপেক্ষা সাম্রাজ্য সম্বন্ধ, nationalism অপেক্ষা imperialism শ্রেষ্ঠতর আদর্শ।

বিজয়—আপনি দেখ্ছি সব উলট্‌পালট্ করিয়া দিতেছেন। Nationalismকেই আমরা এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় জীবনের চরম ও চূড়ান্ত আদর্শ ও প্রতিষ্ঠা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। এই ন্যাশন্যালিজমের চাইতে যে বড় কোনও কিছু আছে, ইহা তো মনে হয় না।

সম্পাদক—মানবেতিহাসের বিবর্ত্তনধারাকে ধরিয়া একবার চল দেখি সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। মানুষ কোনও দিন যে, কোনও জাতীয় পশুর মতন একান্ত একাকী হইয়া বাস করিত, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। হাতী প্রভৃতি কতকগুলি পশু আছে, যারা যূথবদ্ধ হইয়া বাস করে। মানুষের খবর যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাতে মানুষ সর্ব্বদাই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত, ইহা সপ্রমাণ হয়। সমাজ ছাড়া মানুষ, সৃষ্টি-ছাড়া কথা। আর সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে যাইয়াই মানুষ সে সমাজের ভিতরে আপন আপন পরিবারবদ্ধ হইয়াই বাস করিত। অতএব মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের মূলে পরিবারগঠনটীকে দেখিতে পাই। ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থকে পরিবারের সমষ্টিগত বৃহত্তর সুখ ও স্বার্থের মধ্যে মিলাইয়াই পারিবারিক জীবনের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

অনেকগুলি ব্যক্তিকে লইয়া পরিবার।
|
অনেকগুলি পরিবারকে লইয়া সমাজ।
|
অনেকগুলি সমাজকে লইয়া জাতি।
|
অনেক জাতিকে লইয়া নেশন বা রাষ্ট্র।
|
অনেক নেশন বা রাষ্ট্রকে লইয়া সাম্রাজ্য।

এক ধাপের পর যেমন আর এক ধাপ, এমনি করিয়া জন-সমাজ আদিম পারিবারিক সম্বন্ধকে বাড়াইয়াই ক্রমশঃ নেশন বা রাষ্ট্রের বিশালতর ও জটিলতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখানেই এই বিবর্ত্তনগতি বন্ধ হইয়া যায় নাই। নেশন সম্বন্ধকে বাড়াইয়া বহু নেশনের সমাবেশে সাম্রাজ্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ব্যক্তিগত জীবনের শিক্ষা ও সাধনা অপেক্ষা যদি পারিবারিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনাকে মহত্তর ও উন্নততর বল, পারিবারিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনা অপেক্ষা সামাজিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনা যদি বৃহত্তর ও উচ্চতর হয়, আর সামাজিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনা অপেক্ষা বিশালতর ও জটিলতর নেশনাল-সম্বন্ধের শিক্ষা ও সাধনা যদি মনুষ্যত্ববিকাশের সমধিক উপযোগী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে, এই নেশনাল সম্বন্ধ অপেক্ষা সাম্রাজ্য-সম্বন্ধ যে এই মনুষ্যত্বকে আরো বাড়াইয়া তুলিবে, ইহা অস্বীকার করিতে পার কি? এইরূপে এই বিবর্ত্তন-ধারাকে আশ্রয় করিয়াই কি আমাদের ক্ষুদ্র সুখস্বার্থ উত্তরোত্তর ব্যাপকতর ও বিশুদ্ধতর হইয়া উঠে নাই? এই ভাবেই কি আমরা আমাদের বিশ্বমানবতা উপলব্ধি করিতেছি না? "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" —ইহাই যদি আমাদের সকল কর্ম্মের চরম প্রেরণা হয়, তাহা হইলে নেশনের জীবনে যে কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, সাম্রাজ্যের জীবনে তদপেক্ষা বিশালতর ও ব্যাপকতর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া, আমাদিগকে এই বিশ্বজনীন সাধনার পথে আরো অগ্রসর করিয়া দেয় না কি? নেশনকেই যদি চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া ধর, তবে আর একজন তার সমাজ বা communityকেই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিবে না কেন, আর এইভাবে শেষে ব্যক্তিগত স্বার্থটাই চূড়ান্ত ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায় না কি?

বিজয়—কিন্তু সেটা যে আত্মঘাতী কথা। আমার পরিবারের আশ্রয় ব্যতীত আমার নিজের সুখস্বার্থ-সাধনও ঠিক সম্ভব হয় না।

সম্পাদক—ঠিক সেইরূপ সমাজের আশ্রয় ব্যতীত পারিবারিক জীবনের, নেশনের আশ্রয় ব্যতীত সামাজিক বা communal জীবনেরও সত্য স্বার্থসাধন অসম্ভব নয় কি? আর এই ভাবেই যদি দেখ, তাহা হইলে সাম্রাজ্য-সম্বন্ধকে উপেক্ষা বা নষ্ট করিয়া নেশনাল (national) স্বার্থই কি সম্যক্‌রূপে সাধন করা সম্ভব হয়? এ জগতে যে যে পরিমাণে আপনাকে বৃহত্তর স্বার্থ-সম্বন্ধেতে আবদ্ধ করিতে পারে, সে-ই তত বড় তত শক্তিশালী হয় ও সেই পরিমাণে আপনার প্রকৃত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। আর যে যত ছোট হইয়া পড়িয়া থাকে, সে-ই তত হীনবল হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্ফলতা আহরণ করিতে থাকে। আমাদের আধুনিক জাতীয়তা বা নেশনালিজম্ অতি উচ্চ, অতি মহৎ, অতি মহার্ঘ বস্তু। কিন্তু ইহাও চরম বস্তু নহে। জাতীয়তাতে বা নেশনালিজমেই

সামাজিক বিবর্ত্তন চরম-সোপানে যাইয়া দাঁড়ায় না। এখানেও "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" এই মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ হয় না। ইহার উপরে সাম্রাজ্যতা বা Imperialism অথবা Internationalism বা অন্তর্জাতীয়তা, এই ভাবেই মানুষ ক্রমে বিশ্বাত্মৈকত্ব সাধন করিবে।

বিজয়—কিন্তু বিশ্বকে পাবার আগে তো আমায় আমার নিজেকে পাইতে হবে

সম্পাদক—তা তো বটেই। কিন্তু এই বিশ্বের সঙ্গে তোমার 'স্ব'এর বা নিজের এরূপ একটা বিরোধই কল্পনা কর কেন? মোহ-বশে মানুষ একপ বিরোধের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এ বিরোধ যতক্ষণ না নষ্ট হয়, ততক্ষণ সে তার নিজেকেও তো পায় না। আর এই বিরোধ নষ্ট করাই সমাজ-বিবর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবারের বৃহত্তর জীবনে ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থের বিরোধ ভঞ্জন হইয়া থাকে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ক্ষুদ্র ও বিশিষ্ট সুখস্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামঞ্জস্য করিয়াই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বা communityর স্বত্বস্বার্থের প্রতিযোগিতা ও বিরোধের মীমাংসা করিতে যাইয়াই, জাতির বা নেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যক্তিগত সুখস্বার্থের বিরোধ ভঞ্জন না করিতে পারিলে, পারিবারিক বন্ধন টিঁকে না। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের পারিবারিক স্বত্বস্বার্থের বিরোধ ভঞ্জন না করিতে পারিলে, সমাজ টিঁকে না। আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বা communityর পরস্পরের স্বত্বস্বার্থের বিরোধ না মিটাইতে পারিলে, জাতি বা নেশন গড়ে না, গড়িতে আরম্ভ করিলেও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ বিরোধ ভঞ্জন ও প্রতিযোগী স্বত্বস্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই সামাজিক উন্নতি ও বিবর্ত্তন সাধিত হয়। এ বিরোধটা আমাদের কল্পিত—মায়ার সৃষ্টি,—আমরা যে স্বতন্ত্র ও পরিচ্ছিন্ন এই ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়। আর এই মায়িক পরিচ্ছিন্নতা-বোধ নষ্ট করিবার জন্যই সমাজ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পরিবারের ভিতরে আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিয়া থাকি। সমাজের বৃহত্তর জীবনে সেইরূপ পারিবারিক জীবনের পরিচ্ছিন্নতা-বোধ নষ্ট করিতে থাকি। জাতীয় জীবনের বা national lifeএর বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে সামাজিক বা communal জীবনের ক্ষুদ্রতা ও পরিচ্ছিন্নতা নষ্ট হইয়া থাকে। এই ভাবেই ক্ষুদ্র স্বার্থ ও শক্তি বৃহত্তর স্বার্থ ও শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আপনাকে বাড়াইয়া তোলে। একাকিত্বের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ক্ষুদ্রতা কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আর যে কারণে পরিবার ব্যক্তি অপেক্ষা বড়, সমাজ পরিবার অপেক্ষা বড়, জাতি বা নেশন সমাজ বা community অপেক্ষা বড়, সেইরূপ বহু জাতির সম্মিলনে ও সমবায়ে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাও জাতি বা নেশন অপেক্ষা বড়। ব্যক্তিকে পরিবারের আশ্রয়ে, পরিবারকে সমাজের আশ্রয়ে, সমাজকে জাতির বা নেশনের আশ্রয়ে, সেইরূপ নেশন বা জাতিকেও সাম্রাজ্যের বা Empireএর আশ্রয়েই আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে হয়। ইহার আর অন্য পথ নাই। এই নিগূঢ় সমাজ-তত্ত্বটী লাট হার্ডিঞ্জ খুবই আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই তিনি ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের স্ফূর্ত্তির

সঙ্গে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা স্থায়ী ও সমীচিন সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এতটা চেষ্টা করিতেছেন। এই কথাটা না বুঝিলে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন তার প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বোঝা অসম্ভব হইবে। এটী না বুঝিলে আমাদেরও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কঠিন হইবে। কিন্তু কথাটা অতি বড ও জটিল। অবকাশ মত আর একদিন এর আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীঃ—

বৈদিক সাধনার আভাস

জ্ঞানক্ষেত্রে সাধনার কথা বলিতে গিয়া ঋষি মনের কথা বলিয়াছেন। "চক্ষুষ্মান্ কর্ণবান্ সমজ্ঞানিগণ মনদ্বারা গন্তব্য বিষয় সকলে অতুলনীয় হন।" (পূর্ব্বোক্ত ১০।৭১।৭)। অর্থাৎ মহদ্‌ব্যক্তিগণ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সকল মনদ্বারা বিচার করিয়া তাহাতে সমজ্ঞান লাভ করেন। দর্শনশাস্ত্র এই কথাই বলিয়াছেন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের উপায়। আচার্য্য শঙ্কর সর্ব্ব-বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শ্রবণান্মননাদ্ধ্যানাৎ তাৎপর্য্যেণ নিরন্তরম্।
বুদ্ধেঃ সূক্ষ্মত্বমায়াতি ততোবস্তূপলভ্যতে ॥

"নিরন্তর তৎপর হইয়া শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিলে বুদ্ধির সূক্ষ্মত্ব আসে ও তাহা হইতে সদ্‌বস্তুর উপলব্ধি হয়।" মানসক্ষেত্রে সাধনা দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় ও জ্ঞান-ক্ষেত্রে জীব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। সাধক মনোময় কোষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তবে বিজ্ঞানময় কোষে জাগরিত হইতে পারেন। মনই জীবকে বিশ্বময় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। মনই তাহাকে প্রপঞ্চের মোহে ফেলিয়া, সংসারে আবদ্ধ করে, আবার মনই তাহাকে এই বন্ধন কাটিয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করাইতে পারে। বস্তুতঃ এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি অথবা মন হইতেই সৃষ্ট। মানসিক সংস্কারই জগতের কারণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সৃষ্টি-সূক্তের ব্যাখ্যায় এ কথা বিশদ্‌ভাবে বলা হইয়াছে। এই সূক্তে ঋষি বলিয়াছেন, প্রলয়কালে জগৎ মনের সম্বন্ধী বীজরূপে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন ছিল। সৃষ্টিকালে এই বীজই বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া পত্র, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড প্রভৃতিতে বিস্তৃত হয়। মন কামনা দ্বারা জীবকে এই বৃক্ষে বাস করায় ও ইহার কটু দুঃখময় ফলসকলকে তাহার সম্মুখে সুমিষ্ট উপাদেয় বলিয়া স্থাপন করে। এইরূপে বিভ্রান্ত হইয়া জীব কিছুকাল অন্ধের ন্যায় সংসারবৃক্ষে ঘুরিতে থাকে। কিন্তু তাহার ভিতর যে ব্রহ্ম-চৈতন্য সৎপদার্থ বিদ্যমান, তাহা তাহাকে চিরকাল এরূপ ভাবে থাকিতে দেয় না। অসৎ কখনও নিত্য হয় না, সুতরাং জীবের জগদ্‌ভ্রমও স্থায়ী হয় না। সংসারবৃক্ষের বিষময় ফলভোগে তাহার বিষম ভবরোগ কাটিতে থাকে। বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া সে যখন

সংসারকে দুঃখময় বলিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, তখন সে এই জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সংসার-বৃক্ষের ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন যে মন তাহাকে পাপকর্ম্ম-বশে সংসার-বৃক্ষে আবদ্ধ করিয়াছে সেই মনই আবার তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম-বশে এই বৃক্ষ হইতে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। মুক্তির জন্য জীবের মানস-ক্ষেত্রে এই সাধনাকে মনোময়কোষের সাধনা বলে। এই সাধনা দ্বারা জীবের নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক জন্মে, সংসারবিরক্তি পূর্ণতা লাভ করে, সত্বগুণ সম্যক্ বিকশিত হয়, বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে প্রবেশ সাধিত হয় ও ক্রমে সমগ্র মায়াপাশ ছেদন করিবার শক্তি উন্মেষিত হয়। মনই যে সংসার-বন্ধনের হেতু এবং মন দ্বারাই যে সংসার-বন্ধন সাধিত হয় তাহা বৈদিক ঋষি উপাখ্যানছলে অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন। পুরাকালে অসমাতি নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন এবং এই রাজার বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু নামে চারি ভ্রাতা পুরোহিত ছিলেন। একদা রাজা ইঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া মায়াবী দুই ঋষিকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। ইহাতে বন্ধু প্রভৃতি চারি ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভিচার-ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করেন। মায়াবী পুরোহিত-দ্বয় ইহা জানিতে পারিয়া সুবন্ধুকে বধ করেন। তখন সুবন্ধুর ভ্রাতা বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু তাঁহার পুনর্জীবনলাভের জন্য নিম্নলিখিত সূক্ত বা স্তোত্র পাঠ করেন। এই সূক্তে ঋষিত্রয় মনকে সুবন্ধুর মৃতদেহে পুনরায় আগমন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন যাহাতে তিনি পুনরায় জীবিত হইতে পারেন। সূক্ত, যথাঃ—

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১।
যত্তে দিবং যৎ পৃথিবীং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥২।
যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৩।
যত্তে চতস্রঃ প্রদিশো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৪।
যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৫।
যত্তে মরীচিঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৬।
যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৭।
যত্তে সূর্যং যত্নুষসং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৮।
যত্তে পর্বতান্বৃহতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৯।
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১০।
যত্তে পরাঃ পরাবতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১১।
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১২।

ঋঃ সঃ—১০।৫৮

অনুবাদ ও তাৎপর্য্য :—

১। (হে মৃত সুবন্ধু) তোমার যে মন বৈবস্বত যমের নিকট দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘ জীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

২। তোমার যে মন দ্যুলোকে এবং যাহা পৃথিবীতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা

তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৩। তোমার যে মন চতুর্দ্দিকে সীমাবিশিষ্ট ভূমিতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৪। তোমার যে মন চারি মহাদিকে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৫। তোমার যে মন জলপূর্ণ সমুদ্রে বা মেঘে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৬। তোমার যে মন গতিশীল দীপ্তি সকলে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৭। তোমার যে মন আপে ও যাহা ওষধি সকলে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৮। তোমার যে মন সূর্য্যে ও যাহা উষার নিকটে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৯। তোমার যে মন বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

১০। তোমার যে মন এই বিশ্বজগতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

১১। তোমার যে মন পরস্ব পরাবৎসকলে, অর্থাৎ অত্যন্ত দূরদেশসকলে, যে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

১২। তোমার যে মন ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ সকলেও দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি। (বর্ত্তমান পদার্থ সকলের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্‌সকলে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ সকলেও" এই বাক্য দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমগ্র প্রপঞ্চ বুঝাইতেছে।)

এই সূক্ত দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্থূলদেহের অবসানেই জীবের মনের সহিত সম্বন্ধ ঘুচে না। জীব স্থূলদেহ নাশের পর মনকে সঙ্গে লইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। মন জীবের সহিত "বৈবস্বত যমের নিকটে দূরে, অর্থাৎ স্থূলদেহ ছাড়িয়া, গমন করে"—১ম ঋকে এইরূপ স্পষ্ট করিয়া মনের পারলৌকিকত্ব বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক ঋকেই মনকে "ইহলোকে ফিরাইয়া আনি" এই বাক্য দ্বারা মৃত্যুর পর মনের অস্তিত্ব ও পরলোকে অবস্থান বারংবার অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন যে স্থূলদেহের অন্তর্গত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের স্পন্দনই মানসিক ক্রিয়া, সুতরাং স্থূলদেহ নষ্ট হইলেই মানসিক ক্রিয়া বা মন নামে পরিচিত পদার্থ লোপ পায়, অর্থাৎ যাঁহারা স্থূলদেহাবসানের পর অন্য দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, বেদ তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে পুনঃপুনঃ বলিতেছেন, তোমরা ভ্রান্ত, স্থূলদেহাবসানের পর মন যমালয়ে পরলোকে

গমন করে ও প্রয়োজন হইলে পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়া আইসে। অতঃপর বিবেচ্য, মন স্থূলদেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া কি করে। "মনঃ সংকল্পকঃ" (সাংখ্যকারিকা—২৭), অর্থাৎ মন সংকল্পক, মনের ধর্ম্ম সংকল্প করা। বাচস্পতি মিশ্র ইহার স্ফুটতর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আলোকিতমিন্দ্রিয়েণ বস্তিদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক কল্পয়ন্তি, বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবেন বিবেচয়তি," অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রথমে বস্তুর অস্তিত্বমাত্র 'ইহা আছে', এইরূপে সম্মুগ্ধভাবে আলোচিত বা প্রত্যক্ষিত হয়, পরে মন 'ইহা এইরূপ, ইহা এইরূপ নহে' এই ভাবে সম্যকরূপে উহার কল্পনা করে, বিশেষণ বিশেষ্যভাবে বিবেচনা করে। দৃষ্টিপথে যদি একটি ঘট পড়ে, চক্ষু তাহার রূপটি মাত্র গ্রহণ করিয়া মনের নিকট পঁহুছিয়া দেয়, মন তখন পূর্ব্ব দৃষ্ট ঘটের সহিত ঐ রূপের সাদৃশ্য ও ঘট-ব্যতিরিক্ত পদার্থের সহিত উহার অসাদৃশ্য বিচার করিয়া উহাতে ঘটত্বরূপ বিশেষণ ও ঘটরূপ বিশেষ্য আরোপ করিয়া ঘট বলিয়া উহাকে গ্রহণ করে। সুতরাং বস্তুতঃ মনই ঘট দেখে, চক্ষু মাত্র ঘটের আকৃতিটা মনের সম্মুখে পঁহুছিয়া দিয়া তাহার সাহায্য করে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে ইন্দ্রিয়-পদার্থটি কি। যে সকল করণের সাহায্যে আত্মার বা জীবের বিষয়ভোগ হয় তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে বিষয় বলে। সুতরাং যে সকল করণের সাহায্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অনুভূতি হয় তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও আকাশের ধর্ম্ম। সুতরাং যে সকল করণ আত্মার বা জীবের সহিত অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয় তাহারা ইন্দ্রিয়। মন সংকল্প দ্বারা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের দর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ, স্পর্শন ও শ্রবণরূপ আলোচনা দ্বারা ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বচন, গ্রহণ, ভ্রমণ, পুরীষত্যাগ ও শৃঙ্গার দ্বারা আত্মার সহিত অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া দেয়। এইজন্য মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় নামে আখ্যাত। মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ—জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করে মন তাহার বিচার করে এবং মনের যাহার বিচার করিবার প্রয়োজন হয় জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মনের নিকটে আনিয়া দেয়। যে ক্ষেত্রে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এই ক্রিয়া হয় ইহাকেই দর্শন-শাস্ত্র মনোময় কোষ বলিয়াছেন। এখন দেখা যাক জ্ঞানেন্দ্রিয় কাহারা। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্, ইহাদিগকেই সাধারণতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা যায়। বাস্তবিক কিন্তু ইহারা দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র। স্থূলদেহে জাগ্রদবস্থায় জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল এই সকল দ্বার দিয়া স্থূলপ্রপঞ্চের সহিত সঙ্গত হয়। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল ইহাদের বিনা সাহায্যেই বিষয় প্রত্যক্ষ করে ও সেই প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ জীবের সুখ-দুঃখ সম্পাদন করে। একরূপ ব্যাধি আছে যাহাতে লোকে নিদ্রাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করে—ভ্রমণ করে, অধ্যয়ন করে, গৃহকর্ম্ম করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতির বিনা সাহায্যেই

এই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। যোগিগণ দূরদেশস্থ পদার্থ দর্শন করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার সকলই যদি ইন্দ্রিয় হইত তাহা হইলে চসমাও দর্শনেন্দ্রিয় হইত। ফলতঃ ইন্দ্রিয় সকল স্থূল ভৌতিক পদার্থ নহে, শক্তি। দর্শনেন্দ্রিয় রূপগ্রহণের শক্তি, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দগ্রহণের শক্তি, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধগ্রহণের শক্তি, রসনেন্দ্রিয় রসগ্রহণের শক্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবার শক্তি। কর্ম্মসংস্কার-রূপ প্রকৃতি বা মহাশক্তির অভিব্যক্তিক্রমে মন হইল কল্পনাশক্তি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিষয় প্রত্যক্ষীকরণের শক্তি। এই দুই শক্তি একত্র অবস্থান করে, কারণ কল্পনাশক্তি অনুপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষীকরণের শক্তির আবশ্যকতা থাকে না ও প্রত্যক্ষীকরণের শক্তি না থাকিলে কল্পনা করিবার বিষয় থাকে না। মন ও ইন্দ্রিয় একত্র অবস্থান করিয়া আত্মাকে বিষয় ভোগ করায়। এই উদ্দেশ্য না থাকিলে মন ও ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা ও অস্তিত্ব থাকিত না। সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের অকাট্য সম্বন্ধ। মন ও ইন্দ্রিয় যতক্ষণ জাগরুক বা সক্রিয় থাকিবে ততক্ষণ বিষয়ের অনুধ্যান ও অন্বেষণ করিবেই করিবে। তবে, সকল জীবের পক্ষে মন ও ইন্দ্রিয় সকল সময়ে জাগরুক থাকে না। যে জীবের প্রকৃতি যত অধিক সাত্ত্বিক তাহার মন ও ইন্দ্রিয় তত অধিক পরিমাণে জাগ্রদাদি অবস্থায় জাগরুক থাকে, আর যে জীবের প্রকৃতি যত অধিক তামসিক তাহার মন ও ইন্দ্রিয় ঐ সকল অবস্থায় তত অল্প পরিমাণে জাগরুক থাকে। অতি তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় কেবল স্থূলদেহে জাগ্রদবস্থায় জাগরুক থাকে। তাহাও যে সকলের পক্ষে সমান পরিমাণে তাহা নহে। ইহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয় যে, একই বস্তু কেহ শীঘ্র ধারণা ও উপলব্ধি করিতে পারে, কেহ বিলম্বে ধারণা ও উপলব্ধি করিতে পারে, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিভা বিভিন্ন প্রকারের হয়। যে সকল জীব স্থূলবিষয়ের স্থূলদৈহিক ভোগ ভিন্ন অন্য প্রকার ভোগে অক্ষম, তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল স্থূলদেহান্তর্গত ইন্দ্রিয়-দ্বার চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন ক্রিয়া করে না, কারণ ইহারাই স্থূলদৈহিক ভোগের করণ। নিদ্রা বা মৃত্যুর দ্বারা এই সকল দ্বার রুদ্ধ হইলে এই সকল জীবের মন ও ইন্দ্রিয় প্রয়োজনাভাবে নিষ্ক্রিয় হয়। এই সকল জীব মৃত্যুর পর নিদ্রিত হইয়া পড়ে ও পরলোকে কোনরূপ ভোগ করে না, পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করিলে তবে জাগরিত হয় ও বিষয় ভোগ করিতে পারে। স্বপ্নও ইহাদের বিরল এবং যদি কখনও স্বপ্ন হয় তাহা অৰ্দ্ধনিদ্রিত ব্যক্তির কার্য্যের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়। যে সকল জীব সত্ত্ববৃদ্ধির হেতু স্থূলদেহের অতিরিক্ত সূক্ষ্মদেহে বিষয় গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল স্থূলদেহান্তর্গত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকেও ক্রিয়া করে, কারণ সূক্ষ্মদৈহিক ভোগে ইহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। নিদ্রা বা মৃত্যুর দ্বারা এই সকল বাহেন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হইলেও এই সকল জীবের মন ও ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে। নিদ্রিত হইলে এই সকল জীব সুন্দর শৃঙ্খলা-পূর্ণ স্বপ্ন দেখে। মৃত্যুর পর ইহারা জাগরুক থাকে ও পরলোকে বিষয় ভোগ করে। ইহাই জীবের মনোময় কোষে অবস্থান ও

জাগরণ। ক্রমে জীবের যত সত্ত্ববৃদ্ধি হইতে থাকে; সতত মনন বা সংকল্পদ্বারা যত তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, জগতের বা জাগতিক পদার্থের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে যতই সে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে থাকে. তত সে বিজ্ঞানময় কোষে জাগরিত হইতে থাকে। সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, জ্ঞানময়। এই জ্ঞানক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে জীবকে আর পদার্থের স্বরূপনিশ্চয়ের জন্য প্রথমতঃ সংকল্পাত্মক মনের সাহায্য লইতে হয় না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সর্ব্ব-নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তখন জীবকে সর্ব্ব সংশয় হইতে মুক্ত করে। ইন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করিলেই ইহা ব্রহ্ম এই সিদ্ধান্ত বিনা বিচারেই উপস্থিত হয়। ইহাকেই বলে জীবের বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান। বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই কোষ গঠিত, অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে জীব মাত্র বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্য করে তাহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। এই কোষে জীবের অবস্থান পূর্ণ হইলে অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিলে জীবের সমস্ত বিষয়ভোগে আত্যন্তিক বিরাগ জন্মে—বিষয়-জনিত দুঃখ যেমন অবাঞ্ছনীয় বিষয়জনিত সুখও তেমনি অবাঞ্ছনীয় হয়। তখন তাহার পক্ষে মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি সকলই নিষ্প্রয়োজন হয়। এই নিষ্প্রয়োজনীয়তা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহসম্বন্ধেই বর্ত্তে। ইহা তমের জন্য হয় না, অধিক পরিমাণে সত্ত্ববৃদ্ধির জন্য হয়। এই নিষ্প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইলে মন বা ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় হয় না, পরন্তু শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব মায়া বা প্রকৃতিতে সমাহিত বা লীন হইয়া যায়। জীব তখন স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ হইতে মুক্ত হইয়া কারণ-দেহে আনন্দময় কোষে বিরাজ করে। প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তি-সমুদ্রে উত্থিত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ক্ষুদ্র শক্তিসকল পুনরায় সেই মহাশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়।

মৃত্যু বা স্থূলদেহের অবসানের পর মনের অস্তিত্বের কথা বলিতে গিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিলাম। এই কথাগুলি বলা প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ আলোচ্য মনঃসূক্তে মনের ক্রিয়ার সম্বন্ধে ঋষি এই সকল কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। ২য় হইতে ১১শ পর্য্যন্ত ঋকে ঋষি বলিয়াছেন যে, সুবন্ধুর মন মৃত্যুর পর দ্যুলোক, পৃথিবী, চতুঃসীমাবিশিষ্ট ভূমি, চারি মহাদিক, সমুদ্র, দীপ্তি, আপ ও ওষধি সকল, সূর্য্য ও ঊষা, পর্ব্বত এমন কি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মনের এই বিশ্বময় ব্যাপ্তি আত্মার ভোগের জন্য, কারণ বেদে মৃত্যুর পর পরলোকে জীবের স্বর্গাদিভোগ সর্ব্বত্রই অঙ্গীকৃত হইয়াছে —বস্তুতঃ সমগ্র বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড পরলোকে ফলভোগের নিমিত্ত। ভোগের অর্থ—ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশের গুণ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন হইয়া তাহার সুখ বা দুঃখের অনুভূতি। তাই ঋষি বলিয়াছেন যে, সুবন্ধুর মন সর্ব্বত্র বিশ্বময় গমন করিয়াছিল। সুবন্ধু ঋষি ছিলেন, তাঁহার চিত্তে বহুল পরিমাণে সত্ত্বের উদ্রেক হইয়াছিল, স্থূলদেহের অবসানের

পর সূক্ষ্মদেহেও বিষয় ভোগ করিবার শক্তি তাঁহার জন্মিয়াছিল, সুতরাং মৃত্যুর পর মনের সহকারী ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার মনের সম্মুখে সমস্ত বিষয় স্থাপন করিয়াছিল। ইহাই তাঁহার মনের বিশ্বময়-গমন, অর্থাৎ বিশ্বময় বিষয়ের অনুভূতি। এখানে পুনরায় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঋষি প্রত্যেক ঋকে "দূরে" এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। স্থূলদেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি দ্বারের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সকলকে যতক্ষণ কার্য্য করিতে হয়, ততক্ষণ তাহারা দূরস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না, দর্শনেন্দ্রিয় দূরস্থিত পদার্থ দেখিতে পায় না, শ্রবণেন্দ্রিয় দূরস্থিত শব্দ শুনিতে পায় না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দূরস্থিত গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে না রসনেন্দ্রিয় দূরস্থিত রস আস্বাদন করিতে পারে না, স্পর্শেন্দ্রিয় দূরস্থিত দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারে না। চক্ষু প্রভৃতি দ্বারের প্রসর অতি সংকীর্ণ, সুতরাং তাহাদের অধীনে কার্য্য করিতে গেলে ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি অতীব সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যখন ইহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পায়, চক্ষু প্রভৃতি দ্বার যখন ইহাদের স্বচ্ছন্দগতির অন্তরায় না হয়, তখন ইহাদের গতি অপ্রতিহত হয়, দূরত্ব বলিয়া কোন পদার্থ ইহাদের নিকট থাকে না। যুগপৎ একই কালে ইহারা সমগ্র বিশ্বে বিচরণ করিতে পারে। এই জন্য সূক্ষ্মদেহধারী দেবাদি জীবসকল এককালে সর্ব্বস্থানের সর্ব্ববিষয় ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারেন। এই জন্য দেবগণ বিশ্ব শাসন করিতে পারেন, বিশ্বময় জীবের প্রার্থনা শুনিতে পান। পুনশ্চ, ঋষি যখন বলিয়াছেন যে, সুবন্ধুর মন সর্ব্ববিশ্বে সর্ব্বত্র গমন করিয়াছিল তখন বুঝিতে হইবে যে, স্বচ্ছন্দবিহারী ইন্দ্রিয়ের গতি স্থূলত্বও রোধ করিতে পারে না, অর্থাৎ প্রাচীর বা তদ্রূপ স্থূলপদার্থের অন্তরাল-হেতু তাহাদের গতি প্রতিহত হয় না। স্থূলপদার্থ যদি তাহাদের গতি রোধ করিতে পারিত, তাহা হইলে জগতের সর্ব্বত্রই স্থূলপদার্থের বিদ্যমানতা থাকায় তাহাদের দূরে গমন অসম্ভব হইত।

১২শ ঋকে ঋষি বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর মন ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; গত, আগত ও অনাগত সমস্ত বিষয়ে গমন করে। স্মৃতি ও অনুমান দ্বারা মন সাধারণতঃই ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। শরীরে বিশেষরূপে অস্ত্রাঘাত দেখিলে ঐ স্থানে যে স্ফোটক হইয়াছিল তাহার অনুমান হয় এবং মেঘের বিশেষরূপ অবস্থা দেখিলে বৃষ্টিপাত হইবে কি না তাহার অনুমান হয়। এতদ্ভিন্ন স্মৃতির দ্বারাও লোকে অতীত বিষয়ের অনুভব করে—পুত্রের মৃত্যু স্মরণ হইলে লোকে শোকে বিহ্বল হয়। এই জন্য দর্শনশাস্ত্র বলিয়াছেন, "সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকাল-মাভ্যন্তরং করণম্" (সাংখ্যকারিকা ৩৩) অর্থাৎ বাহ্যকরণ বর্ত্তমানকালের ও আভ্যন্তরকরণ ত্রিকালের বিষয় গ্রহণ করে। মনের এই ত্রিকালজ্ঞত্ব-ধর্ম্ম ঋষি পরলোকেও অঙ্গীকার করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, ইহলোকে স্থূলশরীরের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ মনের ভূত ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বহুদূর গমন করে না, কিন্তু স্থূলশরীর হইতে মুক্ত হইলে মনের এই দৃষ্টি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—সে দূর অতীত ও ভবিষ্যৎকালের বিষয় সকলও দেখিতে পায়। ১২শ ঋকে ঋষি এই কথাই

বলিয়াছেন। যোগের দ্বারা স্থূলশরীর হইতে মনকে বিযুক্ত করিতে পারিলেও মনের এই দূরদৃষ্টি উদ্ভূত হয়।

এই আলোচনার দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, বৈদিক ঋষি মনঃসূক্তে (ঋ সঃ ১০।৫৮) মনোময় কোষের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম তাহা স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

নক্ষত্র-পূজা

জিউসদেব (Zeus)

গ্রীক দেবচরিত মতে জিউস্ দেব দেবশ্রেষ্ঠ। তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর এবং তিনি তরঙ্গিত শ্মশ্রুধারী, স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট, এক হস্তে বজ্র ও অপর হস্তে দণ্ড এবং তাঁহার পদতলে পাখা-মেলা ঈগল পক্ষী দণ্ডায়মান। ওলিম্পিয়াতে তাঁহার মূর্ত্তি মুকুটধারী এবং তাঁহার দণ্ডাগ্রে পাখা-মেলা ঈগল পক্ষী উপবিষ্ট।

য়ুরোপীয় সুধীগণ সমগ্র আর্য্যজাতির ধর্ম্ম-ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া তুলনা পূর্ব্বক তাহাদের উপাস্য দেবগণের প্রতিবিম্বতা নিরাকরণ করিয়া সুগভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহারা বিজ্ঞান-জগতে অতুল ও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সমগ্র আর্য্যজাতির উপাস্য দেবগণের আধিদৈবিক মূর্ত্তির উদ্ধার সাধন করা আমাদিগের চিরব্রত। আমাদিগের এই চিরশ্রম শিক্ষিতমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিলে আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উপাস্য দেবগণের একতা পুনঃ প্রকাশ পাইবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখার ধর্ম্ম-ইতিহাসের আপাত-বিরোধ-মূলে দেশগত ও বৃত্তিগত কারুকার্য্য পরিদৃশ্যমান হইবে।

প্রতিবিম্বে অসদৃশ বিন্দুগত পার্থক্য দর্শনে সন্দেহের চমকে আর কেহ চমকিত হইবেন না।

সুধীর পাঠক! যদি ঈগলযুগলরত দণ্ড-বজ্রধারী জিউস্দেবের পরিচয় গ্রহণে তোমার বাসনা থাকে, তবে নীতিবিশারদ প্লুটার্কের উপদেশ গ্রহণ কর। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে জিউস্দেব মূলে সূর্য্য। যদি হেঁটে ঈগল উপরে ঈগল এই দুই ঈগল পক্ষীর কথা শুনিতে চাহ, তবে গরুড়ের অমৃত-হরণের ইতিহ পুনঃ পাঠ কর। এবং অমৃত-হরণ কালে নারায়ণ-গরুড়-সংবাদের প্রতি বিশেষ অনুধাবন কর।

"ঐ সময়ে নারায়ণ তাঁহার (গরুড়ের) অলৌকিক কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আগমন করত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'খগপতে! আমি তোমাকে বর দিতে আসিলাম।' কশ্যপ-নন্দন কহিলেন 'দেব! আজ্ঞা করুন, যেন আমি আপনার উপরে বাস করি। ....।' গরুড় বর, লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন 'আপনিও কোন বর প্রার্থনা করুন।' অচ্যুত কহিলেন, 'তুমি আমার

বাহন হও।' গরুড় স্বীকার করিলেন। কেশব তাহাকে ধ্বজের উপর রাখিয়া প্রথম বরের সার্থকতা রাখিলেন।"

আমরা পাইলাম যে,—গ্রীসদেশে সূর্য্য-জিউস্‌দেবের দণ্ডাগ্রে ও পদতলে পাখা-মেলা দুইটী ঈগল শোভা পায়। ভারতে সূর্য্য-নারায়ণদেবের ধ্বজাগ্রে ও তলদেশে গরুড়-পক্ষী বিরাজমান।

গ্রীসদেশের সূর্য্য-জিউস্‌দেবের এই ঈগল-দ্বয়রত চিত্র ভারতের সূর্য্য নারায়ণের এই গরুড়দ্বয়রত চিত্র এই উভয় চিত্রের আধিদৈবিক প্রতিচিত্র নক্ষত্র-মণ্ডলে অবশ্যই আছে। কিন্তু এই জাজ্জ্বল্যমান আধিদৈবিক প্রতিচিত্র হিন্দু ও গ্রীক উভয় ভ্রাতার চিত্তপট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রিয় পাঠক। যদি সেই দিব্য প্রতিচিত্র-দর্শনে তোমার কুতূহল থাকে, তবে কল্পনা-বলে তের হাজার বর্ষ পূর্ব্বে দেবরাত্রে পৃথিবীর মেরুদণ্ডের (Axis of the Earth) চূড়াস্থিত সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ কর! ভূ-স্বর্গের অমৃতময় প্রাচীন শোভা সন্দর্শনে আত্মহারা হইও না।

তোমার ঠিক মাথার উপর বিমানে মনোরম ইস্পাত-নীল নীলমণি (Vega) তারা অচল অটল ভাবে মহামেরুর (Axis of the world) উত্তর প্রান্তে ধ্রুব সিংহাসনে বসিয়া আছে। নীলমণি তারা বীণামণ্ডলে (Lyra) অবস্থিত।

ভারতীয় ইতিহ-মতে বীণামণ্ডলে অভিজিৎ (বজ্র) "কশ্যপঃ (কচ্ছপঃ)"—গজকচ্ছপ এবং গরুত্মান্ (গরুড়) নিহিত আছে।

অভিজিৎ (বজ্রাগ্নি) ঐন্দ্রী শক্তির উচ্চতম বিকাশ। তাই অভিজিৎ (সর্ব্বতঃ জয়ী) বিশ্বজগতের শীর্ষ স্থানে অর্থাৎ ত্রিভুবনের নাভিভূত ইলস্পদে (১।১৪৩।৪ ঋ) ব্রহ্মাণ্ডের মহামেরুদণ্ড উপরে (Axis of the world) অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ শুন বেদধ্বনিঃ—"মূর্দ্ধা ভুবঃ ভবতি নক্তম্ অগ্নিঃ" * তারা কচ্ছপ কচ্ছপাকৃতি দ্যৌস্ (বিবস্বান্) দেবের বা গগনমণ্ডলের সঙ্কুচিত প্রতিমা এবং কশ্যপ নামে মহামেরুদণ্ড উপরে অধিষ্ঠিত। নীলমণি এই তারা-কচ্ছপের মুণ্ড গঠন করে।

তাই বেদে পড়িঃ—"কশ্যপঃ অষ্টমঃ। সঃ মহামেরুম্ ন জহাতি" (তৈঃ ব্রাঃ ১।৭।১)। এই কশ্যপের ডিম্ব ফুটিয়া ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছিল। † তারা কশ্যপ পৌরাণিক মঞ্চে কশ্যপ ঋষি সাজিয়াছেন।

কশ্যপ সকল দেবের পিতা। কশ্যপ অরুণ, সূর্য্য এবং মরুৎগণের পিতা।

ভারতের আশ্রমে পুরাণ পাঠ করিয়া তুমি ভাবিতে এ সব আজগুবী কথা। সুমেরু-শৃঙ্গে বসিয়া তুমি দেখিতেছ যে সায়ংসন্ধ্যার পরে একে একে ৩৩ কোটী তারা উদিত হইতেছে। এক এক তারায় এক এক দেবতা আছে। "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি" (তৈঃ ব্রাঃ ১)।

প্রভাতে দেখিতেছ যে, অরুণোদয়ের পর সূর্য্য উঠিতেছে। এবং দেব-রাত্রের

---

* (১০৮৮।৬ ঋক্) এই বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে য়ুরোপীয় ভাষ্যকারগণ অগ্নি অর্থে হিমাংশু চন্দ্রমা বলিতেছেন। অগ্নি অর্থে শীতরশ্মি হইলে বিষ অর্থে অমৃত হইবার বাধা কি ?

† কশ্যপঃ কচ্ছপঃ। সঃ যৎ কূর্ম্মঃ নাম। তস্মাৎ অণ্ডঃ। সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ (শতপথ ব্রাঃ)।

অবসানে ক্রান্তিপাতিক দুর্য্যোগে ঘন ঘন বজ্রাঘাতে মরুৎগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। তাই এক বায়ু ৪৯ হইল।

আবার ঐ দেখ সূর্য্যোদয়ে কিরণজাল গরুড় অর্থাৎ ঈগল পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীন হইল। দেখিতে দেখিতে মহামেরুস্থিত গজকচ্ছপ উদরসাৎ করিল এবং ইলস্পদে স্থিত সোম অপহৃত হইল।

এ সব সুমধুর কবিত্ব-রস আস্বাদনে যিনি বঞ্চিত তাঁহার পুরাণ-পাঠে অধিকার নাই।

তাতার তৈমুর দিল্লীর বস্ত্র হরণ করেন। পুত্র আমীর উলুক বেগ হিন্দুর গণিতে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুর গৌরব হরণ করেন। মনীষি প্রবর আমীরের তারা-তালিকায় নীলমণি গরুড় Waki (ঈগল) নামে বীণামণ্ডলে বসিল। হেলেস্পণ্ট পারে রাজা আল্‌ফনসোর তারা-তালিকায় আমীরের 'Waki' 'Vega' নাম পাইল, তদবধি য়ুরোপীয় তারাচিত্রে বীণামণ্ডলে ঈগলের গলায় বীণা ঝুলিতেছে।

ডাক্তার Weber প্রমুখ য়ুরোপীয় সুধীগণ কোন্ মুখে বলেন যে তারামণ্ডল গঠনে গ্রীক জাতি হিন্দুর গুরু।

য়ুরোপে হিন্দুর হরিকেশ-মণ্ডল "Heraklis" (Hercules) নাম পাইয়াছে।

তারা হরিকেশ মার্ত্তণ্ড দেবের নাক্ষত্রিক প্রতিমা।

দ্যৌস্ (বিবস্বান্) মার্ত্তণ্ড দেবের নামান্তর। এবং য়ুরোপীয় সুধীগণ বলিয়াছেন যে দ্যৌস্= Zeus।

বেদে (১০।৭২।৮ ঋ) পড়ি:—অষ্ট পুত্রের (অষ্ট বসুর) মধ্যে সপ্ত পুত্র লইয়া অদিতি স্বর্গে প্রস্থান করিলেন এবং অষ্টম পুত্র মার্ত্তণ্ড-দেবকে ফেলিয়া গেলেন।

দ্বৈপায়নের রসায়নে এই সরল ও সহজ ইতিহাসে মানবতার সঞ্চার হইল। ✓

ভরণের চাকচিক্যে জগৎ বিমোহিত হইতেছে।

মহাভারত-মতে (১৯৯) অষ্ট বসু বন-ভ্রমণে মিত্রাবরুণি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন।

কনিষ্ঠ দ্যৌ দেব মহামেরুবাসী বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীকে অপহরণ করিয়া পাপে পতিত হইলেন। আকাশ-গঙ্গার তীরবাসী আপ-বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে অষ্ট বসু আকাশগঙ্গারূপিণী মাতা অদিতির গর্ভে মর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সপ্ত বসু জন্ম মাত্রে মুক্তি লাভ করিলেন। কনিষ্ঠ দ্যৌ মার্ত্তণ্ড দেবব্রত ভীষ্ম নামে মর্ত্তে রহিয়া গেলেন। তারা হরিকেশ মার্ত্তণ্ডদেবের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। দেবব্রত গাঙ্গেয় ভীষ্ম তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ঐ দেখ নভঃ সরিৎবাসী পরশুরামের (Perseus) প্রিয় শিষ্য দিব্যবাণ (Sagitta) দ্বারা আকাশ-গঙ্গার গতি রোধ করিতেছে। আবার হংসরূপী (Cygmes) সপ্তর্ষি শরশয্যায় শয়ান গাঙ্গেয়ের সমীপে মাতৃসন্দেশ প্রদান করিতেছে। সেই হংসে আরোহণ করিয়া আকাশ-সরস্বতী বীণামণ্ডলস্থিত কাচ্ছপী বীণা ধারণে বীণাপাণি হইয়াছেন।

হরিকেশের (Hercules) তলে দ্বিতীয় গরুড় (Aquila) বা ঈগল বিদ্যমান আছে।

এখন একবার হেলেস্পণ্টের অপর পারের ইতিহ স্মরণ কর।

হার্ম্মিস্ (Hermes) অর্থাৎ বুধ কচ্ছপ বিদ্ধ করিয়া তাহার কঙ্কালে বীণা নির্ম্মাণ করেন। এই বীণা হইতে কচ্ছপমণ্ডল (Xelos) বীণা (Lyra) নাম গ্রহণ করিল। এই বীণার প্রহারে হিবাক্লিস্ বীণা গুরু লীনস্‌কে হত্যা করেন।

উপপত্তি

গগনের এই খণ্ডের তারাচিত্রে আমরা পাই যে, মহামেরুদণ্ড উপরে অভিজিৎ বজ্র এবং ঈগল অধিষ্ঠিত আছে। হরিকেশ মণ্ডলে মার্ত্তণ্ড দেব এবং গরুড়-মণ্ডলে ঈগল অধিষ্ঠিত আছে।

এই বজ্র বৃত্রঘ্ন নামে পারসীগণের উপাস্য। এবং এই বজ্র শর্ব্বরীনাথের শিরে রাখিয়া হিন্দু "বজ্রায় ফট্" বলিতেছেন।

এই বজ্র হরিকেশ মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতা জিউস্‌দেবের করে শোভা পাইতেছে এবং তাহার অপর করে মহামেরুদণ্ড। তারা ঈগলদ্বয়ের একটী এই মহামেরুদণ্ড-উপরে, অপরটী জিউস দেবের পদতলে। এই আধিদৈবিক চিত্র হইতে জিউস দেবের আধিভৌতিক মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবার কোন সহজ পথ নাই। ইহাই আমাদের ধ্রুব ধারণা। তবে উত্তর পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই তারা-চিত্র য়ুরোপীয় সুধীগণের চিত্ত আকর্ষণ কখন করে নাই।

চিন্তাশীল পাঠকের করে মীমাংসার ভার অর্পণ করিয়া আমরা অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তারা-দর্শক।

বরিশালে নবান্ন

"নবান্ন" শব্দটী শুনিলে বরিশালবাসীর হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার ও আনন্দের উদয় হয় অন্য কোন দেশবাসী তাহা ধারণাই করিতে পারে না।

যে প্রবাসী ব্যক্তি নবান্নের দিনে ঘরে আসিতে পারিল না, সে আপনাকে দুর্ভাগা বলিয়া মনে করে। তাহার পরিবারগণ নবান্নের দিনে বিষণ্ণ হৃদয়ে শতবার তাহাকে স্মরণ করে। *

রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত নবান্নের উৎসবে আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; সে উৎসাহ, সে উল্লাস, সে আনন্দ, ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব; তথাপি সংক্ষেপে কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

আপনি দেখিতে পাইবেন, নবান্নের পূর্ব্ব রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সকল গৃহের বালক-বালিকাগণ জাগ্রত হইয়াছে এবং

* তু। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়ের বীণা গুরু মধু বিদ্যাবিশারদ দধীচি মুনির মুণ্ড ছেদন করেন।

দলে দলে ঘবের বাহির হইয়া পক্ষিগণেব কলরবেব সঙ্গে তাহাদেব বাল-কণ্ঠ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এক প্রকার সুর ধবিয়া দাঁড় কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছে ; সে নিমন্ত্রণের সঙ্গীত বা ছড়া এই,—

কো কো কো, আমাগো বাড়ী শুভ নবান্ন।
শুভ নবান্ন খাবা কাক বলি লবা
পাতি কাউয়া লাথী খায়,
দাঁড় কাউয়া কলা খায়,
কো কো কো মোবগো বাড়ী শুভ নবান্ন।”

এই নিমন্ত্রণ-সঙ্গীতেব ভাষাটীব বিনা টীকায় রস গ্রহণ করা পশ্চিমবঙ্গেব পাঠকগণেব পক্ষে কষ্ট সাধ্য, তাই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কবা হইতেছে।

“কো, কো, কো,” একটী কাককে সম্বোধন ; “আমাগো বাড়ী” অথবা “মোবগো বাড়ী” কথাব অর্থ আমাদেব বাড়ী। “কাক বলি” অর্থ কাককে যে খাদ্য দেওয়া হয়। “কাক বলি” অর্থাৎ কাককে “নবান্ন” না দিয়া কেহই নবান্ন গ্রহণ করিতে পারে না, আজ কাকই সর্ব্ব প্রধান অতিথি। “পাতি কাউয়া” অর্থ পাঁতি কাক, পাঁতি কাককে নিমন্ত্রণ করা হয় না, দাঁড় কাকই আজ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। প্রত্যূষ হইতে চারিদণ্ড বেলা পর্য্যন্ত এইরূপে পল্লীর সমস্ত বাগান ও রাস্তা-ঘাট বালকবালিকাদিগের নিমন্ত্রণ-সঙ্গীতে মুখরিত হইতে থাকে।

এই সঙ্গীত ক্ষান্ত হইতে না হইতে পুরঙ্গণাগণের উলুধ্বনিতে গগনমণ্ডল নিনাদিত হয়। উলুধ্বনিকে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় “জোকার” বলে, “জয়কার” শব্দ হইতে জোকার শব্দের উৎপত্তি কি না সাহিত্যাচার্য্যগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। প্রথম বাবের জোকার-ধ্বনিতে বুঝিতে হইবে যে, নবান্নের জন্য নূতন চাউল ঢেঁকিতে কোটা আরম্ভ হইয়াছে, এক এক দফায় তিনবাব করিয়া জোকার দিতে হয়, ইহাকে তিন ঝাঁক জোকাব বলে। কিছুক্ষণ পবে আবাব জোকার ধ্বনি হইলে বুঝিতে হইবে নবান্নেব জন্য নাবিকেল ভাঙ্গা হইতেছে। এইরূপ নবান্নেব প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোকাব। যখন ঘবে ঘবে এইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে উলুধ্বনি উঠিতে থাকে, তখন সমস্ত পল্লীটী সত্য সত্যই উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠে। সমাবোহটা যতই অকিঞ্চিৎকব হউক না কেন, এই সকল অনুষ্ঠান উহাকে বৃহৎ করিয়া তুলে। বালক-বালিকাদিগেব ত কথাই নাই বয়স্ক নবনাবীগণেব হৃদয়ও আনন্দে আপ্লুত হয়।

বেলা প্রায় ১০টাব সময় ঘবেব বৃদ্ধ পুরুষ-গণ পিতৃশ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হন, সে কাজের সঙ্গে শুধু তাঁহাদেব এবং পুরোহিতগণের সম্বন্ধ। বালকবালিকাগণ স্নান কবিয়া নববস্ত্র পবিধান করে, আজ তাহাদের প্রভাতের আহার বন্ধ, সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও আহার করার বিধি নাই, কিন্তু এই সংযমে আজ কেহই কাতর নহে, সকলের মুখই উৎফুল্ল, কেননা আজ তাহাদেব “নবান্ন”। বানরিপাড়ার গুহ ঠাকুরতা, গাভার ঘোষ দস্তিদাব, চাঁদশীর বসু মজুমদার প্রভৃতি কতগুলি কুলীন বংশের একটী বিশেষ প্রথা আছে। তাহার নাম “বীর বাঁশ”। অন্দর-মহলে মধ্য উঠানে একটা প্রকাণ্ড আস্ত বাঁশ পোতা হয়, সেই বাঁশের প্রত্যেক কঞ্চিতে নূতন ধানের ছড়া বাঁধিতে হয়, ইহারই নাম

"বীর বাঁশ"। যেখানে বীর বাঁশটী পোতা হইবে তাঁহার চারিদিকে অনেকটা স্থান পিঠলী দিয়া আলিপন দেওয়া হইয়া থাকে, একটী জ্যান্ত কই মাছ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কিছু দুধ ঢালিয়া সেই গর্ত্তে বীর বাঁশ পুতিতে হয়, যিনি বাড়ীর বা ঘরের কর্ত্তা তিনিই এ কার্য্য সম্পাদন করেন, পুরোহিতও সাহায্য করিয়া থাকেন, ইহার জন্যও মন্ত্র আছে।

বীর বাঁশের কথায় একটী কথা মনে পড়িল, একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছি বড় দিনের সময় সুইজারল্যাণ্ডে গৃহস্থের বাড়ীতে ঠিক এইরূপ একটী আস্ত বাঁশ পোতা হইয়া থাকে, তাহারও প্রতি কঞ্চিতে যবের ছড়া বাধিয়া দেওয়া হয়। সুইজারল্যাণ্ডের এই রীতির সহিত বরিশালের "বীর বাশের" কোন সম্বন্ধ আছে কি না কে নির্ণয় করিবে?

"নবান্ন" উপলক্ষে লক্ষ্মী পূজা করিতে হয়, এবং সর্ব্বাগ্রে শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে নবান্ন দিয়া পরে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষ্মী-পূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও বীর বাঁশ পোতা হইয়া গেলে তবে "কাক বলির" পালা আরম্ভ হইল। যেমন দেবতা ও পিতৃলোককে স্মরণ ও অর্পণ না করিয়া হিন্দুসন্তান নবান্ন গ্রহণ করে না, তেমনই আজিকার নিমন্ত্রিত কাককে অগ্রে না দিয়া কেহই নবান্ন ভোজন করিতে পারে না, তাই একটা কলার ডোঙ্গায় (ঠোঙ্গা নহে) "চাউল মাখা", কলা ও নারিকেল লাড়ু লইয়া বাড়ীর কর্ত্তা মহাশয় কাক খুঁজিতে বাহির হইলেন। যে দুষ্ট কাক ছেলের মাথায় ঠোকর মারিয়া ছেলে কাঁদাইয়া মুখের কলা কাড়িয়া লইয়া যায়, যাহাদের যন্ত্রণায় ঘরের জিনিষ সামলাইয়া রাখা যায় না, নিমন্ত্রণ পাইয়া আজ তাহাদের গুমর বাড়িয়া গিয়াছে, গ্রামময় নিমন্ত্রণ, কাজেই আজ খোসামোদ করিয়া তাহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না, সত্য সত্যই আজকার কাকের ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। "কোথায় কাক কোথায় কাক" করিয়া ডোঙ্গা হাতে ক্ষুধিত বৃদ্ধ চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোন গাছে একটা কাক দেখিলে সেই গাছ-তলায় মিষ্টান্নের ডোঙ্গাটা রাখিয়া দূরে আসিয়া লুকাইয়া দেখিতেছেন, কাক মহাশয়ের দয়া হয় কি না, কিন্তু কাকরাজ অতি বুদ্ধিমানের মতন চক্ষুটাকে এক গোলক হইতে অন্য গোলকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কোন ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অধম মনুষ্য কিছুতেই বুঝিতে পারে না। এদিকে বালক-বালিকাগণের এমন কি যুবক-বৃদ্ধগণের পর্য্যন্ত পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে "কাকবলি" না হইলে, নবান্ন খাওয়া হয় না।

বড় ভাগ্যে যদি কাক মহাশয় অনেক বিবেচনার পরে আসনে আসিয়া বসিলেন এবং চঞ্চু-সংযোগে চাউল মাখার স্বাদ লইয়া কদলীটী মুখে করিয়া পলায়ন করিলেন, তখন সকলের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। "কাকবলি" হইয়া গিয়াছে শুনিয়া ছেলে-মেয়ে-গুলি আনন্দে নাচিতে লাগিল।

কলাটী মুখে করিয়া কাক কোন্ দিকে উড়িয়া গেল তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, কেননা বৎসরের শুভাশুভ অনেকটা উহার উপর নির্ভর করে। কোন দিকে গেলে শুভ

হয় কোন দিকে গেলে অশুভ হয় তাহা আমার মনে নাই।

"কাকবলি"র পরে নবান্ন ভোজনের পালা। বিস্তৃত আঙ্গিনায় আসন পাতা হইয়াছে, এক বাড়ীতে যত ঘর গৃহস্থ আছে (কোনও প্রকারের প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে) সকলেই এক সঙ্গে আহারে বসিয়া থাকে। সমস্ত বয়স্ক পুরুষ ও বালক বালিকাগণই আজ পাশাপাশি হইয়া বসিয়াছে। চাউল মাখার জন্য সকলেরই রসনা লালায়িত, তাই "চাউল মাখা" জিনিসটা যে কি তাহার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি।

পাঠক পাঠিকা হয়ত মনে করিয়াছেন কতকগুলি চাউল কলা ও চিনি দ্বারা চট্‌কান পিণ্ডির নাম "চাউল মাখা", আসল কথা তাহা নহে। চাউল মাখা অতি সুস্বাদু চমৎকার খাদ্য। পূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে উলুধ্বনি দিয়া পুরাঙ্গনাগণ চাউল কুটিয়া গুড়ো করিয়াছেন, সেই গুড়োর সঙ্গে প্রায় সমান পরিমাণ নারিকেল বাটা দিয়া জলে কিম্বা ডাবের জলে অথবা নূতন খেজুর রসে গুলিয়া সিন্নির মতন তরল করিয়া উহাতে চিনি কিম্বা নূতন খেজুরী গুড়, কর্পূর প্রভৃতি দেওয়া হয়, ইহারই নাম "চাউল মাখা"। বস্তুটী যেমনই মুখরোচক তেমনই সহজ-পাচ্য, আকণ্ঠ পুরিয়া "চাউল মাখা" খাইলেও পরিপাকের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, "চাউল মাখা"র যদি নারিকেলের ভাগ কম পড়ে, তবে উহা সহজে জীর্ণ হয় না, চাউল মাখাকে "চাউল জল" নামেও অভিহিত করা হয়।

পাথরে বা থালায় (পাথরই প্রশস্ত) চাউল মাখা ঢালিয়া তাহাতে বড় বড় নারিকেলের লাড়ু ও ফোপড় দিয়া সাজাইয়া প্রত্যেক ঘরের গৃহিণী আপনাপন ঘরের লোকদিগকে সর্ব্বাগ্রে পরিবেশন করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে জোকার পড়িতে থাকে। প্রত্যেককেই নিজের নিজের ঘরের নবান্ন আগে খাইতে হয়। এক সঙ্গে ৪০।৫০ জন লোক যখন "চাউল জল" খাইতে আরম্ভ করে তখন হাপুস হুপুস শব্দের দিব্য একটা একতান-বাদ্য বাজিতে থাকে, এই নবান্ন সভায় থানাবাড়ীর প্রজা, চাকর বাকর এবং রামা নাপিত ও শ্যামা ঘরামি একই চন্দ্রাপত-তলে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের পাতে "চাউল মাখা" দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রান্ত পুরনারীগণ উলুধ্বনি করিয়া থাকেন। পুরুষদিগের নবান্ন হইয়া গেলে মেয়েরা এক সঙ্গে নবান্ন করেন, এইরূপে দিনের পালা হইলে পরে

রাত্রির পালা।

যার যতদূর সাধ্য সেইরূপে রাত্রির ভোজের আয়োজন হইবে। তবে বহু পরিবারেই এইরূপ নিয়ম আছে যে অন্ততঃ ২০।২২ কি ২৪ রকমের রান্না করিতেই হইবে। কতকগুলি তরকারী আর কয়েক প্রকারের পিঠা একান্ত আবশ্যক। মানকচু ও মেটে আলুর একটা তরকারী করিতেই হইবে, উহাতে বড়ী ভাজা, নারিকেলের "চিলু" ভাজা এবং "চৈ" প্রভৃতি দিতে হয়। এই সুখাদ্য তরকারীর নাম "আলু কচুর শাগ"। একটা "শোল মুলা"ও অবশ্য প্রয়োজনীয়। লাউয়ের তরকারী না হইলে নরোত্তমপুরের রায় মহাশয়দিগের এবং অন্যান্য অনেক

পরিবারের নবান্ন হইতে পারে না। একটী ছোট লাউয়ের মূল্য এক টাকা হইলেও উহা কিনিতে হইবে। এইরূপ বিভিন্ন পরিবারে অনেক বস্তু অত্যাবশ্যক। "চন্দ্রকাইট" নামক এক প্রকারের পিঠা না হইলেই নয়, সকলকেই উহা প্রস্তুত করিতে হয়। বাসের নবান্নে মৎস্য মাংস অবাধে চলিতে পারে। রাত্রের আহার নিজ নিজ ঘরে বসিয়াই হয়, এ সময়ও পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি চলিতে থাকে। পরের দিনের পালার নাম

বাস নবান্ন বা বাসি নবান্ন।

কল্য যে সকল দ্রব্য রান্না হইয়াছিল সে সকলের অর্দ্ধেক অংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই সমস্ত তরকারী ও পিষ্টক আজ খাইতে হইবে। শুধু ভাতটা রান্না করা হয়। গরম গরম ভাত আর বাসি তরকারী ও পিষ্টকাদি দ্বারা বাস নবান্ন সম্পন্ন হয়।

মুসলমানের নবান্ন

হিন্দুর অনুকরণে অনেক কৃষক-মুসলমান নবান্ন করিয়া থাকে। নবান্নের পূর্ব্বে একজন হিন্দুর সহিত আত্মীয় হিন্দুর দেখা হইলে প্রধান প্রশ্নই এই হয় যে "তোমাদের নবান্ন কবে ?" সেইরূপ মুসলমানও মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করে "মিঞাভাই, নয়া খাবা কবে ?" তাহারা হিন্দুর মতন যথাযথ আচরণ না করিলেও "নয়া খাওয়া"টাকে একটা পর্ব্ব বলিয়া মনে করে এবং তদুপলক্ষে আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকে।

নবান্নের হাট।

নবান্নের পূর্ব্বে যে দিন হাট কি বাজার বসে, সে দিন দু'ঘণ্টার মধ্যে হাট-বাজারের সমস্ত জিনিষ কোথায় উড়িয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। ঐ সময়ে প্রত্যূষে হাটে না গেলে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া কঠিন।

নবান্নের দিন।

সকলের নবান্ন একদিনে হয় না, কোনও বৎসর নবান্নের তিনটী দিনও থাকে। তবে এক পাড়ার কি এক বংশের লোকেরা যথাসাধ্য এক সঙ্গে নবান্ন করার চেষ্টা করে। যাহাদের "নবান্ন" পূর্ব্বে হইয়াছে, পরবর্ত্তী নবান্নকারীরা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে। নিজের বাড়াতে "নবান্ন" না করিয়া কেহই পরের বাড়ীতে "নবান্ন" করে না। তবে কখন কখন সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের জন্য সমস্ত খাদ্যই পুরাতন চাউল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এরূপ ঘটনা খুব বিরল।

উপসংহার।

সংক্ষেপে নবান্নের বিবরণ বলিলাম। উপসংহারে কিছু বলিবার আছে। যে মহিলাগণ নবান্নের জিনিষপত্র প্রস্তুত করিবেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব দিন সংযম করিতে হয় অর্থাৎ এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া থাকিতে হয়। নবান্নের দিন প্রাতে তাঁহারা স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করেন এবং অন্তরে বাহিরে শুচি হইয়া চাউল মাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই এইরূপ এক একজন সংযমী চাই। কেননা "নবান্ন"-উৎসবটী শুধু একটা আনন্দোৎসব নহে। উহা ধর্ম্ম-কার্য্য। এই প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বাল্যস্মৃতি মনে উদিত হইয়া প্রাণকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বালকবালিকাদিগের সেই সুধামাখা কণ্ঠস্বর, কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করার জন্য ব্যাকুলতা,

পুরমহিলাগণের "জোকার" বা জয় জয়কার ধ্বনি, দেবতা ও পিতৃ-পুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন, ব্রতীর সংযম এবং পরিজনগণ ও আশ্রিতগণের সহিত নবান্ন ভোজন, এই সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া ইহলোক পরলোকের স্মৃতি লইয়া বরিশালবাসীর প্রাণে "নবান্ন" শব্দটী যে ভাব প্রকাশ করে অন্য দেশের লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

২য় স্তর

(১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একজনমাত্র লোক ফাদার ম্যাডেলিনের প্রতি সন্দিগ্ধ ছিল,—স জাভার্ট,—পুলিশের দারোগা। পুলিশের লোকেরা প্রায়ই ক্ষমতাস্পর্দ্ধী এবং নীচপ্রকৃতিক হয়। জাভার্টের তেজ পূর্ণমাত্রাতেই ছিল, কিন্তু নীচতা সে কখনই জানিত না। মানুষের আত্মা যদি মানুষের চক্ষে প্রতিভাত হইত, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেক বিভিন্ন মানবের মধ্যে মানবেতর কোন না কোন জীবের প্রতিচ্ছবি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম। শম্বুক হইতে শ্যেন, শূকর হইতে ব্যাঘ্র—সব জন্তুরই প্রকৃতি মানব-চরিত্রে বর্ত্তমান;—কখনও তাহা একক, কখনও বা একাধিকের মিশ্রণ। আমার মনে হয়, নিকৃষ্ট জীবেরা আমাদেরই পাপ-পুণ্যের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। ভগবান তাহাদের দেখাইয়া আমাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেন। তবে তাহাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে,—তাহারা ছায়ামাত্র; তাই তাহাদের মধ্যে পূর্ণজ্ঞানের বিকাশ হয় না; আর আমরা কায়া, সত্য, আমাদের একটা সার্থকতা আছে,—তাই ভগবান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তির জন্য আমাদের আত্ম শিক্ষার প্রয়োজন। এ বিষয়ে সামাজিক শিক্ষাই প্রশস্ত শিক্ষা, তবে তাহা যথার্থতঃ দেওয়া চাই। অবশ্য বাহ্য জীবন লইয়াই আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। মানবেতর জীবসমূহের চরম পরিণতি কি, বা তাহার সার্থকতা কোথায়—সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। তবে, তাহাদের এ আপাতঃ জীবনের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম কোন জীবন নাই-ই—এ কথা কেমন করিয়া বলিব?

বলিতেছিলাম জাভার্টের কথা। তাহার জন্ম হয় কারাগারে। বাপ গ্যালির কয়েদী, মা জিপসি (হা-ঘরে)—রমণী। সাধারণ সমাজে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না। বোধ হয় সেইজন্যই জিপসি জাতির প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ছিল। সে দেখিল সমাজে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোকের কোন স্থান নাই;—এক, যাহারা সমাজদ্রোহী; অপর, যাহারা সমাজ রক্ষা করে। জাভার্ট

ভাবিল তাহাকে দু'য়ের মধ্যে একটা হইতে হইবে। তাই সে পুলিশ-বিভাগে প্রবেশ করিল; এবং সুযশ অর্জ্জন করিয়া চল্লিশ বর্ষ বয়সে ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হইল। দক্ষিণ-দেশের গ্যালিসমূহে সে প্রথম প্রথম নিযুক্ত হয়। কার্য্যতৎপরতা এবং সাধুতা তাহার জীবনের মূলসূত্র ছিল। আইনের মর্য্যাদা সংরক্ষণ এবং বিদ্রোহীর দমন তাহার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল।

তবে, বেশী বাড়াবাড়িতে ভাল জিনিসও বিকৃত হইয়া যায়; জাভার্টেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার চক্ষে,—একপক্ষে, চুরি হইতে খুন জখম ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ পাপ; অপরপক্ষে, প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য চৌকিদার পর্য্যন্ত;—সব এক পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। আইনলঙ্ঘী কাহাকেও সে কখন ক্ষমা করিত না। একদিকে সে যেমন বলিত—"হাকিম কখনও অন্যায় করে না, সরকারী কর্ম্মচারীর কখনও ভুল হয় না।" অপরপক্ষে তেমনই বলিত—"ও সব লোকের আত্মার কখনো মুক্তি নেই। তাদের দিয়ে কখনো জগতের কোন উপকার হতে পারে না।" যাহারা ভাবে যে মানবকৃত শাসনপদ্ধতি দানবকে মানব হইতে পৃথক করিয়া দেয় (না, মানবকে দানবে রূপান্তরিত করে?)—তাহাদের মতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল; যুক্তিবিচার তাহার কাছে বড় একটা ছিল না; গম্ভীর, কঠোর, সাদাসিধা অথচ উদ্ধত ধর্ম্মান্ধের ন্যায়ই তাহার প্রকৃতি; চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র, অনুরাগলেশবর্জ্জিত; 'সজাগ এবং সতর্ক' থাকাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সকল বন্ধুর পথের মধ্যেও সে আপনার সোজা পথ কাটিয়া লইত। কার্য্যপটুতার মাপকাঠিই তাহার বিবেক এবং কর্ত্তব্যপালনই তাহার ধর্ম্ম ছিল,—সেখানে স্নেহ দয়া মায়া কিছুরই স্থান ছিল না; গ্যালি হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলে আপন পিতাকেও সে ক্ষমা করিত না,—সে ক্ষেত্রেও বুদ্ধি বা কর্ত্তব্যসম্পাদনের আত্মপ্রসাদ সে উপভোগ করিত। নির্জ্জনতা, আত্মত্যাগ এবং চরিত্রের পবিত্রতা—ইহা লইয়াই তাহার জীবন ছিল। ভিডক (Vidocq) এবং ব্রুটাসের (Brutus) একত্র সংযোগ যদি অনুমান করিতে পার, তবেই জাভার্টের চরিত্র বুঝিতে পারিবে।

জাভার্টের পূর্ণ মূর্ত্তিখানা সহজে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না। তাহার ক্ষুদ্র ললাট টুপিতে, চক্ষুদ্বয় ভ্রূর ঘনরোমে, চিবুকের অগ্রভাগ গলাবন্ধে সর্ব্বদাই আবৃত থাকিত; কিন্তু আবশ্যক হইলে, কোথা হইতে একটা দুঃস্বপ্নের ন্যায় সহসা তাহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তিখানা প্রকাশিত হইয়া পড়িত। সে ক্ষুদ্র মস্তক, আস্তৃত চিবুকাস্থি, নাসিকার উভয় পার্শ্বে হরিণশৃঙ্গের ন্যায় আকুঞ্চিত রেখাদ্বয়, মাংসবহুল দন্তপাতি, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভ্রূকুটির ভাব—যে-ই দেখিত সে-ই সশঙ্কিত হইত; বিশেষতঃ জিপ্‌সিরা,—তাহার নাম শুনিলেই তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইত। তবে জাভার্টও মানুষ ছিল, তার প্রধান প্রমাণ—আত্মপ্রসাদ ঘটিলে মাঝে মাঝে দু'এক টিপ নস্যগ্রহণ; তার অন্য নেশা কিছু ছিল না।

তাহার সকল কার্য্যের মধ্যে, সব সময়েই ম্যাডেলিনের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত।

বহু অনুসন্ধানের ফলে, অবশেষে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং বংশ পরিচয় পাইয়াছে বলিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা হইল; তখন সে কথাচ্ছলে পরোক্ষভাবে দু'এক জনকে সে কথা জানাইল। কিন্তু তাহার সে অনুসন্ধান সূত্র অকস্মাৎ একদিন ছিন্ন হইয়া গেল; 'খেই' হারাইয়া জাভার্ট কয় দিন আরও গম্ভীর হইয়া রহিল।

ম্যাডেলিন ক্রমশঃ তাহার সন্দেহ কি বুঝিলেন; কিন্তু বুঝিয়াও তাহাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা বা তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকা—দু'য়ের একটাও করিলেন না, যেন লক্ষ্যই করেন নাই এইভাবে তাহার তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি এবং বিরক্তিকর ব্যবহার সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সে সহজ আচরণে, এবং নিরুদ্বেগ মুখভাব দেখিয়া জাভার্ট কতকটা দমিয়া গেল। ভাবিল—"তাই ত! তবে কি একটা মিথ্যা সন্দেহের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি?"—পাশবিক সংস্কারের ত্রুটী এইখানেই, ইহা যতই আপাতঃ-বলবান হউক, সময় বিশেষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে উচ্ছিন্ন হইতেই হয়; তাহা না হইলে, জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর আসন সে দখল করিয়া বসিত, এবং মানব অপেক্ষা সাধারণ পশুই উন্নততর জীবনের অধিকারী হইত।

পরবর্ত্তী একটা ঘটনায় কিন্তু জাভার্টের মনে পূর্ব্বসন্দেহ ফিরিয়া আসিল। ঘটনাটা এই;—

সে দিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ ফসিলিভাণ্ট মাল-বোঝাই গাড়ীখানা লইয়া যাইতে যাইতে, অকস্মাৎ গ্রহের ফেরে ঘোড়াটার পা বাধিয়া যাওয়ায়, ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গাড়ীর নীচে পড়িয়া যায়,—গাড়ীর সমস্ত ভার পড়িল তাহার বুকের উপর;—পড়িয়া পড়িয়া বৃদ্ধ তখন গোঙাইতে লাগিল। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল;—ফলে হিতে বিপরীত হইল; গাড়ীখানা কর্দ্দমের মধ্যে আরও বসিয়া গিয়া বৃদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিল। সকলে তখন সন্ত্রস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সরিয়া দাড়াইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিল। এমন সময়, ম্যাডেলিন সে পথ দিয়া যাইতে যাইতে জনতায় আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া ম্যাডেলিন শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; তখন গাড়ী হইতে মালপত্র নামাইবার উপায়ও নাই, সামান্য নাড়া-চাড়াতেই সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।

"বাঁচাও, কে আছ বৃদ্ধকে বাঁচাও!—" অতি ক্ষীণ আকুল যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি!

ম্যাডেলিন জনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কোন পালোয়ান কি এখানে নেই?"

"আজ্ঞে, আন্‌তে লোক গেছে।" জাভার্ট ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পালোয়ান ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল।

"কখন্ সে আসবে?"

"অন্ততঃ মিনিট পনের ত বটেই।"

"পনের মিনিট! সর্ব্বনাশ!" ম্যাডেলিন প্রমাদ গণিলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি নরম থাকায় শকটের ভার

প্রতিমুহূর্ত্তেই বৃদ্ধের বক্ষের উপর চাপিয়া বসিতেছিল। আর পাঁচ মিনিটেই বুঝি তার অস্থিপঞ্জর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। উপায়?—

ম্যাডেলিন বলিলেন—"দেখ অতক্ষণ অপেক্ষা করা চল্‌বে না। আমি বলি কি, তোমাদের মধ্যে একজন হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ীর নীচে গিয়ে পিঠের চাপ দিয়ে গাড়ীখানা নীচে থেকে তুলে ধর—আধ মিনিটে বৃদ্ধ বেঁচে যাবে। নইলে আর কোন উপায় নেই। তোমাদের মধ্যে কারও কি সে বল বা সে সাহস নেই? দেখ, যে যাবে, তার এই পাঁচ মোহর!"

কেহ নড়িল না।

"আচ্ছা, দশ মোহর।"

সকলে অবনতমুখ হইয়া রহিল।

একজন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"এমন অসম্ভব শক্তি কার তা ত জানি নে,—শেষে তাকেও না পিষে মর্‌তে হয়।"

"ভাল, বিশ মোহর!"

এই ফসিলিভাণ্টই ম্যাডেলিনের পরম শত্রু ছিল; ছিদ্র পাইলেই সে তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। তার কারণ ছিল;—তারও একদিন স্বাচ্ছন্দ্যের দিন গিয়াছে; অবস্থাবিপর্য্যয়েই আজ তাহাকে তাহার শেষ সম্পত্তি সেই শকটখানি লইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইতেছে; তাই সে ম্যাডেলিনের অচির-লব্ধ ঐশ্বর্য্যে এত ঈর্ষান্বিত হইত।

উৎকণ্ঠিত হইয়া ম্যাডেলিন হাঁকিলেন—"বিশ মোহর দেবো—কে যেতে চাও, শীঘ্র এস।"

তখন কে একজন বলিয়া উঠিল—"যেতে চাওয়ার কথা ত এ নয়, মশায়—"

ম্যাডেলিন ফিরিয়া চাহিলেন। সে উত্তরকারী—জাভার্ট।

জাভার্ট বলিল—"যেতে চাওয়ার কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে—শক্তি। এই পর্ব্বতের মত বোঝাটা পিঠে করে ঠেলে তুলতে পারে, এমন অসম্ভব শক্তিশালী লোক কোথায়?" তার পর ম্যাডেলিনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"তবে এমন একজনকে আমি এক সময় জানতাম বটে!"—ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন।

জাভার্ট তাঁহার মুখ হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়া অথচ যেন সহজভাবে বলিয়া চলিল—

"সে একজন কয়েদী।"

"হুঁ।"

"তুঁলর গ্যালিতে সে ছিল।"

ম্যাডেলিনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

শকটখানা ইতিমধ্যে ক্রমশঃই বসিয়া যাইতেছিল। ফসিলেভাণ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওঃ ওঃ, মলাম—মলাম!—হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে গেল। কেউ বাঁচতে পারলে না গো।"

ম্যাডেলিন জনতার দিকে ফিরিলেন। "তোমাদের মধ্যে এমন কেউই কি নেই যে এই কুড়িটা মোহর নিয়ে একে বাঁচায়!"

জনমণ্ডলী স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল। জাভার্ট বলিতে লাগিল—"একজন লোককে আমি জানি একমাত্র যার দ্বারা এ কাজ সম্ভবপর হতে পারে। সে সেই কয়েদী।"

"ওঃ মরে গেলাম, মরে গেলাম!"—বৃদ্ধ পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ম্যাডেলিন ভূমিসংলগ্নদৃষ্টি হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, বৃদ্ধের আর্ত্তনাদে মুখ

তুলিলেন; একবার জাভার্টের তীক্ষ্ণ শ্যেন-দৃষ্টির প্রতি একবার নিশ্চল জনমণ্ডলীর প্রতি চাহিলেন; একটা বিষাদের হাস্যলেখা তাঁহার ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। তার পর চকিতের মধ্যে জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িয়া, কেহ তাঁহাকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই হামাগুড়ি দিয়া শকটের নীচে যাইয়া পৌঁছাইলেন।

জনমণ্ডলী স্তব্ধ, নির্ব্বাক। একটা গম্ভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের ছায়া সকলেরই মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

দুই দুইবার ম্যাডেলিন তাঁহার জানু ও কনুই একত্র করিবার চেষ্টা করিলেন—দুই বারই তাঁহার সে প্রয়াস বিফল হইল। তখন সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ফাদার ম্যাডেলিন,—ফিরে আসুন, ফিরে আসুন।" মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"আপনি যান, চলে যান। আমি ত মরবই, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও কেন মরবেন?"—ম্যাডেলিন কোন উত্তর দিলেন না।

সেই বিশাল জনতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে দণ্ডায়মান রহিল। ম্যাডেলিনের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ তখন রুদ্ধপ্রায়;—ইচ্ছা থাকিলেও, বুঝি আর তাঁহার তখন ফিরিবার উপায় ছিল না।

সহসা সে বিশাল স্তূপ কম্পিত হইয়া উঠিল, শকটের চক্রদ্বয় ধীরে ধীরে কর্দ্দম হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ম্যাডেলিন বলিয়া উঠিলেন—"এইবার—শীঘ্র নাও।"

সকলে ছুটিয়া আসিল। একজনের চেষ্টায় সকলের মনে তখন সাহস ও শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ জনে ধরাধরি করিয়া তখন সে শকটখানা তুলিয়া ধরিল। বৃদ্ধ ফসিলে-ভাণ্ট রক্ষা পাইল।

ম্যাডেলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ তখন পাংশুবর্ণ, স্বেদসিক্ত; বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন, কর্দ্দমাক্ত। সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ ফসিলিভাণ্ট ম্যাডেলিনের পদদ্বয় চুম্বন করিয়া বলিল—"বাবা, তুমিই আমার ভগবান।" ম্যাডেলিনের মুখে তখন এক দেবদুর্লভ অপূর্ব্ব সুখ যন্ত্রণার মাধুরীর ছায়া পরিব্যাপ্ত, ধীর প্রশান্ত দৃষ্টিতে তিনি একবার জাভার্টের প্রতি চাহিলেন,—জাভার্ট তখনও একদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া ছিল।

বৃদ্ধ ফসিলিভাণ্ট প্রাণে রক্ষা পাইল বটে,—কিন্তু চিরজন্মের মত খঞ্জ হইয়া গেল। ম্যাডেলিন তাহার শরীর সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আপন কারখানা-বাটীর আতুরাশ্রমে রাখিলেন। তার পর, সে আতুরা-শ্রমের স্বেচ্ছাসেবিকা মহিলাদ্বয়ের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া প্যারিসের এক মহিলাশ্রমে, মালীর কার্য্য জুটাইয়া দিলেন। সংসারে আপনার বলিতে বৃদ্ধের কেহ ছিল না। সে বিপদের পর দিন ম্যাডেলিন বৃদ্ধকে ১০০০ ফ্রাঙ্কের এক চেক দিয়া বলিলেন—"তোমার গাড়ী ঘোড়া আমি নিয়ে নিয়েছি।" সে শকট চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ঘোটকও পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল;—ফসিলিভাণ্ট তাহা জানিত না।

ইহার কিছুদিন পরেই ম্যাডেলিন ম—র নগরাধ্যক্ষ হন। প্রথম যে দিন জাভার্ট, তাঁহার অঙ্গে, সে নগরে তাঁহার সর্ব্বময় প্রভুত্বের পরিচায়ক-চিহ্ন দেখিল, সে দিন সে শিহরিয়া উঠিল;—'নেকড়ে বাঘে'র অঙ্গে প্রভুর

পরিচ্ছদ দেখিলে শিকারী কুকুরের মনের যে অবস্থা হয়—জাভার্টেরও মনের অবস্থা তদ্রূপ দাঁড়াইল। সে দিন হইতে সে যতটা পারিত তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত। নিতান্ত কার্য্যের দায়ে তাহাকে তাঁহার সম্মুখীন হইতে হইলে, যথোচিত সম্ভ্রমের সহিত সে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিত।

(৩)

এতক্ষণ আমরা ম্যাডেলিন ও জাভার্টের প্রসঙ্গ লইয়াই ছিলাম ; এইবার ফ্যানটাইনের কি হইল দেখা যাক্।

ম—তে আসিয়াই ফ্যানটাইন ম্যাডেলিনের কারখানায় কাজ পাইল। সৌভাগ্যের বিষয়, কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। প্রথম প্রথম, নূতন ধরণের কাজ বলিয়া সে তেমন বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিত না, তত্রাচ যাহা পাইত, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। স্বাধীনভাবে আপনি আপনার উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে পারার যে কত সুখ, কি আনন্দ, ফ্যানটাইন এতদিনে তাহা বুঝিল; আত্মপ্রসাদে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দু'একদিনের মধ্যেই সে ছোটখাট একটি ঘর ভাড়া করিয়া, মনের মত করিয়া সেটিকে সাজাইল। কিছু কিছু আসবাবপত্রও ভাড়া করিয়া আনিল, ভাবিয়া রাখিল—ভবিষ্যতে উপার্জ্জিত অর্থ হইতে ক্রমশঃ সে ঋণ পরিশোধ করিবে,—এইটুকুই তাহার অতীতের অমিতব্যয়িতার চিহ্ন। পরিণত স্বভাব একেবারে বর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে বড় কঠিন। কারখানার কার্য্যশেষে সেই ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া বসিয়া সে কসেটের কথা ভাবিত, আর মধ্যে মধ্যে দর্পণে আপনার কুঞ্চিত ঘন কেশদাম, মুক্তাধবল দন্তপাতি এবং যৌবন-ঢলঢল মুখখানির প্রতি চাহিয়া থাকিত। আত্মনির্ভরতার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই তাহার নষ্ট শ্রী ফিরিয়া আসিতেছিল।

থলোমিয়েকে সে যে চক্ষেই দেখুক,—তবু সে তার পরিণীতা ভার্য্যা নয়। তাই তাহাকে অপর দশজনের কাছে কসেটের কথা গোপন করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু জননীর প্রাণ—কন্যার সম্বাদ না লইয়া কেমন করিয়া বাঁচে? তাই সে প্রতিমাসেই দু'খানা চারিখানা করিয়া সেখানে পত্র দিত। নিজে সে কোনরূপে নামসহিটুকু করিতে পারিত মাত্র, সাধারণ মুহুরীকে দিয়াই সে চিঠিপত্র লিখাইত। ক্রমে ক্রমে দু' একজন এ বিষয় লক্ষ্য করিল। "তাই ত, ফ্যানটাইন "চিঠি লেখে" !" মানুষের স্বভাবই এই যে, যে বিষয়ে যার যত সম্বন্ধ অল্প সে বিষয় জানিবার জন্য তার তত আগ্রহ অধিক। "অমুক ভদ্রলোক রাত না হ'লে বাড়ী ফেরেন না কেন?" "অমুক লোকটা খালি অলি গলি দিয়ে চলে কেন?" "অমুক স্ত্রীলোক তার গাড়ীখানা দূরে দাঁড় করিয়ে পায়ে হেঁটে সে বাড়ীতে ঢোকে কেন?" "বাক্স ত তার চিঠির কাগজে ভরা, তবু মেয়েটা চিঠির কাগজ কিনতে পাঠায় কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অনেকে এমন আছেন যে এই সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য কোন লাভের লোভে নহে, কেবলমাত্র অনুসন্ধিৎসার সফলতার জন্য স্বেচ্ছায় অকাতরে যত সময়, অর্থ এবং সামর্থ্যের-অপব্যবহার করেন তাহাতে অন্ততঃ দশবিশটা সৎ কার্য্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

কতক কতক লোক আবার বাচালতা-দোষেও সে স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এক একটা উনানে যেমন দেখিতে দেখিতে জ্বালানি পুড়িয়া যায়, ইহাদেরও প্রকৃতি সেইরূপ। ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য বিষয়ান্তর না পাইয়া তাই তাহারা তখন প্রতিবেশীদিগের উপর গিয়া পড়ে। বিশেষতঃ, পরচর্চ্চাটা জমেও ভাল, তার শ্রোতৃসংখ্যা মেলেও বেশী; সুতরাং তাহাতে দিনটাও তাহাদের বেশ কাটে। অতএব, বলাই বাহুল্য যে, ফ্যানটাইনের উপর তাহাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল। তলে তলে তথ্যসংগ্রহ চলিতে লাগিল। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা ভিকটাবনিয়ে তাহাদের অগ্রণী হইয়া, সেই সাধারণ মুহুরীর নিকট ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, নিজ ব্যয়ে মন্টফারমিলে গিয়া ফ্যানটাইনের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে শাখাপল্লবিত হইয়া কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; এবং সে উদ্যত অশনি সহসা একদিন ভীষণ বেগে হতভাগিনী ফ্যানটাইনের মস্তকের উপর পতিত হইল। কারখানার কর্ত্রী, ম্যাডেলিনের নাম করিয়া তাহার হাতে ৫০ ফ্রাঙ্ক দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারখানা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। সেই মাসেই থেনেডিয়ারেরা, কসেটের ব্যয় বাবদে, ১২ ফ্রাঙ্কে সন্তুষ্ট না হইয়া ১৫ ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়া পত্র দিয়াছিল!

তবে, তাহার কলঙ্ককাহিনী এতদিনে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে! নিরাশা অপেক্ষা লজ্জায় অভাগিনী অধিকতর অভিভূতা হইয়া নতমুখে বাসায় ফিরিল। ম্যাডেলিনের সহিত দেখা করিতে কেহ কেহ তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু স্বপক্ষে বলিবার যে তাহার কিছুই ছিল না! তিনি দয়ালু—তাই সে ৫০ ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন; তিনি ন্যায়নিষ্ঠ,—তাই কারখানা হইতে তাহাকে বিতাড়িতা করিয়াছেন। ফ্যানটাইন নতমস্তকে তাঁহার সে বিচার মানিয়া লইল।

(৪)

ম্যাডেলিনের কারখানা হইতে বিতাড়িতা হইয়া ফ্যানটাইন পথে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল তদ্দ্বারা কিছুদিন চলিল; সে অর্থ যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন সে অনেক চেষ্টায় এক দরজির কারখানায় দৈনিক ১২ স্যুস মজুরী হিসাবে এক কাজ জুটাইল। এই সময় হইতেই থেনেডিয়ারদের দেয় বাকী পড়িতে লাগিল। নিজেরই অন্নসংস্থান হয় না, সেখানে কি পাঠায়? নাম মাত্র আয়ে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা, আর বিনা আয়ে বাঁচিয়া থাকা,—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী নাই;—যেন পাশাপাশি দুইটি কক্ষ—একটি অস্পষ্ট-দৃষ্ট, একটি অলক্ষ্য। ফ্যানটাইন ক্রমশ আপনাকে সে দারিদ্র্যে অভ্যস্ত করিয়া লইল। প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে ঘরে আগুন না জ্বালাইয়াও তাহার চলিতে লাগিল; সখ করিয়া পাখী পুষিয়াছিল, তাহার জন্য দৈনিক আধ পয়সা চানা লাগিত বলিয়া বাহুল্যখরচ-বোধে সেটাকে ছাড়িয়া দিল; জানালা খুলিলে পার্শ্বের কক্ষের আলো তাহার ঘরে আসিয়া পড়িত, সেই আলোতে সে যৎকিঞ্চিৎ নৈশ-ভোজ্য গ্রহণ করিয়া, আলোর খরচ বাঁচাইত। চির দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া সৎভাবে যাহারা আজন্মকাল কাটাইয়াছে, সামান্য একটি পয়সা

হইতেও তাহারা কত কাজ পায় তাহা কয়জন জানে? অভ্যাসের ফলে, সেটা অবশেষে তাহাদের প্রতিভা স্বরূপে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়ায়। ফ্যানটাইন ক্রমশঃ সেই প্রতিভার অধিকারিণী হইতে লাগিল।— ফলে, জীবনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশঃ সে একটা আশার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইল। সে ভাবিত—"সমস্ত দিবারাত্রি খাটলে যদি ৫ ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাকী সময়টা কাজ করি, তা হলে নিজের খাবারটাও পূর্ণ না হোক্, কতক ত জোগাড় হয়। আর তাছাড়া, মনে দুঃখ কষ্ট থাকলে লোকে খায়ও কম।"

তবু এই দুর্দ্দিনে কন্যাকে কাছে রাখিতে পারিলে, তার একটা অপূর্ব্ব সুখ থাকিত। কিন্তু সে পথ যে রুদ্ধ! এই কয়মাসে থেনেডিয়ারদের অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে, তার উপর যাতায়াতের খরচ—তাহাই বা কোথা হইতে আসে!

প্রথম প্রথম ফ্যানটাইন পথে বাহির হইত না; বাহির হইলেই তাহার মনে হইত যেন সকলেই তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চাহিয়া আছে। সহরে কেহ কাহাকে চেনে না,—কাজেই দুঃখী অথচ আত্মসম্মানী ব্যক্তির দিন কোনরূপে সেখানে কাটিয়া যায়; কিন্তু পল্লীগ্রামে, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে, কাজেই পরের উপেক্ষা ছুরিকার আঘাতের ন্যায় প্রাণে বড় বাজে। প্রথমটা ফ্যানটাইন বড় কাতর হইয়া পড়িত; কিন্তু ৩।৪ মাসের পর সে সব সহিয়া গেল। সে ভাবিয়া দেখিল— "যার অর্থ নেই, তার আবার সম্মানের দাবী কি? আমার পক্ষে দুইই সমান।"

দেখিতে দেখিতে একবৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় শীত দেখা দিল। অত্যধিক পরিশ্রমে ফ্যানটাইনের শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অল্প অল্প জ্বর এবং শুষ্ক কাসি ক্রমশঃই তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইতে লাগিল।

শীতকালে দুঃখী লোকের আরও কষ্ট। কখন্ দিন আসে কখন্ চলিয়া যায় কিছুই বুঝা যায় না। কাজের সময় কমিয়া যায়; প্রবল হিমে সূর্য্যের আলো তাপ গ্রাস করিয়া ফেলে; সূর্য্যের রশ্মিধারা জমাট বাঁধিয়া যায়, মানুষের চিত্তও কঠিন হইয়া আসে। তাই ফ্যানটাইনের মহাজনেরা নির্ম্মমভাবে তাগাদা আরম্ভ করিয়া দিল।——দেনা পরিশোধ ত দূরের কথা প্রতিদিনই সে নূতন দেনায় জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছিল; এদিকে থেনেডিয়ারদের পত্রের জবাব দিতে দিতে ডাক খরচে সে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিল। তার উপর হঠাৎ একদিন তাহারা জানাইল যে কসেটের গাত্রবস্ত্র একখানিও নাই, অন্ততঃ দশ ফ্রাঙ্ক পত্রপাঠ না পাঠাইলে এই দারুণ শীতে তাহাকে নগ্নগাত্রে কাটাইতে হইবে। ফ্যানটাইন সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবিল; শেষে সন্ধ্যার সময় এক পরচুলাওয়ালার দোকানে গিয়া ১০ ফ্রাঙ্কে আপনার মাথার চুল বিক্রয় করিয়া আসিল। পরদিন সে একটা ভাল জামা খরিদ করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

সে জামা পাইয়া থেনেডিয়ারেরা চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল। তারা টাকা চায়, জামা চায় না। সে জামা ইপোনাইনের গায়ে উঠিল; চাতক পাখী বুকে হাঁটু দিয়া কাঁপিতেই লাগিল।

কেশ হীনা হইয়া পৃথিবীর সকল লোকের উপর ফ্যানটাইনের আক্রোশ হইল।—

আত্মসম্মানের গর্ব্ব ত সে পূর্ব্বেই হারাইয়াছিল। এখন হইতে ক্রমশঃ সে নির্লজ্জভাবাপন্না হইতে লাগিল। ম্যাডেলিনই তাহার যত দুর্দ্দশার মূল—তাহাই তাহার ক্রমশঃ ধারণা হইতেছিল। তাই পথে তাঁহাকে দেখিলেই, নির্লজ্জার ন্যায় সে উচ্চৈঃস্বরে হাসি গান আরম্ভ করিত।

ইহার পরিণতি যাহা হয় অবশেষে তাহাই ঘটিল। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে মনুষ্যত্ব, রমণীর সম্মান, স্ত্রীধর্ম্ম একে একে সকলই সে জলাঞ্জলি দিল। কিন্তু সেটা সুখে নয়, লালসায় পড়িয়া নহে,—সংসারের প্রতি প্রতিহিংসা লইবার জন্যই যেন তাহার সে চেষ্টা। তত্রাচ সেই পঙ্কিল পথে দাঁড়াইয়াও, কন্যার কথা সে একদিনও ভুলে নাই; জীবনের ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে কন্যার মূর্ত্তিখানি যেন কোন্ দেবদূতের ন্যায় সর্ব্বদাই ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ফ্যান ভাবিত "টাকা কড়ি হলে, কসেটকে আমার কাছে নিয়ে আস্‌বো।" পরক্ষণেই আপনা আপনি সে হাসিয়া উঠিত।

কিছু দিন যায়। আবার থেনেডিয়ারেরা দুই নেপোলিয়ন (স্বর্ণমুদ্রা) চাহিয়া বসিল; লিখিল—"কসেটের মিলিয়ারী জ্বর—শীঘ্র টাকা পাঠাবে, নইলে মেয়ে বাঁচবে না।" সেই দিন অপরাহ্নে ফ্যান পথ দিয়া চলিতে চলিতে জনতা দেখিয়া উৎসুকী হইয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল, দন্তচিকিৎসক মূল্য দিয়া স্ত্রীলোকদের দন্ত ক্রয় করিয়া লইতেছে। ফ্যানটাইনকে দেখিয়া সে বলিল—"দেখ তোমার সাম্‌নের দাঁত দু'টো দাও ত দু' নেপোলিয়ান দেবো।

"সর্ব্বনাশ! বলে কি?" বলিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ফ্যান পলাইয়া আসিল।

এক বৃদ্ধা কাছে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল—"আ মর! কি বোকা ছুঁড়ি। এমন সুবিধেও ছাড়ে?"

ফ্যান আর সেখানে দাঁড়াইল না। বাসায় ফিরিয়া গৃহ-স্বামিনীর কাছে গিয়া সে গল্প করিল।

"কত দেবে বল্‌ছিল?"

"দু' নেপোলিয়ান।"

"তার মানে, চল্লিশ ফ্রাঙ্ক?"

"হাঁ, চল্লিশ ফ্রাঙ্ক!" বলিয়াই ফ্যানটাইন নীরব হইল। সন্ধ্যার সময় সেলাই লইয়া বসিল, কিন্তু কাজে তার মন লাগিতেছিল না। খানিকক্ষণ পর সেলাইয়ের বাক্স তুলিয়া রাখিয়া গৃহস্বামিনীর কাছে আসিয়া সে হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা মিলিয়ারী জ্বর কাকে বলে?"

"সে বড় শক্ত ব্যারাম।"

"তা হ'লে তাতে রীতিমত চিকিৎসার দরকার?"

"নিশ্চয়ই?"

"এ রোগ কি থেকে হয়?"

"তার কোন ঠিক নেই। হঠাৎই হয়।"

"ছেলেদেরও হয়!"

"তাদেরই বেশী হয়।"

"তাতে মরে।"

"প্রায়ই।"

ফ্যানটাইন আর প্রশ্ন করিল না। সেখান হইতে সরিয়া গিয়া সিঁড়ির আলোতে থেনে-ডিয়ারদের পত্রখানা আর একবার পড়িল, তার পর বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পরদিন গৃহস্বামিনী মার্গারিট যখন

ফ্যানটাইনের কক্ষে আসিল, তখন ফ্যানটাইন জড়সড় হইয়া কেদারায় বসিয়া রহিয়াছে, বাতিটা তখনও জ্বলিতেছে। ফ্যানটাইনের মুখ বিবর্ণ, একরাত্রেই যেন তার আরও দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে।

"সে কি ফ্যানটাইন? কি হয়েছে তোমার?"

"কিছু নয়।—ভালই হয়েছে। ঐ দেখ দু' নেপোলিয়ান। মেয়ে আর আমার বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না।"

"কোত্থেকে এ পেলে?"

"পেলাম"—বলিয়া সে মৃদু হাসিল। অতি দুঃখের হাসি। বাতির আলোকে সে মুখ দেখিয়া মার্গারিট শিহরিয়া উঠিল,—ফ্যানটাইনের মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া তখনও ক্ষীণ রক্তধারা গড়াইতেছিল। সে দিনই ফ্যানটাইন সে অর্থ থেনেডিয়ারদের পাঠাইয়া দিল। কসেট সুস্থই ছিল। থেনেডিয়ারেরা টাকা আদায় করিবার জন্য একটা চাল চালিয়াছিল মাত্র।

ফ্যানটাইন জানালা গলাইয়া আয়নাখানা ফেলিয়া দিল,—আর তাহাতে এখন তাহার কি প্রয়োজন?—অনেক দিন হইতেই সে নীচের কক্ষ ত্যাগ করিয়া চিল-কোঠার এক অতি ক্ষুদ্র গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিল। বিছানাপত্র অনেকদিনই গিয়াছিল,—এক ছিন্ন মাদুর আর এক ছিন্ন কন্থা মাত্র পড়িয়া ছিল। স্ত্রীসুলভ লজ্জা ত সে হারাইয়াছিলই,—পরিচ্ছন্নতার ভাবও এখন হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল,—ধূলিধূসরিত, কর্দ্দমলিপ্ত বা মলিন বস্ত্রে এখন সে অনায়াসে পথ দিয়া চলিয়া যাইত,—সে বিষয়ে আর তার এখন দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। তাহার উপর পাওনাদারদিগের তাগিদ, গঞ্জনা এবং ভ্রূকুটি। কত রাত্রি নিদ্রাহীন চক্ষে কাঁদিয়াই সে কাটাইত। দুর্দ্দশার সে গভীর পাথারে সে কূল দেখিতে পাইত না,—বুঝি কূল তার ছিল না! ভ্রূকুটি গঞ্জনা তিরস্কারে নির্য্যাতিত হইয়া ক্রমশঃ সে মরিয়া হইয়া উঠিতেছিল। তার উপর আবার একদিন থেনেডিয়ারেরা ১০০ ফ্রাঙ্ক চাহিয়া বসিল, লিখিল—"তোমার মেয়ে সেরে উঠছে—এ সময় ভাল পথ্য ঔষধ দরকার, টাকা না পেলে তার কিছুই ব্যবস্থা হবে না। টাকা না আসে, মরে যায়, আমরা কিছু জানিনে ইত্যাদি।"

হা ভগবান! সকলে মিলিয়া তাহাকে কি করিতে চায়? "একশত ফ্রাঙ্ক? এক শ' স্যুস কোথায় পাই?—ভাল,—শেষ যা আছে, তাই বিক্রী কর্‌বো।"

—অভাগী ফ্যানটাইন পতিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

ফ্যানটাইনের এই পতনের জন্য দায়ী কে? সমাজ নয় কি? ইহাই সমাজের ক্রীতদাসদাসী-ব্যবসায়। বুঝাইয়া বলিব? সমাজ এখানে ক্রেতা; দাসদাসী—হতভাগ্য মানব; বিক্রেতা—দুঃখ, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, উপেক্ষা; পণ—চিত্তের অশান্তি; একদিকে আত্মা, আর একদিকে একমুষ্টি অন্ন। দুঃখ-দারিদ্র্য হাট সাজাইয়া বসায়, সমাজ খরিদ করে। খৃষ্টের পবিত্র ধর্ম্মানুশাসনে আধুনিক সভ্যতা পরিচালিত; কিন্তু সে অনুশাসন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেই মাত্র তাহা রহিয়া গিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে ক্রীতদাস-ব্যবসায় আজিও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান,—সেটা স্ত্রীলোক-

দের সম্বন্ধে হতভাগিনী পতিতাদের সম্বন্ধে। চঞ্চলতা লালিত্য, সৌন্দর্য্য, মাতৃত্ব এই সকলেরই উপর তাহার প্রভুত্ব,—পুরুষদের শত ধিক্!

নরকের অন্ধকারে আসিয়া যান্টাইন পূর্ব্বের যা কিছু ছিল সবই হারাইয়াছে। পাষাণের ন্যায় সে আজ নীরস, কঠিন, কামনার চেতনা রাগের উন্মাদনা কিছুই তাহার নাই। অর্থের জন্যই তাহার দেহ পণ, সেইটুকু লইয়াই তাহার সম্বন্ধ। একদিন সে অনেক সহ্য করিয়াছে, সব হারাইতে বসিয়া একদিন সে প্রাণ ফাটাইয়া কাঁদাইয়াছে। আজ সে দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ সে সুখে দুঃখে, রাগে অনুরাগে কামনায় উপেক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন। আজ তার ভয় করিবার বা পিছাইবার মত কিছু নাই। আজ সকল ঘনান্ধকার মেঘ তাহার মাথার উপর জমাট বাঁধিয়া বসিয়া, সমুদ্রের সমস্ত বারিরাশি আজ প্রবল উত্তাল তরঙ্গে তাহার উপর দিয়া গর্জ্জিয়া চলিয়াছে। আজ আর তাহার নূতন করিবার কি ভয়?

অন্ততঃ সে নিজে এইরূপ ভাবিত। তবে মানুষ আপনার অদৃষ্ট সম্পূর্ণভাবে কোন দিনই জানিতে পারে না,—জানিতে না পারাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

কিন্তু এই নির্ম্মম ঘটনাবর্ত্তের শেষ কোথায়,—কোথায় এই দুরন্ত ঘাতপ্রতিঘাতের অবসান? কেন এই অদৃষ্টচক্রের এ ভীষণ আবর্ত্তন?

যিনি সকল দুঃখের পার্শ্বে সুখ, সকল অশ্রুর পার্শ্বে একটা উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পান,—তিনিই বুঝি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। তিনি অদ্বিতীয়, সনাতন, তিনিই ভগবান।

(৫

অর্দ্ধ-সহর অর্দ্ধ-পল্লীগ্রাম মাত্রেই যেমন একদল যুবক ১৫০০ লিভরের বার্ষিক সঙ্গতি লইয়া দু'লক্ষ ফ্রাঙ্কের অধিকারী সহরের যুবকদিগের মত সমান চাল বজায় রাখিতে চায়, ম—তেও সেইরূপ একদল যুবক ছিল। তাহারা বিলাসী, পরপ্রত্যাশী, অপদার্থ ক্লীব জন্তুবিশেষ, দু'এক বিঘা জমিজমা, যৎসামান্য জ্ঞান, দু'একটা বুক্‌নি, ইহাই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অথচ মুখে সর্ব্বদাই 'আমার জমি', 'আমার জমা', 'আমার প্রজা' ইত্যাদি বুলি, তাহারা ভদ্রসভায় ভাঁড়, শৌণ্ডিকালয়ে বাবু, তাহারা থিয়েটারে অভিনেত্রীকে টিটকারী দেয়, কেননা তাহারা সমজদার ভদ্র, সৈনিকাবাসের লোকেদের সহিত ঝগড়া করে—যেহেতু তাহারা বীর, তাহারা শিকার করে, চুরুট ফুঁকে, বোতল টানে, নস্য নেয়, বিলিয়ার্ড খেলে, আরোহী গাড়ী হইতে নামিলে হাঁ করিয়া তাহার প্রতি চায়, হোটেলে বাস করে, সরাইখানায় ভোজন করে, কুকুর পোষে, স্ত্রীলোক রাখে, তারা এক পয়সার মা বাপ, তারা ফ্যাসনের বাড়াবাড়ি করে, বিয়োগান্ত নাটকে আত্মহারা হয়, স্ত্রীলোক দেখিয়া উপেক্ষার ভাব দেখায়, পুরাতন জুতা পরিয়া পরিয়া পায়ে ঘাঁটা পড়ায়, লণ্ডন প্যারিসের ফ্যাসনের অনুসরণ করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নিরেট মূর্খ হইয়া দাঁড়ায়; কোন কাজকর্ম্মেই তাহারা পটু হয় না; লোকের ভালও করে না, তবে তেমন ক্ষতিও করে না।

তাহারা সর্ব্বদাই নিশ্চেষ্ট, অলস; তাহাদের কেহ কেহ অপরের চক্ষুশূল, কেহ বা কাল্পনিক, কেহ বা শুধু বহস্তেই কাল কাটায়। মুসিয়ে ব্যামাটাবুয়ে এই ধরণের যুবক ছিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সে, ফ্যাসনানুযায়ী লম্বা কোট গায়ে আঁটিয়া, হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুরট টানিতেছিল। চুরুট টানাটা তখন একটা ফ্যাসনের মধ্যে পরিগণিত হইত); আর মধ্যে মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করিয়া "এস কি সাজ সেজে যাও কেন, চাঁদ" "বলিহারি রূপ তোমার।" "বাঃ এরি মধ্যে দাঁত যে ঝরেছে দেখছি" ইত্যাদি কতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। স্ত্রীলোকটি অভাগী পতিতাদেরই একজন,—তাহার বেশভূষাও তদনুরূপ। ব্যামাটাবুয়ের সম্মুখ দিয়াই সে যাতায়াত করিতেছিল। কিছুতেই সে কথা কয় না বা ক্রুদ্ধা হয় না দেখিয়া অবশেষে ব্যামাটাবুয়ে একবার নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে আসিয়া পথ হইতে একমুষ্টি বরফ তুলিয়া লইয়া, হঠাৎ তাহার জামার মধ্যে পুরিয়া দিল। অমনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় স্ত্রীলোকটি শিহরিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল; তার পর ব্যাঘ্রীর ন্যায় ব্যামাটাবুয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অকথ্য গালাগালি দিয়া নখাঘাতে তাহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। সে ফ্যানটাইন।

নিমিষের মধ্যেই তাহাদিগকে ঘিরিয়া জনতা জমিয়া গেল। ফ্যানটাইন তখনও ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে লোকটার উপর লাথি মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ করিতেছিল; তার দন্তহীন মুখশ্রী, রক্তবর্ণ মুখখানা দানবীর ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা এক গম্ভীরমূর্ত্তি পুরুষ ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার কোমরবন্ধটা ধরিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"চ মাগী আমার সঙ্গে।" ফ্যানটাইন মুখ তুলিয়া চাহিতেই, নিমেষে তাহার সে উগ্রচণ্ডাভাব লুপ্ত হইয়া গেল। পাংশুবর্ণ মুখে, বাত্যাতাড়িত লতিকাবৎ সে থরথর কম্পিত হইতে লাগিল।—এক দৃষ্টিতেই সে জাভার্টকে চিনিয়াছিল!

ফ্যানটাইন কোন বাধা প্রদান করিল না; সে সাহস তাহার লুপ্ত হইয়াছিল। জাভার্ট তাহাকে টানিতে টানিতে থানায় আনিয়া হাজির করিল। তারপর পকেট হইতে একখানা ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া চার্জ্জ লিখিতে বসিল। ফ্রান্সের আইনে, পতিতাদিগের উপর পুলিশের সর্ব্বতোময় প্রভুত্ব; এ সব ক্ষেত্রে তাহারাই তাহাদের বিচার করে,—তাহারাই দণ্ড দেয়। জাভার্ট গম্ভীরভাবে বিচার করিতে বসিল। ঘটনাটা কি?—একজন ভদ্রবেশধারী, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান। কে করিয়াছে?—একজন সমাজচ্যুতা বারনারী। কে দেখিয়াছে?—জাভার্ট স্বয়ং।—জাভার্ট নিঃশব্দে আপনার রায় লিখিয়া যাইতে লাগিল। লেখা শেষ হইলে তাহাতে নাম সহি করিয়া, একজন সার্জ্জেনকে ডাকিয়া বলিল—"আরও দু'জনকে সঙ্গে করে একে জেলে নিয়ে যাও। এর ছ' মাস কয়েদ।"

"ছ'মাস কয়েদ।" ফ্যানটাইন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"ছ'মাস!—তা হলে কসেটের আমার কি হবে? এখনও যে থেনেডিয়ারের ১০০ ফ্রাঙ্ক পাওনা!" ফ্যানটাইন জাভার্টের

পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই দারোগা সাহেব, আমার কোন অপরাধ ছিল না। আমি তার কাছে কোন দোষ করিনি, তবু সে এই দারুণ শীতে আমার পিটে বরফ গুঁজে দিলে কেন? তাতেই ত আমার মাথায় রক্ত চন্‌চন্ করে উঠল। তার পর সে কত ঠাট্টা না করছিল—তবুও আমি একটা কথাও বলিনি। দারোগা সাহেব, তোমার বড় দয়া আমি জানি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব। দোহাই বাবা আমায় ফাটক দিয়ো না, তুমি থেনেডিয়ারদের চেনো না। আমার সে ছোট মেয়ে, টাকা না পেলে, তাকে তারা এই শীতে দূর করে দেবে,—না খেতে পেয়ে শীতে জমে বাছা আমার মরে যাবে!—আমি স্বভাবমন্দ নই; দুঃখে কষ্টে পরেই আমার আজ এ দুর্গতি, আমায় ছেড়ে দাও।"

গভীরতম দুঃখেশোকে হতভাগ্য মানবের মুখে এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠে; তাহারই ছায়া ফ্যানটাইনের মুখমণ্ডলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অনুনয় অনুরোধ ভিক্ষা—কিছুতেই জাভার্ট টলিল না। তাহার সে আর্ত্তনাদে পাষাণও বুঝি গলিত; কিন্তু জাভার্টের অন্তঃকরণ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায়—সে ত গলে না!

"কেন চেঁচাচ্ছিস মাগী। স্বয়ং ভগবান এলেও তাঁর কথা রাখি নে, তুই ত কোন ছার্। যাও একে সরিয়ে নিয়ে।"

ফ্যানটাইন বুঝিল তাহার আর উদ্ধার নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল; অবসন্নভাবে কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া অভাগী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর!—"

জাভার্ট পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। গোরারা আসিয়া ঝাঁকুনি দিয়া ফ্যানটাইনকে টানিয়া তুলিল। এমন সময় কক্ষের এক প্রান্ত হইতে সহসা কে একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"একটু দাঁড়াও।" আগন্তুক ম্যাডেলিন স্বয়ং; কিছু পূর্ব্বে নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ তিনি সকলের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। জাভার্ট সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"মাপ করবেন, অধ্যক্ষ মশায়!—"

"অধ্যক্ষ মশায়?—" ফ্যানটাইন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় চকিত হইয়া একবার আগন্তুকের প্রতি চাহিল; তার পর, সহসা অমানুষিক শক্তিতে, এক প্রচণ্ড ধাক্কায় গোরাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"ওঃ, তুমিই তা'হলে অধ্যক্ষ মশাই?" বলিয়া "হাঃ হাঃ" করিয়া হাস্য করিয়া উঠিয়া ম্যাডেলিনের মুখে সে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল।

ম্যাডেলিন রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া, ধীর স্বরে বলিলেন—"ইনস্পেক্টর জাভার্ট,—এ স্ত্রীলোকটাকে ছেড়ে দাও।"

জাভার্টের জ্ঞান লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। তাহার বিবেক-বিচারের দ্বারে এমন উপর্য্যুপরি প্রচণ্ড আঘাত সে কখনই পায় নাই। বারনারীর এ ধৃষ্টতা সে যে কখনও কল্পনায় আনিতে পারিত না। একবার সে ভাবিল,—উভয়ের মধ্যে অতীত জীবনের এক অজ্ঞাত গুপ্ত সম্বন্ধ থাকা বুঝি বা বিচিত্র

নয়।—পরক্ষণেই ম্যাডেলিনের ব্যবহারে এবং "এ স্ত্রীলোকটাকে ছেড়ে দাও" এ আদেশে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। ফ্যানটাইনও ততোধিক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল,—তাহার পদতল হইতে ধরণী যেন সরিয়া যাইতেছিল। সে কি?—ম্যাডেলিন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চায়? না, না, তা হইবে কেন? রাক্ষস সে; সেই ত তাহার এ দুর্দ্দশার যত কারণ। পরের লাগানিতে কাণ দিয়ে তাকে পথে দূর করেই ত সে রাক্ষস তার আজ এ দশা করেছে। তার নিজের কি অপরাধ? সমস্ত দিন খাটিয়া ন'স্যুস,—তাহাতে একটা পেটই চলে না, তবে কসেট খায় কি, পরে কি? কাজেই অর্থের জন্য তাহাকে আজ মান সম্ভ্রম, লজ্জা, স্ত্রীধর্ম্ম সবই জলাঞ্জলি দিয়া নরকের পথে দাঁড়াইতে হইয়াছে। তার আজ এত দয়া যে, তাহাকে সে মুক্তি দিবে? হাঃ হাঃ। না, না, জাভার্ট তাকে মুক্তি দিয়েছে, জাভার্ট বড় ভাল লোক।—"হাঃ হাঃ কেমন থুতু দিয়েছি, বদমাইস। উঃ, আমাকে এখানে ভয় দেখাতে এসেছেন? তোর ভয় কি করি রে? আমি জাভার্টকে ভয় করি। জাভার্টের কত দয়া, সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে; নয় জাভার্ট?"—ফ্যানটাইন সহসা কাসিতে আরম্ভ করিল। এই কাসিই তাহার কাল হইয়াছিল। অগ্নিগোলকের ন্যায় সর্ব্বদাই কি যেন একটা তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া ছিল। কাসির বেগ হ্রাস হইলে, বস্ত্রাদি ভাল করিয়া পরিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মৃদু হাসিয়া প্রহরীদিগকে সে বলিল—"দারোগা সাহেব বলেছেন আমায় ছেড়ে দিতে। তাই আমি যাচ্ছি, বুঝ্‌লে?" ফ্যানটাইন নিজেই দ্বার উন্মুক্ত করিল। আর এক মুহূর্ত্ত—তাহা হইলেই সে রাস্তায় গিয়া পড়ে,—সহসা জাভার্টের লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। জ্বালাময় তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, বজ্রগম্ভীর স্বরে সে হাঁকিল—"সার্জ্জেণ্ট! দেখ্‌ছ না আসামী পালায়,—কে তোমাদের ওকে ছাড়তে বললে?"

"আমি।"

চোর যেমন ধরা পড়িয়া অপহৃত দ্রব্যাদি ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ জাভার্টের সে কঠোর স্বরে চকিতা হইয়া, ফ্যানটাইন সভয়ে দ্বারপথ হইতে কয়েকপদ পিছাইয়া আসিল। তার পর ম্যাডেলিনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে পুনরায় ফিরিয়া চাহিল। তার পর সমস্তক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কখনও বা ম্যাডেলিন কখনও বা জাভার্টের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ঘটনাচক্রের অভূতপূর্ব্ব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া জাভার্টের বুঝি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছিল। নতুবা সে ওরূপভাবে হুকুম চালাইবে কেন? ম্যাডেলিন সেখানে আছেন সে কি ভুলিয়া গিয়াছিল? না সে ভাবিয়াছিল যে তাঁহার পক্ষে সেরূপ অদ্ভুত হুকুম দেওয়া সম্ভবপর নয়? নিশ্চয়ই এক আদেশ দিতে গিয়া অন্য আদেশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে? না, সে ভাবিয়াছিল যে, এক্ষেত্রে ছোটকেই বড় হইতে হইবে, টিকটিকিকে হাকিম এবং দারোগাকে জজসাহেবে রূপান্তরিত হইতে হইবে; যে এই ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া, আদেশনিয়ম, আইনকানুন, নীতিজ্ঞান, শাসনতন্ত্র, এবং সমগ্র সমাজ এক তাহাতেই

আসিয়া বর্ত্তাইয়াছে। তাই ম্যাডেলিনের সে গভীর উত্তর "আমি" শুনিয়াও সে টলিল না; অদৃশ্য এক কম্পনে তাহার সমস্ত শরীর টলিতেছিল; সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল; পাংশুবর্ণ ওষ্ঠে, অবনত মস্তকে অথচ দৃঢ়স্বরে সে উত্তর করিল—"অধ্যক্ষ মশায়, তা হতে পারে না।"

"কেন?"

"এ মেয়েটা একজন ভদ্রলোককে অপমান করেছে।"

ম্যাডেলিন ধীর স্বরে জাভার্টকে বুঝাইয়া বলিলেন- "দেখ, তুমি ধর্ম্মভীরু আমি তা জানি, তাই বলছি যে আমি এ ঘটনার সত্যাসত্য সব জেনে এসেছি স্ব লোকটি বাস্তবিকই নির্দ্দোষী। সেই লোকটাই প্রকৃত অপরাধী; তাকেই তোমার ধরা উচিত ছিল।"

জাভার্ট দমিল না। "তার পর, মাগীটা নগরাধ্যক্ষ মহাশয়ের অপমান করেছে।"

"সে অপমান ত আমার? আমি যদি সেটা উপেক্ষাই করি?"

"মাপ করবেন—সে বিচারের অধিকারী আপনি নন, দেশের আইন।"

"দেখ, বিবেকই সব চেয়ে বড় বিচারক। আমি মেয়েটার সব কথা নিজের কাণে শুনেছি। আমি যা করছি, বিচার করেই করছি।"

"কিন্তু এও কি সম্ভব? আমি যে আমার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছি নে!—"

"ভাল, তবে শুধু হুকুমপালনই করে যাও।"

"আমি আমার কর্ত্তব্যেরই হুকুম পালন করে থাকি। আমার কর্ত্তব্য বলে,—এ ছ'মাস ফাটক খাটুক।"

"ছ'মাস ছেড়ে, একদিনও না।"—ম্যাডেলিনের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক মৃদু।

এইবার জাভার্ট মুখ তুলিয়া চাহিল। ধীর স্বরে অথচ গভীর সম্ভ্রমের সহিত সে বলিল—"আমি আজ এই প্রথম আপনার অবাধ্য হচ্ছি,—আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু আইন অনুসারে এ ব্যাপারটায় পুলিশেরই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। আমি যতদূর দেখেছি জেনেছি, তাতে মেয়েটারই সব দোষ। তাই আমি একে ছাড়তে পারব নে।"

"এটা মিউনিসিপাল আইনের অন্তর্গত। তার ৯।১১।১৫ এবং ৬৬ ধারার মতে আমিই এসব ক্ষেত্রে বিচারকর্ত্তা। আমার আদেশে একে মুক্তি দাও।" ম্যাডেলিনের সে গম্ভীর স্বর জাভার্ট কেন, মন্ত্র এ পর্য্যন্ত কেহই শুনে নাই। জাভার্ট তবু কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া ম্যাডেলিন পুনরায় বলিলেন—

"১৭৯৯ সালের, ১৩ই ডিসেম্বরের অন্যায়-অবরোধবিষয়ক আইন বোধ হয় তোমার জানা আছে?"

"আজ্ঞে—"

"বাস্, আর কথা নয়।"

"আজ্ঞে, তবু—"

"চলে যাও তুমি এখান থেকে!—"

সৈনিকের ন্যায় বুক পাতিয়া জাভার্ট সে অপমানবজ্র গ্রহণ করিল; তার পর, নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ফ্যানটাইন বিমূঢ়ার ন্যায় দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া এতক্ষণ পরস্পরবিরোধী সে দুইটী প্রচণ্ড শক্তির সংঘাত-পরিণাম লক্ষ্য করিতেছিল। একজন তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করিতে চায়, একজন তাহার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিতে প্রয়াসী। মুক্তি, স্বাধীনতা, কসেটের সহিত পুনর্ম্মিলন, আবার সৎভাবে থাকিয়া জীবনযাপন, জীবনের সুখ, ভবিষ্যতের শান্তি—আবার সে সব ফিরিয়া পাইবে? এও কি সম্ভব?—কে তাঁহাকে সে ডালি দিতে চাহিতেছে? ম্যাডেলিন? তাহার দুঃখযন্ত্রণার মূল, তাহার নরকবাসের যমদূত—এই ম্যাডেলিন? এই মাত্র না সে তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়াছে? তবু তাঁর এত দয়া! ম্যাডেলিনের প্রতি তাহার মনোভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে, জাভার্ট যখন লাঞ্ছিত হইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল, তখন আনন্দে, এবং তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ম্যাডেলিন ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"হায় অভাগিনী জননী, অনেক যন্ত্রণা তুমি পেয়েছ। কিন্তু সব কথা তুমি আমায় জানাও নি কেন?—আর তোমায় খেটে খেতে হবে না। তুমি যা বল্‌লে যদি সব সত্য হয়—তবে ভগবানের চক্ষে তুমি কলঙ্কিনী নও। আমার সঙ্গে এস। সৎপথে থেকে তোমার যা খরচপত্র হবে সব আমি দেবো। কসেটকে তোমার কোলে এনে দেবো।"

—এ যে আশার অতীত! এ কি স্বপ্ন না সত্য?—এত সুখ তাহার অদৃষ্টে ছিল! কসেটকে আবার সে বুকে ধরিতে পাইবে, এ নরকারময় জীবন হইতে উদ্ধার পাইবে?—এ সুখ আবেগ সে সহ্য করিতে পারিল না; তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, পা টলিতেছিল,—সহসা নতজানু হইয়া বসিয়া ম্যাডেলিনের দক্ষিণ হস্তখানি তুলিয়া লইয়া গভীর কৃতজ্ঞতাভরে সে তাহাতে চুম্বন করিল। পরক্ষণেই অভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

আফগানজাতির মাতৃভাষা

আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। দুর্দ্ধর্ষ আফগান-বিজেতার হস্তে ভারতের অদৃষ্টনেমি বহুবার আবর্ত্তিত হইয়াছে। কালমাহাত্ম্যে ভারত আফগানের হস্তচ্যুত হইয়াছে, তথাপি আফগান-রাজ্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য, তাহা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক। সুতরাং আফগানিস্থান সম্বন্ধে কোন কথা যে ভারতবাসীর কর্ণে একান্ত সুখোৎপাদন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই প্রবন্ধে আমরা

আফগান-জাতির ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

আফগান-জাতির মাতৃভাষার নাম পস্তু ভাষা। সমগ্র আফগানিস্থানে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে এবং বেলুচিস্থানের কতক অংশে এই ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে। প্রতীচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার উৎপত্তিকাল বিনির্ণয়ে নিযুক্ত হইয়া নানা জনে নানারূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। আফগান-ঐতিহাসিকগণের মতে ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার মধ্যে একতম। তাঁহারা সকলে একবাক্যে মহাপুরুষ সোলেমান বাদসাহের রাজত্বকালে ইহার উৎপত্তিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, প্রাগুক্ত রাজর্ষির প্রধান উজির মনস্বী আসিফ বারখিয়ার অসাধারণ প্রতিভাবলেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কথিত আছে, মহাপুরুষ সোলেমান বাদসাহ এক বিপুল-বিস্তার মহাসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য নানাজাতি, নানাধর্ম্ম ও নানাভাষার এক অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয়-ক্ষেত্র ছিল এবং তদীয় রাজ-দরবারে বিবিধ রাজনৈতিক বিষয়-ব্যাপারের আলোচনা হইত। তাঁহার অমাত্যগণ গোপনীয় রাজকীয় বিষয়াদির আশুনির্ব্বাহ-কল্পে এক নূতন সাঙ্কেতিক ভাষা-সৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। তদনুসারে প্রধান সচিব আসিফের অসামান্য উদ্ভাবনী-শক্তিবলে অচিরে এক নূতন ভাষার উৎপত্তি হইল। রাজকীয় কার্য্য-পরিচালনার্থ সমস্ত হিব্রু-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তাহা সাদরে পরিগৃহীত হইল। এই ভাষাই কালে পস্তু-ভাষা নামে পরিচিত হয়।

এই ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো একটা মত প্রচলিত আছে। অধিকাংশ আফগান-ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, এই ভাষা পূর্ব্বকালে দানব ও দৈত্যগণের কথিত ভাষা ছিল। এ বিষয়ে আফগানিস্থানের জনসাধারণেরও এরূপই প্রতীতি। এই বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে তাহাদের মনে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। বক্ষ্যমান কালে হিব্রু-সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিশ্রুত সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তখন সুখ ও শান্তি বিরাজিত ছিল। পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ অধিকারের পর হিব্রু-সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম অশান্তির সূত্রপাত হইতে থাকে। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় ও রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এই অশান্তি-বীজের মূলোৎপাটনোদ্দেশ্যে হিব্রু-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি অসাধারণ সাহসী ও ভীম-পরাক্রম আফগানা (যিনি আফগানজাতির আদি-পুরুষ) এক বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া দানব ও দৈত্যগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদিষ্ট হন। যাহা অধুনা আফগানিস্থান ও পশ্চিমোত্তর সীমান্ত-প্রদেশ নামে পরিচিত, তত্তৎ পার্ব্বত্যদেশবাসী দুর্দ্দান্ত নরমাংস-খাদক রাক্ষস-সদৃশ বন্য বর্ব্বরগণকেই এখানে দানব ও দৈত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সে কালের কথা দূরে থাকুক, বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতাদীপ্ত সময়েও ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা-সঙ্কুল ভূভাগবাসিগণ অনেক স্থলে সভ্যতা ও

মনুষ্যত্বের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই সুদূর স্মরণাতীত কালে যে তাহারা দানব ও দৈত্য নামে পরিচিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সিন্ধু নদ ও সোলেমান পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী দামান-নামক প্রদেশবাসীদের আজও বিশ্বাস যে, সুদূর অতীতকালে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বোক্ত স্থানের দানব ও দৈত্যগণকে বিতাড়িত করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সেনাপতি আফগানা অভিযানে গমন করিয়া দেশ মধ্যে স্থায়ীভাবে শান্তি-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ব্বরগণকে সমূলোৎখাত করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটী করিলেন না। কিন্তু সেই সমস্ত আদিম অধিবাসিগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাকে সভ্য জাতির বাসোপযোগী করিতে আফগানাকে বহু বর্ষ-ব্যাপী অবিরাম ভীষণ যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। হিব্রু-বিজেতৃগণ এই সকল অসভ্য আদিমজাতীয় লোকদিগকে কতক পরিমাণে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা নিজেরা তাহাদের ভাষার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মানুষের বিনাশ-সাধনে কৃতকার্য্য হইলেও তাঁহারা তাহাদের ভাষার বিলোপ সাধন করিতে পারেন নাই। বিজেতৃগণের মধ্যে যাহারা উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিল, তাহারা সেই অসভ্যদের ব্যবহৃত ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

মাতৃভূমি সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনের সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া হিব্রুজাতীয়গণ প্রথমে নবাধিকৃত সঙ্কট-সঙ্কুল পার্ব্বত্যদেশে বসতি স্থাপন করিতে আদৌ ইচ্ছুক হয় নাই। এজন্য সোলেমান বাদসাহের আমলে তজ্জাতীয় বেশী সংখ্যক লোক উক্ত নবার্জ্জিত প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। রাজর্ষি সোলেমান উক্ত প্রদেশের অতুল ঐশ্বর্য্য ও উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে ফিনিসিয়ান্, ইজিপ্‌সিয়ান্ ও আরবীয়দের মুখে নানা সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার মন তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। রাজনৈতিক হিসাবেও এই স্থান অত্যন্ত মূল্যবান ছিল বলিয়া তিনি তথায় হিব্রু-উপনিবেশ-স্থাপনে এত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমের আধিক্যে হিব্রুজাতীয়গণ প্রথমে তাঁহার এই নীতির অনুমোদন ও অনুসরণ করে নাই। কেবল আফগানার অধীনে যে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাই তথায় উপনিবেশ-স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। এই কারণে সোলেমানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের দিকে রাজ-বৰ্দ্ধন-নীতিরও অবসান হয়। ইহার অনতিদীর্ঘকাল পরে ইস্রায়েল জাতি স্বদেশে এরূপ নানা বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বদেশের বাহিরে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের দিকে মনোযোগ প্রদান করিবার তাহাদের অবসর মাত্র ছিল না। সেই বিপ্লবে তাহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে পরিণত হইল। রাজা নেবুচাড্‌নেজার এরূপ অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে, ইস্রায়েলদের পক্ষে পবিত্র ভূমি প্যালেস্তাইনে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এইরূপে আফগানার অনুচরবর্গ প্যালেস্তাইন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে

স্বল্পসংখ্যক হিব্রুজাতীয় ঔপনিবেশিক আদিম-জাতিদিগের সহিত মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইল; তাহাদের মাতৃভাষা স্বাতন্ত্র্যহারা হইল এবং তৎস্থলে হিব্রু ও আদিমজাতীয়দিগের ভাষার সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। পবিত্রভূমি প্যালেস্তাইন, সিরিয়া ও ইরাক-ই-আরবে ইস্রায়েল জাতিসমূহের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ভীষণ অত্যাচার হইতেছিল, তাহাতে ফলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পূর্ব্বদেশে তাহাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতৃগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। তাহাদের আগমনে শুধু ঔপনিবেশিকগণের দলপুষ্ট হইয়াছিল এমন নয়, তখন হইতে পূর্ব্বোক্ত দানব ও দৈত্যগণের সমূলোৎসাদনও আরম্ভ হইয়াছিল।

এই ভাষার 'পস্তু' নামেই উহার উৎপত্তি সূচিত হইতেছে। 'পস' হইতে 'পস্তু' শব্দের উৎপত্তি। সোলেমান (আফগানদিগের কায়েস-গর) পর্ব্বতে 'পস' নামক এক নগর আছে। আফগানার সুবাদারি সময়ে তিনি এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরের নাম হইতেই আফগানদের অপর নাম 'পস্তন' ও তাহাদের ভাষার নাম 'পস্তু' হইয়াছে।

আধুনিক গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পস্তু ভাষা ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় ভাষা-পরিবারের এক শাখাবিশেষ মাত্র। তাহা হইলেও ইহা যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জেন্দ্ ও পহ্লবী ভাষা হইতে পস্তু-ভাষা শিল্পবিজ্ঞাসম্বন্ধীয় অনেক সংজ্ঞা ও শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। জেন্দ্, পহ্লবী ও সংস্কৃত ভাষা হইতেও অনেক শব্দ পস্তু-ভাষায় পরিগৃহীত হইয়াছে। এই কারণে পস্তু-ভাষাকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষার শাখা বলিয়া কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। সেমিতিক ভাষার সহিত ইহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আর কোন ভাষার সহিত ইহার সেরূপ সম্পর্ক নাই। সেমিতিক ভাষার অনেক বিশেষত্ব পস্তু-ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং এই বিষয়ে পহ্লবী ভাষার সহিতও ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

পহ্লবী ও সংস্কৃত ভাষা হইতে আফগান-দিগের ভাষা অনেক সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গৃহস্থালীর দ্রব্য ও প্রতিদিনকার ব্যবহৃত বস্তুর অনেক নাম হিব্রু ভাষা হইতে পাওয়া গিয়াছে। স্থান, ব্যক্তি ও জাতির নামগুলিও সাধারণতঃ হিব্রু হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। নিম্নে তৎসম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; যথা:—

(১) স্থানের নাম।

হিব্রু	পস্তু
মাগ্রে	মাগ্রেজ
জাব্বক	জাব্বা
গামায়েল	গোমাল
দাবারেহ্	দাবারাহ্
কোহাট	কোহাট

(২) ব্যক্তির নাম।

হিব্রু	পস্তু
গনি	গনি
হেত	হায়াত
আদম	আদম
সালাহ	সালেহ্
হামর	হাম্মর

হিব্রু	পস্তু
তেমর	তেমর
লিয়াহ্	লেয়ো

(৩) প্রত্যেক সম্প্রদায়বাচক শব্দের শেষে 'খেল' ও জাতিবাচক শব্দের শেষে 'জাই' শব্দ থাকে; যথা:—বাহাদুরখেল, আহামদখেল, সরওয়ানখেল, সাদ্দোজাই, বারকজাই, আলিজাই, এয়াকুবজাই ও মুসাজাই ইত্যাদি।

তিনটি বিভিন্ন যুগে আফগানভাষা বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়; যথা:— ১ম যুগ—এই সময়ে উহা একটা প্রাদেশিক ভাষা মাত্র ছিল। ভিন্ন ভাষার কোন শব্দ তখন ইহাতে প্রবেশ লাভ করে নাই। আফগান-ঐতিহাসিকদের কথিত দৈত্য ও দানবেরাই উহা ব্যবহার করিত। উহার শব্দরাশি তখন একান্ত সীমাবদ্ধ অবিমিশ্র ছিল। কারণ তদ্ভাষাভাষী নরমাংস-খাদকদের প্রয়োজন ও অভাব তখন যৎসামান্য ছিল।

২য় যুগ—আফগানা কর্তৃক কায়েসগর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ২য় যুগ আরম্ভ হয়। এই সময়ে হিব্রু ভাষার শব্দসমূহ ইহাতে লব্ধপ্রবেশ হয়। স্থান, ব্যক্তি ও জাতির নামবাচক শব্দ সকল সাধারণতঃ হিব্রুভাষা হইতেই গৃহীত হয়।

৩য় যুগ—এই যুগে পারস্য, সংস্কৃত ও আরবী ভাষার শব্দাদি আফগান ভাষার সহিত মিশ্রিত হয়। বোধ হয় যে, আফগানেরা এই সময়েই কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি এবং অধিকৃত দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসীদের বিলোপই সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে এই নূতন পরিবর্ত্তন-সাধনের কারণ ছিল। তাহাদের পবিত্র জন্মভূমি প্যালেস্তাইন হইতে বহুদিনব্যাপী বিচ্ছেদ,—সর্ব্বোপরি অধিকৃত প্রদেশে তাহাদের রাজোচিত আধিপত্য ও লুণ্ঠনস্বভাববশতঃ তাহারা এতদিন কৃষিকর্ম্ম এবং হিব্রুজাতীয় লোকদিগের ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্র-সমূহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে যখন তাহারা নূতন ভাবে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল, তখন সংস্কৃত ভাষা হইতে তাহাদিগকে কৃষিবিষয়ক শব্দাদিও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

পস্তু আর সেমিতিক ভাষা যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহা অবিসংবাদিত। উভয় ভাষার সাদৃশ্যমূলক কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

(ক) হিব্রু, আরবী এবং সেমিতিক ভাষার অন্তর্গত অন্যান্য ভাষার মত পস্তু-ভাষায় ২টি মাত্র (পুং ও স্ত্রী) লিঙ্গ বিদ্যমান। পস্তু-ভাষায় পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে সাধারণতঃ আরবি 'হায় মুখতাফি' অক্ষর যোগে স্ত্রীলিঙ্গ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই শব্দ হিব্রু, আরবী ও চালডেইক ভাষায়ও স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়। যথা—পুংলিঙ্গ উব্নন্ (উষ্ট্র), স্ত্রীলিঙ্গ উব্নাহ্ (উষ্ট্রী); পুংলিঙ্গ চর্গ্ (কুক্কুট), স্ত্রীলিঙ্গ চরগাহ্ (কুক্কুটী)।

(খ) বিশুদ্ধ পস্তু-অক্ষর-সংখ্যা অতি কম এবং চালডেইক, হিব্রু, কুফী, আর্ম্মেণী ও সেমিতিক ভাষার অন্তর্গত অন্যান্য অনেক ভাষায় তাহাদের সদৃশ অক্ষর বর্ত্তমান আছে।

(গ) আফগান, ইহুদী, আরবীয় এবং ইজিপ্সিয়ানগণ জোয়াদ, হে ও ছে এই তিনটি অক্ষরের কঠিন উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পারসিকগণ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

(ঘ) পস্তু-ভাষার স্বরবর্ণগুলির সহিত হিব্রু, আরবী এবং অন্যান্য সেমিতিক ভাষার স্বরবর্ণগুলির নিকট সাদৃশ্য আছে।

(ঙ) হিব্রু, আরবী ও পারসী ভাষার মত পস্তু-ভাষায় সংযোজ্য ও বিযোজ্য সর্ব্বনাম আছে।

(চ) পস্তু-ক্রিয়াগুলির রূপ হিব্রু ও আরবী ভাষার ক্রিয়ার অনুরূপ এবং তাহাতে দুইটি মাত্র কাল (Past and Aorist) আছে।

(ছ) পস্তু-ভাষা পহ্লবী-ভাষার একমাত্র সম্বন্ধবাচক সর্ব্বনাম (খে) এবং হিব্রু হইতে আক্ নামক অব্যয় গ্রহণ করিয়াছে।

জেন্দ্, হিব্রু ও পহ্লবী ভাষা হইতে অনেক শব্দ পস্তু-ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক পারস্য-ভাষার নিকটও ইহা সামান্য ঋণী নহে। এই কারণেই প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ পস্তু-ভাষাকে পারস্য-ভাষার শাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। তবে শুধু বাহ্য চক্ষে দেখিতে গেলে এরূপ অনুমান করা যায় বটে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মত-ভেদ থাকিলেও আফগান ঐতিহাসিকদের মত অভ্রান্ত ও সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য।

এই ভাষার প্রাথমিক ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পস্তু ভাষার যে নিজের অক্ষর ছিল না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। ইহার বর্ণমালাও ইহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে। আফগান লেখক-গণ বলেন যে, মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে তাঁহাদের মাতৃভাষা একটা কথ্য প্রাদেশিক ভাষা মাত্র ছিল। লেখাপড়ার কার্য্যে আফ্‌গানেরা যে পারস্য-ভাষার অধ্যয়ন ও ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। পারস্য-ভাষার মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে আফগান শাসকগণ এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা উক্ত ভাষাকে আদালতী ভাষারূপে গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। পারস্য-ভাষায় শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যলাভ করা তৎকালে একটা প্রশংসার কার্য্য ছিল,—'ফেসান'ও ছিল বটে। পস্তু-কবিতা-নিচয়ের মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত সরল ও সুন্দর, সেগুলি প্রাগৈস্লামিক কালের। সেই কালের যুদ্ধসম্বন্ধীয় গানগুলি অত্যন্ত উদ্দীপনামূলক ও উৎসাহবৰ্দ্ধক।

ইতিহাসে এ কথা সুবিদিত যে, গজনীর সুলতান মাহ্মুদ এবং তদীয় পিতা আফগান-দিগের অস্ত্রবলেই রাজত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা-লাভ একরূপ অসম্ভব ছিল। এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ গজনীবংশীয় রাজগণ আফগান-দিগকে মুক্ত হস্তে সহায়তা করিতেন। তাহাদের কথ্য ভাষাও উক্ত সুলতানের নিকট অতি উৎসাহসূচক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, সুলতান তদীয় সুযোগ্য প্রধান উজীর হাসন মাইমন্দিকে উক্ত ভাষা বর্ণ-মালায় গ্রথিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষায় কিরূপে পরিণত করা যায়, তাহাই হাসনের প্রধান চেষ্টা হইল। এই সচিব-প্রবরের তত্ত্বাবধানে কাজী নছরুল্লা নামক জনৈক কৃতী পুরুষ নস্‌খ্ অক্ষরে উহা বর্ণমালাগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। বর্ণ-মালার প্রথম গঠন কালে উহাতে 'ত্তে' অক্ষর ছিল না। সম্ভবতঃ সিন্ধুবাসীদের সহিত আফগানদের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার পরেই এই অক্ষর আফগান-ভাষার বর্ণমালায় প্রবেশ

লাভ করিয়াছে। কান্দাহারবাসী মোল্লা হাসন পস্তু-ভাষায় বাক্য রচনা করিয়া সর্ব্ব-প্রথম জগদ্বাসীকে প্রদর্শন করেন।

পস্তু ভাষার ক্রমোন্নতি বিধানে খৃষ্টান-মিসনারীগণ প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। কাপ্তেন এইচ, জি, র‍্যাভার্টি পস্তু-ইংরাজী অভিধান এবং পস্তু ইংরাজী ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া উহার নিত্যবর্দ্ধমান ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার সাধন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা পস্তু-সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার গ্রন্থাবলীকে কেবল এঙ্গলো-ভারতীয় ছাত্রগণ নহেন, শিক্ষিত আফগানেরাও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন। পস্তু-ভাষা যত দিন বিদ্যমান থাকিবে, লাহোর সেণ্ট্রাল ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক সমসুল-ওলামা কাজী মীর আহামদ সাহ রেজওয়ানী সাহেবের পস্তু ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীও ততদিন ছাত্রসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে থাকবে। আবদুর রহমান নামক জনৈক কবি একজন প্রসিদ্ধ পস্তু-কবি। আফগানের ঘরে ঘরে তাঁহার রচিত 'দেওয়ান' দেখিতে পাওয়া যায় এবং আবালবৃদ্ধবনিতা তৎসমূহ পাঠে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। মোল্লা আবদুল আজিম, খোশাল খান, মোল্লা কাইয়ুম, আবদুল হামিদ, নৌরোজ, কুলাচীর হাফিজ আজিম, পির গোলাম ও আয়েন খান প্রভৃতিও পস্তু-ভাষার প্রসিদ্ধ কবি। হাফিজ রহমতউল্লা 'আখওয়ান্নুস্-সফা' এবং হিরাটবাসী মোল্লা আবদুল হাসন 'আনওয়ার-ই-সোহেলী' পস্তু-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পেশোয়ারের মোল্লা আবদুল মজিদ কর্ত্তৃক পস্তুভাষায় কোরাণ সরিফ অনুদিত হইয়াছে। গজনীর মোল্লা আবদুল্লার কৃত 'তফ্‌সির-ই-হোসাইরি'র পস্তু অনুবাদ এবং মৌলবী মোহাম্মদ আলীর 'তফসির-ই এয়াসির' অতি প্রকাণ্ডকায় ও বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। চরসাদ্দার খান গোলাম মোহাম্মদ খাঁর কৃত 'মোসাদ্দস-ই-হালী'র পস্তু-অনুবাদ আফগান পাঠকদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সামান্ত প্রদেশের লোক-প্রিয় চিফ কমিশনার মাননীয় স্যার জর্জ্জ রুজ কেপেল মহোদয়ের রচিত ব্যাকরণ আফগান-জাতির মাতৃভাষার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে নবাব হাফিজ মহব্বত খাঁর 'রিয়াজ-উল্-মহব্বত' এবং নবাব আল্লা এয়ার খাঁর 'আজায়েব-উল লোগাত' পস্তু-সাহিত্যে অতি মূল্যবান গ্রন্থ। খৃষ্টীয় মিশনারী সোসাইটীর কাজি খায়েরউল্লাও পস্তু-ভাষার উন্নতিসাধনে অল্প চেষ্টা করেন নাই, তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদন দ্বারা পস্তু-ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। পেশোয়ার জেলার সর্খ্ ঢেরির প্রসিদ্ধ মিঞা-পরিবার যেন কলিকাতার ঠাকুর-পরিবার। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই একান্ত সাহিত্য-গতপ্রাণ এবং অনেক মূল্যবান ও উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া পস্তু-সাহিত্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্যও এই পরিবার যথেষ্ট করিয়াছেন। মিঞা ইনওয়ামুদ্দিন কাকাখেল কৃত 'নাসায়ে-ই-ইন্‌ওয়ান' এবং মিঞা নাজির আহামদ খাঁ কাকাখেল রচিত 'নাজির-উল-আখলাক' অতি প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বজনাদৃত গ্রন্থ। মিঞা

নোমানউদ্দিনের 'জাফরুন্ নিসা' ও তদীয় বিদুষী স্ত্রীর রচিত 'জিন্নাত-উন্-নিসা'ও অতি প্রসিদ্ধ ও বহুজন-পঠিত গ্রন্থ। মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ খাঁ কর্ত্তৃক 'তন্‌বাত-অন্-নাসুহ্' নামক গ্রন্থের উৎকৃষ্ট পদ্য-অনুবাদের স্বতন্ত্র প্রশংসা অনাবশ্যক।

আবদুল করিম।

উৎসর্গ।

জগতের যত শোভা, যত হাসি, যত গান,
সকলি তোমাতে আছে, তুমি সবে দিলে প্রাণ!
মোর হৃদয়ের শুধু ছোট ছোট গানগুলি,
তুমি কি—তুমি কি দেবী, আদরে নিবে না তুলি'?

নাহি থাক্ ভাব ভাষা, নাহি থাক্ কোন সুর,
আকুল সাধনা সাধ তবু তায় ভরপূর!
তুমি প্রিয় সুধাকর উদিয়াছ চিদাকাশে,
শত শতদল এ যে ফুটে উঠে তব আশে!

আমার মনের কথা কে আর বুঝিবে ভালো,
কে আর আঁধার ঘরে নিয়ত জ্বালিবে আলো?
আমার ধ্যানের দেবী, আমার প্রেমের রাণী,
আমার সর্ব্বস্ব তাই তোমারে দিতেছি আনি'!

ভকতের পূজা লও হোক্ অশ্রু এক টুক্,—
তোমারই দান এ যে বিরহে মিলন সুখ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

ষড়বিংশ অধ্যায়

রূপসনাতন উদ্ধার, কাশীবাসী বৈষ্ণবকরণ ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

গৌর রামকেলি হইতে প্রস্থান করিবামাত্র রূপ ও সনাতন বিষয় ত্যাগ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি পুরশ্চরণ করাইলেন। অনন্তর দশ সহস্র মুদ্রা সনাতনের জন্য গৌড়ের এক বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া রূপ অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি সহ স্বীয় পল্লীভবনে গমন করিলেন। এই সমস্ত ধনের অৰ্দ্ধেকাংশ তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। চতুর্থাংশ কুটুম্বদিগকে দান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। অচিরেই সংবাদ আসিল গৌর নীলাচলে পৌঁছিয়াছেন। নীলাচল হইতে গৌর বৃন্দাবন গমন করিলে সেই সংবাদ তাঁহাকে আনিয়া দিবার জন্য রূপ দুইজন বিশ্বস্ত লোককে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। এদিকে সনাতন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "রাজার প্রীতিই আমার বন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে। কোনরূপে রাজাকে রুষ্ট করিতে পারিলেই—আমার মঙ্গল; নতুবা অব্যাহতির দ্বিতীয় উপায় নাই।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সনাতন পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় গমন বন্ধ করিলেন এবং গৃহে বসিয়া পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাদসাহ তাঁহার পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় চিকিৎসককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজবৈদ্য সনাতনের শরীরে কোনও পীড়ার লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বাদশাহকে সবিশেষ জানাইলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে বাদশাহ স্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত-চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। বাদশাহ কহিলেন "সনাতন, বৈদ্যের নিকট জানিলাম তোমার কোনও ব্যাধি নাই; তবে রাজকার্য্য ছাড়িয়া রহিয়াছ কেন? আমার যাহা কিছু সব তোমাকে লইয়া, তুমি জান; তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলে, আমার সবই যে নষ্ট হইবে।" সনাতন বিনীতভাবে কহিলেন "জাঁহাপনা, আমা হইতে

আর কোনও কাজ হইবার আশা নাই; আমার স্থলে অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।" বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "তোমার জ্যেষ্ঠ রূপ, দস্যুর মত জীবপশু সমস্ত নষ্ট করিয়া আমার চাকলার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল, আর এখানে বসিয়া থাকিয়া তুমিও আমার কার্য্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ।" সনাতন স্থিরভাবে কহিলেন "আপনি সর্ব্বশক্তিমান, সমগ্র গৌড়ের অধিপতি; দোষীর দণ্ডবিধান করুন।" গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

ইহার অনতিকাল পরেই উৎকলের রাজার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্কালে বাদশাহ সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন "সনাতন, আমার সঙ্গে চল।" সনাতন দৃঢ়স্বরে কহিলেন "আপনি যাইতেছেন দেবতা-ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিতে, আমি আপনার সহিত যাইতে অক্ষম।" বাদশাহ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিবার অনুমতি দিয়া যুদ্ধে প্রস্থান করিলেন।

যথাকালে প্রেরিত লোকদ্বয়ের মুখে রূপ সংবাদ পাইলেন গৌর বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া কনিষ্ঠ অনুপম (ওরফে বল্লভ) সহ রূপ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে সনাতনকে লিখিয়া গেলেন "আমরা দুইজন বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম, তুমি যেরূপে পার পলায়ন করিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও। বাণিয়ার নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজন হয় গ্রহণ করিও।" ভ্রাতার পত্র পাইয়া সনাতন বাদশাহের অনুপস্থিতিকালে কারারক্ষককে সাত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। কারারক্ষক তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া ছাড়িয়া দিল। ভৃত্য ঈশান তাঁহার সঙ্গে চলিল। দিবারাত্রি পথ বাহিয়া অবশেষে তাঁহারা পাতড়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। তথায় এক ভুঁইয়ার নিকট গমন করিয়া সনাতন তাহাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভুঁইয়ার নিকট একজন গণৎকার ছিল। তাহার নিকট ভুঁইয়া অবগত হইল সনাতনের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা আছে। স্বর্ণমুদ্রার লোভে ভুঁইয়া পরম যত্নে সনাতনের বন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। তাহার অত্যধিক আদরে ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রীর মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে কি না? ঈশান একটী মোহরের কথা গোপন করিয়া তাঁহাকে সাতটী মোহরের কথা বলিল। সনাতন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া সাতটী মোহর লইয়া ভুঁইয়াকে তাহা প্রদানপূর্ব্বক ঘাঁটি পার করিয়া দিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। ভুঁইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল "মোহরের কথা আমি সমস্তই জানিতাম। তুমি নিজে না দিলে তোমাকে খুন করিয়া আমি মোহর লইতাম। কিন্তু সাতটী নহে—আটটী মোহর তোমার ভৃত্যের অঞ্চলে বাঁধা ছিল। যাহা হউক তোমার ব্যবহারে আমি তুষ্ট হইয়াছি। এ মোহর আমি লইব না। তোমার মত লোককে ঘাঁটি পার করিয়া দিয়া আমি পুণ্য অর্জ্জন করিব।" ভুঁইয়ার অনুগ্রহে সনাতন পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া ঈশানকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন,

সত্যসত্যই আর একটী মোহর আছে। তখন বিরক্ত হইয়া সনাতন ঈশানকে বিদায় দিলেন এবং গাত্রে ছিন্নকন্থা ও হস্তে করোঁয়া লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকান্তের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সনাতন পরদিনই বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে শ্রীকান্ত একখানা মূল্যবান্ ভুটিয়া কম্বল তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

এদিকে গৌর প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত হইল। তাঁহার উদ্বেল প্রেম সমাগত যাবতীয় নরনারীর মধ্যে সংক্রমিত হইয়া পড়িল। কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল কেহ বা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে।

প্রয়াগে পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত গৌরের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গৌর নিভৃতে বসিয়া আছেন, এমন সময় রূপ ও বল্লভ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে উভয়কে গ্রহণ করিয়া সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সনাতনের কারাবরোধের সংবাদ অবগত হইয়া কহিলেন "সনাতন মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অচিরেই তিনি আমার সহিত মিলিত হইবেন।"

নিকটস্থ আউলিয়া গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কালে এই বল্লভ ভট্টই বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া বল্লভ ভট্ট গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। রূপ ও বল্লভের সহিত গৌর তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় দূর হইতে ভট্টকে প্রণাম করিলে, ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন বল্লভ ও অনুপম সরিয়া গিয়া কহিলেন "আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না।" গৌরও কহিলেন "ইহাদিগকে স্পর্শ করিও না; তুমি মহা কুলীন ব্রাহ্মণ, ইহারা জাতিতে অতি নীচ।" বল্লভ ভট্ট প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন "যখন ইহাদের রসনায় কৃষ্ণ-নাম অবিরত নৃত্য করিতেছে, তখন জাতিতে হীন হইলেও ইহারা সর্ব্বোত্তম জন।" গৌর এই কথায় প্রীত হইলেন। বল্লভ ভট্ট গৌরের অলৌকিক রূপ ও প্রেম-বাহুল্য দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন এবং গৌরকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। নৌকাপথে গমনকালে গৌর যমুনার শ্যামল জলে প্রেমাবেশে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলে তিনি নাচিতে আরম্ভ করিলেন; নৌকা টলমল করিতে লাগিল, ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। বহু কষ্টে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সংযত করিলেন। গৃহে আনিয়া বল্লভ ভট্ট পরম যত্নে গৌরকে ভোজন করাইলেন এবং নিজে তাঁহার পাদ সংবাহন করিলেন।

ভট্ট গৃহে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক এক বৈষ্ণব গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। বহুক্ষণ তাঁহার সহিত কৃষ্ণ কথালাপের পর গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? পুরীর মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ? বয়সের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ কোন্ বয়স? রসের মধ্যে সার রস কোন্‌টী?" উপাধ্যায় কহিলেন—

"শ্যামমেবপরং রূপং, পুরী মাধুপুরী বরা
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।"

রূপকে লইয়া গৌর নিখিল ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। রামানন্দের সহিত যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল সমস্তই রূপের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার জন্যই রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে গৌর করুণামৃতে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

প্রিয়স্বরূপে, দয়িতস্বরূপে;
প্রেমস্বরূপে, সহজাতিরূপে
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে।

প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজানুরূপ, অভিন্নরূপ, স্ববিলাসরূপ রূপ গোস্বামীতে গৌর নিজশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। গৌর রূপকে কহিলেন "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জীব ধূলিকণা-সদৃশ, অতিক্ষুদ্র। এহেন জীব ও অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে যাঁহারা অভেদ কল্পনা করেন, ঈশ্বর কি, তাঁহারা তাহা জানেন না। এহেন ঈশ্বরের নিকট কেহ কামনা করেন মুক্তি, কেহ ভুক্তি, কেহ সিদ্ধি। কিন্তু এতাদৃশ সকাম ভক্তের পক্ষে শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—তাঁহার কামনা কিছুই নাই। তিনিই শান্তির অধিকারী। যদি কোনও ভাগ্যবান জীব কৃষ্ণ ও গুরুর প্রসাদে ভক্তিলতার সামান্য একটু বীজ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল দ্বারা নিয়ত সেই বীজকে সিক্ত রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, বিরজা-লোক ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে ও তৎপরে তদুপরিস্থ গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং প্রেমরূপ ফল প্রসব করে। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলের অভাবে এই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পায় না। পরন্তু বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরে যদি বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তীর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে অঙ্কুরিত লতা সেই হস্তীকর্ত্তৃক সমূলে উৎপাটিত হয়। ভক্তি লতার শত্রু অনেক। ভুক্তি, মুক্তি, প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা প্রভৃতি অসংখ্য উপশাখার উদ্গম হইয়া মূল-শাখার বৃদ্ধির প্রতিরোধ করে। এই সমস্ত উপশাখা ছেদন না করিলে মূল-শাখা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় না।

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, জ্ঞান, কর্ম্ম সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধা-ভক্তি বলে, এই শুদ্ধা-ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়। জাহ্নবী যেমন কামনাবিরহিত হইয়া সাগর সঙ্গমে প্রধাবিত, তেমন নির্গুণ ভক্তিযোগের অধিকারীর চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত প্রীতিবশতঃ ফলানুসন্ধানশূন্য হইয়া অব্যবহিত ভাবে তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়। ভক্ত ভগবৎসেবা ভিন্ন আর কিছুরই কামনা করেন না। সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা একত্ব প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহারূপিণী পিশাচী হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিতে তথায় ভক্তি সুখের উদয় হইতে পারে না। ভক্তির সাধন করিতে করিতে রতির উদ্ভব হয়। রতি যখন গাঢ়

হয়, তখনই তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। একই ইক্ষুরস যেমন গুড়, খণ্ড, চিনি, মিছরী প্রভৃতি বিবিধ সুমিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়, তেমনি একই প্রেম অবস্থাভেদে উপরোক্ত ভাবসমূহে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভক্তিরসরূপ এই সকল ভাব স্থায়ী হইলেও অনেক সময় ইহাদিগের সহিত অস্থায়ী ভাবেরও মিলন ঘটে। দধি, শর্করা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ মিলিত হইয়া যেমন অপূর্ব্ব রসাল খাদ্যের উৎপত্তি করে, তেমনি স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাব মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুরভাব সৃষ্টি করে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার। এই পঞ্চ রতির অনুরূপ কৃষ্ণভক্তি-রসও পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এই পঞ্চই প্রধান। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়, এই সাতটী গৌণ রস; ভক্ত-ভেদে ইহাদের উৎপত্তি। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রস মুখ্য ও স্থায়ী; শেষোক্ত সপ্ত রস গৌণ ও আগন্তুক। সনকাদি ঋষিগণ শান্ত-ভক্ত; দাস্য-ভক্ত সর্ব্বত্র সুলভ; শ্রীদাম প্রভৃতি ও ভীমার্জ্জুন সখ্য-ভক্ত; নন্দ, যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভক্ত; ব্রজগোপীগণ মধুররস-ভক্ত। কৃষ্ণ-রতি দ্বিবিধ,—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠেশ্বরে রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা; গোকুলে রতি কেবলা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়; কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও গ্রাহ্য করে না। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে উভয়ের মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল; অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে রুক্মিণীকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন, তাহাতেই রুক্মিণীর ত্রাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু শুদ্ধা-কেবলা রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না, থাকে কেবল শুদ্ধ প্রেম। যশোদা নরদেহধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে পুত্রজ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। গোপী কৃষ্ণকে গর্ব্বিত স্বরে বলিয়াছিলেন "আমি আর চলিতে পারিতেছি না; আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল।"

ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধিই শম-নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম; দুঃখ-সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা এবং রসনা ও উপস্থের বশীকরণকে ধৃতি কহে। তৃষ্ণাত্যাগ শমের কার্য্য, কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক সকলই তুল্য চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। কৃষ্ণভক্ত যিনি তিনি শান্ত। তৃষ্ণা-ত্যাগ ও কৃষ্ণে নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তের এই দুই গুণ। আকাশের গুণ শব্দ যেমন তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক ভূতেই আছে, শান্তরসের এই দুই গুণও তেমনি পরবর্ত্তী সমস্ত রসেই বর্ত্তমান। কিন্তু শান্তরসে কেবল পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানই সম্ভবপর; লীলাময় রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দাস্যরতিতে বাসনা-ত্যাগ ও একাগ্রতা আছে, তদুপরি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানজনিত সম্ভ্রম ও সেবা আছে। সখ্যরসে শান্তের দুই গুণ ও দাস্যের সেবা আছে; দাস্যের সম্ভ্রম, গৌরব ও সেবা সকলই আছে—কিন্তু তাহারা বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রেমে পরিণত হয়। সখ্য বিশ্রম্ভপ্রধান ও

গৌরব-সম্ভ্রমবিহীন। সখ্যরসে কৃষ্ণে আত্মসমজ্ঞান জন্মে। বাৎসল্যে শান্তরসের কৃষ্ণানুরাগ ও তৃষ্ণাত্যাগ ব্যতীত দাস্যের সেবা আছে। সে সেবা বাৎসল্যে পালন নামে অভিহিত। মধুর রসে কৃষ্ণে অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ ভিন্ন, সেবার অত্যাধিক্য বর্ত্তমান। ভক্ত ভগবানকে কান্তজ্ঞানে নিজ অঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। মধুর রসে অন্যান্য যাবতীয় রসের গুণাবলী একত্রিত হইয়াছে। এই মধুর রসের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিও। ইহা ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হইয়া উঠিবেন।” এই বলিয়া গৌর রূপকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে রূপকে বৃন্দাবন গমন করিতে ও তথা হইতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে উপদেশ দিয়া গৌর প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারাণসী-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রশেখর স্বপ্নে গৌরের আগমন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া নগরের বহির্ভাগে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গৌর নগরোপান্তে উপনীত হইলে তাঁহাকে লইয়া চন্দ্রশেখর গৃহে গমন করিলেন।

গৌর যখন বারাণসীধামে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক দিন সনাতন আসিয়া সেই গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। গৌর গৃহমধ্যে ছিলেন; সনাতন গৃহপ্রবেশ না করিয়া নিঃশব্দে দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গৌর জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে কহিলেন “দ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।” চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে বৈষ্ণববেশধারী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়া গৌরকে বলিলেন “কই কোনও বৈষ্ণব ত দেখিতে পাইলাম না।” গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন “দ্বারে কি কেহই নাই?” চন্দ্রশেখর কহিলেন “একজন দরবেশ বসিয়া আছেন।” গৌর কহিলেন “তাহাকেই আনয়ন কর।” চন্দ্রশেখর দরবেশবেশী সনাতনকে লইয়া গৌরের সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। সনাতনকে অঙ্গনে দেখিবামাত্রই গৌর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রেমবিহ্বল সনাতন গদগদ কণ্ঠে কহিলেন “আমাকে স্পর্শ করিও না, প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিও না।” গৌর তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং স্বীয় হস্তে তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। সনাতন বারংবার বলিতে লাগিলেন “আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিও না—” কিন্তু গৌর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন “তুমি ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। আমি স্বয়ং পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি।” প্রেম-সম্ভাষণের পর গৌর সনাতনের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। সনাতন তাঁহার কারাগার হইতে উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। গৌর রূপ ও অনুপমের সংবাদ সনাতনকে অবগত করাইয়া চন্দ্রশেখরকে তাঁহার ক্ষৌরকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে এবং গঙ্গাস্নানান্তে তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিতে আদেশ করিলেন। ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান-সমাপনান্তে সনাতন গৌরের উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না; পরন্তু তপন মিশ্র-প্রদত্ত

একখানি পুরাতন বস্ত্র দ্বিখণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা কৌপীন প্রস্তুত করিলেন এবং কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভোট-কম্বলখানি ত্যাগ করিলেন না। একদিন গৌর সেই কম্বলের দিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সনাতন বুঝিলেন মূল্যবান্ কম্বল-ব্যবহার প্রভুর অভিপ্রেত নহে। সেই দিন গঙ্গাস্নান-কালে একব্যক্তির ছিন্নকন্থার সহিত কম্বল বিনিময় করিয়া তিনি গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌর সমস্ত শুনিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

কতিপয় দিবস গত হইলে সনাতন বিনীত ভাবে গৌরকে কহিলেন "আমি নীচসংসর্গে বিষয়মত্ত হইয়া জীবন কাটাইয়াছি। যদি কৃপা করিয়া আমাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তবে আমার কর্ত্তব্য আমাকে উপদেশ কর। সাধ্যসাধনতত্ত্ব কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয় তাহাও আমি জানি না। তুমি আপনিই আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেও।" গৌর কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই। পরিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছ। ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে তুমিই যোগ্যপাত্র। আমি ক্রমে ক্রমে সমস্ত তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।" গৌর বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পরমেশ্বর। অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্র শক্তিমত্তাই পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ। একস্থানস্থিত বহ্নির জ্যোৎস্না যেমন বহুদূরে প্রসারিত হয়, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি এই নিখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। পরমেশ্বরের এই স্বরূপ-শক্তি শাস্ত্রে ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিৎশক্তিকে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তিও বলে। জীবশক্তি তটস্থা শক্তি, এবং মায়াশক্তি বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়াও অভিহিত হয়। শক্তি-শব্দের মুখ্যার্থ কার্য্যাক্ষমত্ব। কার্য্য ও কারণ এই দুই অবস্থায় শক্তির অবস্থান। কার্য্যাবস্থায় শক্তিকে বৃত্তি বলে। কারণরূপা ও কার্য্যরূপা শক্তির সাধারণ নাম বৈভব। স্বরূপশক্তি ও তৎকার্য্যকে সাধারণতঃ স্বরূপ-বৈভব, মায়াশক্তি ও তৎকার্য্যকে মায়া-বৈভব এবং তটস্থশক্তি ও তৎকার্য্যকে তটস্থ-বৈভব বলে। উপরোক্ত চিৎশক্তিকে শাস্ত্রকারগণ আবার ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন,—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি পরিণত হইয়াছে। সত্ত্ব, চিত্ত্ব ও আনন্দত্ব এই ত্রিবিধ শক্তির সাধারণ নাম স্বরূপ-শক্তি। সৎস্বরূপ হইয়াও পরমেশ্বর যদ্দ্বারা সত্তা ধারণ ও স্থাপন করেন তাহার নাম সত্ত্ব বা সন্ধিনী শক্তি। স্বয়ং চিৎস্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন ও করান তাহার নাম চিত্ত্ব বা সম্বিৎশক্তি এবং স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন ও করান তাহার নাম আনন্দত্ব বা হ্লাদিনী শক্তি। উক্ত শক্তিত্রয়ের সাধারণ কার্য্য বা বৃত্তির নাম শুদ্ধসত্ত্ব। পরমেশ্বর সজাতীয়াদি ত্রিবিধ-ভেদবিরহিত হইলেও, তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূত সৎ, চিৎ ও আনন্দ সান্ত মানবের নিকট পৃথক পৃথকরূপে প্রতীত হয় এবং তাঁহার অব্যভিচারিণী শক্তি একরূপা হইয়াও অনন্তরূপে

প্রকাশ পায়। এই স্বরূপ-শক্তিকে পরা শক্তি বলে। ইহারই প্রভাবে পরমেশ্বর প্রধানাদি কারণ-তত্ত্ব সকলকে স্বয়ং সর্ব্বথা অস্পৃষ্ট থাকিয়াও স্ববশে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে মহদাদিরূপে পরিণামিত করেন। তিনি এই শক্তির দ্বারা বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং মায়াশক্তি দ্বারা উপাদান-কারণ বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বকারণ-কারণ বলা হইয়াছে। পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থিত বলিয়া জীবশক্তি তটস্থশক্তি বলিয়া অভিহিত। শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি এক নহে। কিন্তু কিরণ ব্যতিরেকে সূর্য্যের সত্তা এবং দাহিকা-শক্তি ব্যতীত অগ্নির সত্তা অসম্ভব। সুতরাং বলিতে হয় সূর্য্য ও কিরণ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি অভিন্ন। পরমেশ্বর ও তাঁহার শক্তি জীবও তেমনি ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। অগ্নির দাহিকাশক্তি এবং সূর্য্য-কিরণ যেমন স্বীয় আশ্রয়ভূত অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, জীবও তেমনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আগন্তুক বা উপাধিক নহে, পরন্তু মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত স্থায়ী। জীব ভগবদ্বিষয়ে নিত্য বহির্ম্মুখ হইয়াই মায়ায় আবদ্ধ হয় এবং বহুকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু যদি সাধু ও শাস্ত্রকৃপায় সে আপনাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারে, তবেই সে উদ্ধার পায়। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি থাকে না। জীবের প্রতি কৃপাবশতঃই কৃষ্ণ বেদ ও পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র ও গুরুর কৃপাতেই জীব মায়ার আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। গুরু দুই প্রকার—দীক্ষা-গুরু এবং শিক্ষা-গুরু। দীক্ষা-গুরু এক, শিক্ষা-গুরু দ্বিবিধ—মহান্ত-গুরু ও চৈত্য-গুরু। ভগবান অন্তর্যামীরূপে জীবের অন্তরে থাকিয়া সদসৎ প্রকাশ করেন। ভগবানই চৈত্য-গুরু। আবার ভক্তশ্রেষ্ঠগণ মহান্তস্বরূপে উপদেশ ও স্বীয় আচরণের আদর্শ দ্বারা ইষ্টপথ দেখাইয়া দেন। বেদে বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণই এই বিষয়—কেননা তিনিই বেদের প্রতিপাদ্য। তদ্বাচ্য-বাচকতারূপে তাঁহারই বিষয়, তৎপ্রাপ্তি-সাধন-রূপে অভিধেয় একমাত্র ভক্তি এবং পরম-পুরুষার্থরূপে তৎপ্রেমলাভই প্রয়োজন। কোনও দরিদ্রের গৃহে এক সর্ব্বজ্ঞ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "তোমার পিতৃধন থাকিতে কেন তুমি দুঃখ পাইতেছ? তুমি অমুক স্থান খনন করিলেই পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সাবধান যে স্থানের কথা আমি বলিতেছি, সেই স্থানই খুঁড়িবে। অন্যথা ভীমরুল, সর্প ও যক্ষ উত্থিত হইয়া তোমার ধনপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা করিবে।" এখানে সর্ব্বজ্ঞের উপদেশের বিষয় যেমন দরিদ্রের পিতৃধন, সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশের "বিষয়"ও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বজ্ঞ যেমন দরিদ্রকে তাহার পিতৃধন-প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছিল, সর্ব্বশাস্ত্রও তেমনি শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বিবৃত করিয়াছেন। এই উপায়—কর্ম্ম ও জ্ঞান বর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা। এই ভক্তিরূপ উপায়ই "অভিধেয়।" দরিদ্রের ধনলাভের প্রয়োজন যেমন তাহার দারিদ্র্যনাশ, তেমনি ভক্তির "প্রয়োজন"ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। প্রেমের ফলের কৃষ্ণাস্বাদ

হইলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু দারিদ্র্যনাশ ও ভব-বন্ধন-ক্ষয় প্রেমের উদ্দেশ্য নহে, প্রেম-সুখভোগই তাহার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু ও উপাস্য, তিনি *অনন্তসিদ্ধ মাধুর্য্যের* আধার। বিশ্বসৃষ্টি-কর্ম্মে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি এবং নব-লীলা পরিপাটীতে তাঁহার মাধুর্য্যের বিকাশ। তিনি অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাতে সজাতীয় বা বিজাতীয় যে সকল তত্ত্ব দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয় সে সমস্তই তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত—তাঁহারই শক্তিপ্রকাশ মাত্র, তিনি স্বয়ং সর্ব্ব-তত্ত্বাত্মক। অবতারগণ তাঁহার অংশমাত্র; জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ। তিনি সর্ব্বাদি ও সর্ব্বাংশী পুরুষ; তিনি সকলের আশ্রয়ভূত; তদ্ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই সত্তা থাকে না; তিনি সর্ব্বেশ্বর; বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় নরলীলাতে তাঁহার নর-বপুই একমাত্র সত্তায়, তিনি কিশোর বয়সে নিত্য অবস্থিত হইলেও, বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সও তাঁহার শ্রীবিগ্রহের ধর্ম্ম। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ; ইহা চিদানন্দময়; জীবের মত দেহ দেহী-ভেদ তাঁহাতে নাই, ভগবান নিজেই নিজের বিগ্রহ। রবি যেমন প্রকাশস্বরূপ হইয়াও ধ্যান-সৌন্দর্য্যার্থ বিগ্রহবান হয়, ভগবানও তদ্রূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইয়াও আত্মস্বরূপ-বিগ্রহ প্রকাশ করেন, অন্যথা জীবের ধ্যান সিদ্ধ হয় না। তিনি উপাসকের যোগ্যতানু-সারে জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগিগণের সম্বন্ধে অন্তর্য্যামিত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারূপে এবং ভক্তগণের নিকট ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ পরমেশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়া জীবের জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-সাধনের যথাযোগ্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিবিশেষ, পরমাত্মা তাঁহার অংশ-বিশেষ। সর্ব্বাবতংস শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মা। তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও এবং তাঁহার বিগ্রহ *এক হইলেও তিনি অনন্তস্বরূপে বিরাজমান।* প্রথমতঃ তিনি স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ—এই তিন রূপে বিরাজিত। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ অর্থাৎ স্বয়ং-প্রকাশ। এই প্রকাশ প্রাভব এবং বৈভব ভেদে দ্বিবিধ। একই বপু যদি বহুরূপে প্রকট হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রাভব প্রকাশ বলে, যেমন রাসমণ্ডলীতে মহিষী বিবাহে হইয়াছিল। সেই বপু যদি আবার পৃথগাকারে প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলে; যথা বৃন্দাবনে বলদেব এবং মথুরাদিতে দেবকীনন্দন। সেই এক বপু কিঞ্চিৎ ভিন্নাকার ধারণ করিয়া ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলে তাঁহাকে তদেকাত্ম রূপ বলে; তাহা দ্বিবিধ, বিলাস ও স্বাংশ। বিলাসও প্রাভব ও বৈভব ভেদে দ্বিবিধ; কিন্তু বিলাসের বিলাস অনন্ত, তন্মধ্যে প্রাভব বিলাস মুখ্যতঃ চতুর্ব্বিধ,—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চতুর্ব্যূহের দ্বারকা ও মথুরা-দিতেই নিত্যবাস এবং ইঁহারাই অনন্ত চতুর্ব্যূহের প্রাকর্ষ্যের নিদান। পরব্যোম-ধামে শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। ইনি আবার চতুষ্পার্শ্বে আবরণরূপে অন্য চতুর্ব্যূহ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার তিন তিন বিলাসমূর্ত্তি আছে। কেবলমাত্র চক্রাদি অস্ত্র-ধারণ ভেদে নাম-ভেদ হইয়াছে, যথা—বাসুদেব, কেশব, নারায়ণ, মাধব, সংকর্ষণ, গোবিন্দ,

বিষ্ণু, মধুসূদন, প্রদ্যুম্ন, ত্রিবিক্রম বামন, শ্রীধর, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম। সংকর্ষণের উপেন্দ্র ও অচ্যুত। প্রদ্যুম্নের নৃসিংহ ও জনার্দ্দন। অনিরুদ্ধের হরি ও কৃষ্ণ। ইহার মধ্যে চতুর্ব্যূহ কৃষ্ণের বিলাস; অন্য বিংশতি জন আবার বিলাসের বিলাস। ঐ বিংশতি জনের মধ্যে যাঁহারা আকারে ও বেশে ভিন্ন তাঁহারাই বৈভব বিলাস। যথা পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, রাম, হরি ও কৃষ্ণাদি। ইঁহারা পরব্যোম-মধ্যস্থ বৈকুণ্ঠধামের অষ্টদিকে তিন তিন জন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম্ম সংস্থাপন ও ভক্ত-রক্ষার নিমিত্ত সময়ে সময়ে প্রাকৃতপ্রপঞ্চে অবস্থান করেন। যথা মথুরায় কেশব, নীলাচলে পুরুষোত্তম, প্রয়াগে মাধব ইত্যাদি। অবতারগণই স্বাংশরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতার পঞ্চবিধ—সংকর্ষণ বা পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার। শ্রীকৃষ্ণই এই সকল অবতারের একমাত্র নিদান। সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে তিনি পুরুষরূপ প্রকাশ করেন। পুরুষরূপ ত্রিবিধ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ইঁহারা সকলেই ক্রিয়াশক্তি-প্রধান, কিন্তু সর্ব্বাধিষ্ঠাতা বাসুদেব জ্ঞানশক্তি-প্রধান এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি-প্রধান। সর্ব্বশক্তির প্রবর্ত্তক এই ত্রিশক্তির সমন্বয়েই বস্তুসৃষ্টির সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুরুষরূপ সংকর্ষণ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা হইয়া চিৎশক্তি দ্বারা গোলোক বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অপ্রাকৃত এবং মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর-শক্তি ভিন্ন জড়প্রকৃতি কোন পদার্থের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিশক্তির সহযোগে ভিন্ন লৌহ কখনও দাহিকাশক্তির অধিকারী হয় না। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ঈশ্বর সৃষ্টিবিষয়ে নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থার নাম যোগ-নিদ্রা। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উদিত হইলে তিনি জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন। যতক্ষণ একাকী থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, ততক্ষণ তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা ও কার্য্যকারণরূপিণী মায়াশক্তিও তাঁহাতেই বিলীন ছিল। সুতরাং প্রলয়কালে জীব ও পরমাত্মা উভয়ে মিলিত ভাবে ছিলেন। সে সময়ে ঈশ্বরের দ্রষ্টা ও দৃশ্যানুসন্ধান ছিল না। দর্শনেচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইলে প্রলয়ে প্রসুপ্ত মায়াশক্তি ঈশ্বরস্বরূপ হইতে পৃথককৃত হয়। সংসার তাপে তাপিত যে সকল জীব বিশ্রাম লাভের জন্য প্রলয়ে ঈশ্বরে বিলীন ছিল, তথনও তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম ও বাসনা বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহাদের মুক্তিলাভ ঘটে নাই। পুনর্ব্বার সৃষ্টিতে তাহাদিগকে মুক্তিলাভের সুযোগ প্রদান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টির ইচ্ছা। এই সময়ে ভগবান প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে বিরজাতে শয়ন করেন, অনন্তর ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করায় গুণত্রয় বিক্ষোভিত হইলে, তাহাতে জীবশক্তিরূপ বীর্য্যাধান করেন। সেই সময়ে প্রকৃতির পরিণাম বা অবস্থান্তর আরব্ধ হয়। মহত্তত্ত্বাদি-ভেদে প্রকৃতির পরিণাম বহুবিধ। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টির পরিণামই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। উহাদের ব্যষ্টির পরিণামের নাম অহঙ্কার। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তামস বা ভূতাদি

অহঙ্কার হইতে আকাশবীজ শব্দ, শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুবীজ স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজের বীজ রূপ, রূপ হইতে তেজ, তেজ হইতে জলের বীজ রস, রস হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর বীজ গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। রাজস বা তৈজস অহঙ্কার হইতে চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও রাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রমে উৎপন্ন হয়। মন যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদিগুণের উপলব্ধি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা উক্তিপ্রভৃতি কর্ম্মসকল সাধিত হয়। সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহংকার হইতে দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও চন্দ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের উৎপত্তি হয়। এই রূপেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই মহৎ স্রষ্টা পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী এবং সমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডগণের অন্তর্য্যামী। বিরজাই কারণাব্ধি, তাহা প্রধান পরব্যোমের মধ্যস্থিত এবং বেদাঙ্গ-স্বেদরূপ জলদ্বারা পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পুরুষ সেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়া নিজাঙ্গ-স্বেদ জলে তাহার অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া স্বয়ং শেষ-শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহারই নাভি-দেশে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক একটী পদ্ম উদ্‌ভূত হয় এবং সেই পদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে সৃষ্টি বিধান করেন। এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্যষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডগণের অন্তর্য্যামী এবং হিরণ্যগর্ভ গর্ভোদক সহস্রশীর্ষাদি নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু পালন-কর্ত্তা ও বিরাট ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী। ইনিই গুণাবতার মধ্যে গণ্য হইবেন। বিরাট পুরুষ দৈবশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিভূত এবং দৈবশক্তি ও জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত পরমাত্মার অংশভূত। যাবতীয় ভূতগণ ইঁহাতেই প্রকাশ পায়। এই বিরাট পুরুষ হইতেই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি। লীলাবতার মৎস্তকূর্ম্মাদি ভেদে অনন্ত। গুণাবতার ত্রিবিধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মত্বলাভ পুণ্যবান জীবের আয়ত্তাধীন। এই ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও প্রতি মন্বন্তরে এক একটী অবতার নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মার পরমায়ুকাল একশত বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগে যুগাবতারও চতুর্ব্বিধ। সত্যে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলিযুগে পীতবর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণ ধারণ করিয়া কলিযুগে নিজ নাম সংকীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া জীবকে প্রেমভক্তি দান করিয়া থাকেন।”

কলিযুগের পীতবর্ণ অবতারের কথা শুনিয়া সনাতন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিনীতভাবে কহিলেন “আমি অতি ক্ষুদ্রজীব, তাহাতে নীচাশয় ও ম্লেচ্ছসঙ্গী; কলির অবতার কে তাহা কেমন করিয়া নিশ্চয় করিব? তুমি দয়া করিয়া বলিয়া দেও।” গৌর কহিলেন “আমাদের মত জীবের শাস্ত্র-বাক্যে ও ঋষিগণের বাক্যেই জ্ঞান জন্মে। অবতার কথনই আমি অবতার এই কথা নিজমুখে বলেন না। যমলার্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন দেহিগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও যিনি দৈহিক ধর্ম্মশূন্য, দেহিগণের পক্ষে অসম্ভব, অনিবার্য্য, অদ্ভুত ও অতুল

পরাক্রম দ্বারাই ভগবানের সেই অবতারকে জানা যায়। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বস্তু চিনিতে হয়। আকৃতি-প্রকৃতিই স্বরূপলক্ষণ; কর্ম্মদ্বারা তটস্থ লক্ষণের জ্ঞান জন্মে। শ্রীমদ্-ভাগবতে আছে—'বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন, যিনি এই দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্, আদিকবি ব্রহ্মাকে যিনি অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণেরও যাঁহাতে পুনঃ পুনঃ মোহ জন্মে, যাঁহাতেই তেজ ও ক্ষিত্যাদি ভূত-গ্রামের বিনিময়, চিৎ-উদয়রূপ সৃষ্টি, জীব-প্রকটরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ যাঁহাতে সত্যরূপে বিদ্যমান, সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহকবর্জ্জিত পরমসত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি।' এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ উভয়েরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে কেহ এই লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারে না। অবতার কালে এই সমস্ত লক্ষণ জগতের গোচর হয়।"

সনাতন কহিলেন "তবে নিশ্চয় করিয়া বল, যাঁহার শরীরে ঈশ্বর-লক্ষণ আছে, যিনি পীতবর্ণ, প্রেমদান ও নাম-সংকীর্ত্তন যাঁহার কার্য্য, কলিযুগে তিনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অবতার।" তখন গৌর কহিলেন "সনাতন, চতুরালি পরিত্যাগ করিয়া আমার কথা শুন। গৌণ ও মুখ্য ভেদে আবার অবতার দ্বিবিধ। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ তিনিই মুখ্য আবেশাবতার। যথা সনক, নারদ, পৃথু, পরশুরাম। আর যাহাতে শক্তির আভাস মাত্র দেখা যায় তাহাকে বিভূতি বলে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে সমস্ত পদার্থ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট, সম্পত্তিশীল ও বলপ্রভাবাদির আধিক্য সমন্বিত, তৎসমস্তই আমার তেজের অংশজাত বিভূতি জানিবে। এখন বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মের বিচার শোন। ভগবানের লীলাচক্র জ্যোতিশ্চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ডে শেষ হইতে না হইতে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে সমুদিত হয়। সুতরাং এই লীলাচক্রের প্রবাহ নিত্য। ভগবানের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর-লীলাও শাস্ত্রে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিশোর-শেখরধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন যখন লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে মাতা পিতা ও ভক্তদিগকে প্রকট করেন; জন্মাদি পরে লীলাক্রমে হয়। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার। গোলোকাখ্য নিত্যধামে রাসাদি অপ্রকট লীলা নিত্যই হইতেছে। যোগমায়া তথায় দাসীর ন্যায় সকল কার্য্য সম্পাদন করে। স্বীয় পিত্রাদি বন্ধুবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ তথায় সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন। তাহার নিম্নদেশে পরব্যোম-ভাবে নারায়ণাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ এক এক বৈকুণ্ঠে প্রতিনিয়ত বিরাজমান। তন্নিম্নে দেবীধাম, তথায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডসকল প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় নিত্য গোলোকধাম প্রপঞ্চে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা প্রকট। তথায় পুতনা-বধাদি প্রকট লীলা প্রকাশিত হয়। এতন্মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশহেতু কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতম এবং শক্তিপ্রকাশের তারতম্যহেতু পুরীদ্বয়ে ও পরব্যোমে যথাক্রমে পূর্ণতর ও

পূর্ণরূপে বিহার করেন। এই সকল ধাম চিদানন্দময় ও নিত্য, শাস্ত্রে ত্রিপাদবিভূতি নামে প্রসিদ্ধ এবং বিবজার পারে অবস্থিত। এই ত্রিপাদ-বিভূতি বাক্যের অগোচর। ব্রহ্মা একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দ্বারবানের নিকট তাঁহার আগমন-সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ ব্রহ্মা? দ্বারবান ব্রহ্মাকে আসিয়া সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। পরে কহিলেন প্রভুকে বল সনকের পিতা চতুর্মুখ আসিয়াছেন। কৃষ্ণকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে দ্বারী ব্রহ্মাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিলে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু, আপনি দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন। আমা বই জগতে ব্রহ্মা আর কে আছে? তখন হাসিয়া কৃষ্ণ ধ্যান করিলেন। তখন অসংখ্য ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও বা লক্ষ মুখ। চতুরানন দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অবর্ণনীয়। তাঁহার মনোমোহন রূপ। তাহাতে তিনি আপনিই মুগ্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য নারায়ণে নাই। নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী পতিব্রতাগণের উপাস্যা। তিনিও এই মাধুর্য্যলোভে তপস্যা করিয়াছিলেন। কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান ও ধ্যান দ্বারা এই মাধুর্য্যাস্বাদ উপলব্ধ হয় না। রাগমার্গে কৃষ্ণকে ভজনা করিলেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্য উপলব্ধ হয়।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

তাঁহার বপু মধুর, তাঁহার বদনপদ্ম মধুর, তাঁহার মৃদুহাস্য মনোহর-সুগন্ধি, তাঁহার সমস্তই মধুর। তাঁহার বংশীধ্বনি একবার কাণে প্রবিষ্ট হইলে তথায় অনবরত প্রতিধ্বনিত হয়; তথায় আর অন্য শব্দ প্রবেশ করিতে পায় না। সেই ধ্বনি শুনিলে পতির অঙ্ক হইতে তাহা সাধ্বীগণকে বিবশা ও বিবস্ত্রা করিয়া টানিয়া আনে। তাহাদের লোকধর্ম্ম, লজ্জা-ভয় বিলুপ্ত হয়। আমি উন্মাদ, আমি কৃষ্ণের মাধুর্য্য-প্রবাহে ভাসমান। সে মাধুর্য্যের কথা মনে হইলে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।" বলিয়া গৌর নীরব হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে গৌর কহিলেন—"এখন অভিধেয় লক্ষণ শ্রবণ কর। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। বহির্মুখ জীব মায়াবশে কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া বহু কষ্ট ভোগ করে। সাধু-সংসর্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। কৃষ্ণভক্ত সমস্ত কর্ম্ম স্বীয় আরাধ্য দেবতায় সমর্পণ করিয়া অবশেষে আপনাকেও তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন। "আমি তোমারই" বলিয়া যে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে, ভগবান তাহাকে অভয় প্রদান করেন। অন্য কামনা করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে, পরিণামে সে-ও শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করে। পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদান করিয়া বিষয় ভুলাইয়া দেন। তখন সে কামনা-বিরহিত হইয়াই তাঁহাকে ভজনা করে।

নিষ্কামভক্ত প্রার্থনা না করিলেও ভগবান তাঁহাকে সর্ব্বকামপ্রদ স্বীয় পদপল্লব দান করেন। সকামভাবে উপাসনা করিতে করিতে ভক্ত নিষ্কাম হইয়া পড়েন। ঐশ্বর্য্য লাভেচ্ছায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্রুব যখন আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসে স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাঞ্চং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

হে দেব স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ফলে পাইলাম মুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে। আমি কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্ তোমাকে পাইয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাই না।

নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় ভগবান বলিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো রক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তুমি আমাতেই মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর। তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সত্য কহিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি শোক করিও না।

অতএব জ্ঞান কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইবে। তাঁহার উপাসনা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তি হয় না। শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অধিকারী-ভেদ হয়। যাহার শ্রদ্ধা শাস্ত্র ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে উত্তম অধিকারী। শাস্ত্র ও যুক্তি না জানিয়াও যে দৃঢ়শ্রদ্ধার অধিকারী সে মধ্যম। শ্রদ্ধা যাহার কোমল সে কনিষ্ঠ অধিকারী। কালসহকারে কোমল শ্রদ্ধার অধিকারীও উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে, তদ্‌ভক্তে এবং তৎপ্রতি উদাসীন ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তাঁহার নাম মধ্যম ভক্ত। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তের বা অপর কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। এখন বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যপরায়ণ, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারী, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ; মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণবগণ সর্ব্ব প্রযত্নে অসৎ-সংসর্গ ত্যাগ করিবেন। স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্ত অসৎসঙ্গী মধ্যে গণ্য। বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণভক্তিহীন, ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবেন না। বৈষ্ণব কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিবেন। শরণাগত ও অকিঞ্চনের লক্ষণ

একই। ঈশ্বর-আরাধনের অনুকূল বিষয়-গ্রহণ, তৎপ্রতিকূলবিষয়-ত্যাগ, "তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন" এইরূপ বিশ্বাস, তদীয়রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তদীয় কার্য্যে আত্মবিনিক্ষেপ, তদীয় শরণ-বিষয়ে নিষ্ঠামতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ।

অধুনা সাধন ভক্তি বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহা দ্বারা ভাব সাধন করা যায়, তাহারই নাম সাধন-ভক্তি। স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেইগুলির হৃদয়ে উত্থাপনই সাধন। সাধনের স্বরূপ-লক্ষণ শ্রবণাদি ক্রিয়া, তটস্থ লক্ষণ প্রেমোৎপত্তি। সাধন ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা। রাগবিহীন জন শাস্ত্রানুসারে যে ভগবানের ভজনা করেন, তাহাকে বৈধ ভক্তি বলে। বাঞ্ছিত পদার্থে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা হয়, তাহাকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগানুগা বলিয়া অভিহিত। বৈধভক্তিমান্ ভক্তি সাধনার বিবিধ অঙ্গ সাধন করেন। গুরুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, সাধু মার্গানুগমন, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ, তীর্থে বাস, একাদশী-পালন, ধাত্রী-অশ্বত্থ-গো বিপ্র-বৈষ্ণবের সেবা, অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহু-গ্রন্থ-পাঠ ও কলাভ্যাস বর্জ্জন, সুখ-দুঃখ জয়ীকরণ, অন্য দেবতা ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা বর্জ্জন, প্রাণীর উদ্বেগকারণ-পরিহার, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, স্তুতিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, পরিক্রমা, স্তব-পাঠ, জপ, প্রসাদ-ভোজন; তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও বৈষ্ণবের সেবন, দান ধ্যান, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপার উপলব্ধি, ভক্তগণসহ জন্মদিনাদি-মহোৎসব, সাধুসঙ্গ, ভাগবত-শ্রবণ এবং সর্ব্বদা শরণাগতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ভক্ত অপার সুখের অধিকারী হন। রাগানুগা ভক্তি ব্রজবাসী ব্যক্তিতে প্রকাশিত। আন্তর ও বাহ্যভেদে এই ভক্তির সাধন দ্বিবিধ। রাগানুগাভক্তিমান বাহ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন; অন্তরে সিদ্ধস্বরূপ মানসদেহে ভগবানের আরাধনা করেন। কেহ আপনাকে ভগবানের দাস, কেহ সখা, কেহ পিতা কিম্বা মাতা, কেহ বা আপনাকে ভগবানের প্রেয়সী কল্পনা করিয়া দিবারাত্র তাঁহারই ধ্যানে অতিবাহিত করেন। এইরূপে যিনি রাগানুগা ভক্তির সাধন করেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে তাঁহার প্রেম উৎপন্ন হয়। প্রেমের অঙ্কুর হইতে রতি ও ভাবের উৎপত্তি। পবিত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে, প্রেমরূপ আদিত্যতেজ সাম্যভাব পরিগ্রহ করিলে এবং রুচি-শক্তির প্রভাবে চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাকে ভাব কহে। যাহাতে মানস সম্যক প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, যাহা স্নেহাতিশয্য-যুক্ত এবং যাহা ঘনীভূত স্বরূপ—তাহাকেই প্রেম অথবা প্রেমা বলে। জীবের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সে সাধুসঙ্গ করে, তাহার ফলে সে শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়; তৎকালে ভক্তি-নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদিতে রুচি; রুচি হইতে প্রচুর আসক্তির উদ্ভব এবং আসক্তি হইতে রতির আবির্ভাব হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমনামে অভিহিত হয়। এই সর্ব্বানন্দ-ধামে প্রেমই প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবতি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

সাধু ব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে যে সকল বীর্য্যসূচক কথা আলোচিত হয়, তৎসমস্ত হৃদয় প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখকর। তাহাদের সেবন দ্বারা আশু অপবর্গ মার্গ স্বরূপ হরিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম-ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহার ভাবাঙ্কুর সমুৎপন্ন হইয়াছে তিনি ক্ষমাবান; তিনি মিথ্যা সময়ক্ষেপ করেন না, বিষয়-ভোগে তাঁহার স্পৃহা ও অভিমান থাকে না, ভগবৎ লাভ বিষয়ে তাহার অন্তরে দৃঢ় আশা সংবদ্ধ হয় এবং তাহাতে সম্যক্ উৎকণ্ঠা জন্মে। নিরন্তর ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে রুচি ও গুণ-কথনে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি হয়। যিনি ভক্ত তিনি অহর্নিশি বচন দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া, মন দ্বারা স্মরণ করিয়া এবং দেহ দ্বারা প্রণতি করিয়াও তৃপ্ত হন না। তিনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ু ভগবানের জন্যই সমর্পণ করেন। ভক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ অক্লেশে বিসর্জ্জন করেন এবং সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন মনে করেন। ভরতনৃপতি যৌবনাবস্থাতেই রাজসম্পৎ ও দারাপুত্র পুরীষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ভগবানে রতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অরিগৃহে ভিক্ষা এবং চণ্ডালেরও বন্দনা করিতেন। ভক্তের নামগানে বিপুলাপ্রীতি জন্মে এবং তিনি কৃষ্ণ-লীলা-স্থানে বসতি করেন।"

অনন্তর গৌর কহিলেন—"কৃষ্ণে রতির লক্ষণ এই বিবৃত করিলাম; এখন কৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ শুন। প্রেমিকের চিত্তকথা ও ভজন ব্যবহারাদি বিজ্ঞের পক্ষেও দুর্বোধ্য। প্রেমের বৃদ্ধির সহিত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদ্ভব হয়। ইক্ষুরস ক্রমে গাঢ় হইতে হইতে যেমন গুড়, খণ্ড, চিনি, মিছরিতে পরিণত হইয়া ক্রমেই সুমিষ্টতর হয়, রতি ও প্রেমও ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া তাহার মিষ্টতা বৃদ্ধি করে।" অনন্তর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ব্যাখ্যা করিয়া গৌর কহিলেন "মধুর রস দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। কৃষ্ণমহিষীগণের ভাব রূঢ়পদবাচ্য, গোপিকাগণের ভাব অধিরূঢ় বলিয়া খ্যাত। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দ্বিবিধ—সম্ভোগে 'মাদন', এবং বিরহে "মোহন।" মাদনের চুম্বনাদি অনন্ত প্রকার আছে। মোহনের দুইটী ভেদ—উৎঘূর্ণা ও চিত্রজল্প। চিত্রজল্পের অঙ্গ দশটী—প্রজল্প ইত্যাদি। উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টার নাম দিব্যোন্মাদ, তখন বিরহীর আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার দ্বিবিধ। সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ; বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্র্য। মধুর রসের অবলম্বন নায়ক ও নায়িকা। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি এবং শ্রীমতী রাধিকা নায়িকাগণের মধ্যে প্রধান।"

এইরূপে 'প্রেম-প্রয়োজন' ব্যাখ্যা করিয়া গৌর কহিলেন "পূর্ব্বে এ সমস্তই আমি তোমার ভাই রূপের নিকট বিবৃত করিয়াছি। তোমাকেও সমস্ত বলিলাম—কেননা তুমিই ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিবে। তুমি মথুরা গমন করিয়া লুপ্ত তীর্থরাজির উদ্ধার কর, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা ও বৈষ্ণব আচার প্রচারিত কর; বৈষ্ণবের

স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত কর। মনে রাখিও ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥

সর্ব্বভূতে যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি এবং মৈত্রীভাব, যিনি সর্ব্বভূতে দয়ালু, যিনি মমত্বভাবশূন্য ও নিরহঙ্কারী, যিনি সুখ ও দুঃখে সমান এবং ক্ষমাশীল, যিনি নিরন্তর সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি মন ও বুদ্ধি আমাকেই অর্পণ করিয়াছেন, মদভক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কেহ সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না, কোন লোক হইতেও যিনি সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগহীন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন ও ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে যাঁহার সমান দৃষ্টি, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার নিকট সমান, যিনি আসক্তিলেশহীন, মৌনী, যে কোনও প্রকারে সামান্য অন্ন বস্ত্র লাভেই সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জিত, স্থিরমতি, এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। যিনি শ্রদ্ধাবান ও মৎপরায়ণ হইয়া এই ধর্ম্মামৃত যথোক্তরূপে আচরণ করেন, সেই ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়।

তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্য ও রাজসেবা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। কেনই বা তুমি ধনীর উপাসনা করিবে?

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥

সাধুগণ ধনমদান্ধ লোকের উপাসনা করিবেন কেন? জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড কি পথে প্রাপ্ত হওয়া যায় না? বৃক্ষরা ত ফলকুসুমাদি দ্বারা পরেরই পোষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের কাছে ভিক্ষা চাহিলে কি পাওয়া যায় না? নদীসকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? পর্ব্বত-গুহা কি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান কৃষ্ণ কি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না?

যাও এখন জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হও।"

তখন সনাতন অতি বিনীতভাবে কহিলেন "আমি অতি হীন, তুমি আমাকে ব্রহ্মারও অগোচরতত্ত্ব সকল শিক্ষা দিয়াছ। এখন আমার মস্তকে পদস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, তোমার শিক্ষা আমার মধ্যে স্ফুরিত

হউক।" অনন্তর গৌব স্বীয় হস্তে সনাতনের মস্তক ধারণ করিয়া কহিলেন "এই সকল তোমার মধ্যে স্ফূরিত হউক।"

কিয়ৎকাল পরে সনাতন কহিলেন "প্রভু আমি শুনিয়াছি তুমি

আত্মারামাশ্চ মুনয়োঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।"

[আত্মারাম মুনিগণ বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়াও সেই প্রচুর পবাক্রমশালী শ্রীহবিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহবির এমনই গুণ] এই শ্লোকের আঠার অর্থ সার্ব্বভৌমের নিকট বিবৃত করিয়াছিলে। সেই অর্থ শুনিবার জন্য আমার মন বড় কৌতূহলী হইয়াছে। যদি দয়া করিয়া বল, আমার কর্ণ চরিতার্থ হয়।" গৌর কহিলেন "আমি সর্ব্বভৌমের নিকট পাগলের মত কি বলিয়াছি তাহা কি আর মনে আছে? তবে তোমাব সঙ্গগুণে যদি মনে হয়।" তদন্তর গৌর ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত শ্লোকের একষষ্টি অর্থ করিয়া সনাতনকে কৃতার্থ করিলেন। অনন্তর সনাতন কহিলেন "প্রভু, আমার মত হীন ব্যক্তিকে তুমি বৈষ্ণবের স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিতে আদেশ করিয়াছ। কিন্তু তুমি যদি দয়া করিয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ না কর, তবে আমা দ্বারা সে কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইবে?" তখন গৌর সংক্ষেপে বৈষ্ণবের পালনীয় আচার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া কহিলেন "তুমি যখন এ সম্বন্ধে লিখিতে বসিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সমস্তই স্ফূরিত করিয়া দিবেন।"

দুইমাস যাবত কাশীতে থাকিয়া গৌর সনাতনকে ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন। কাশীর সন্ন্যাসিগণ তাঁহার কথা শুনিয়া যেখানে সেখানে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত। পূর্ব্বে যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি এই সমস্ত নিন্দায় বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন "একবার যদি সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তাহারা আর তাঁহার নিন্দা করিতে পারিবে না।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া একদিন ব্রাহ্মণ কাশীস্থ যাবতীয় সন্ন্যাসীদিগকে স্বায় গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং গৌরের নিকট আসিয়া অত্যন্ত দীনতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। কাশীতে তখন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রাহ্মণগৃহে সকল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গৌর তথায় উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসিগণের হৃদয় গৌরের প্রতি বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতিমণ্ডিত কান্তি দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের কঠিন মন এক অজ্ঞাত করুণ রসে অভিষিক্ত হইয়া গেল। প্রকাশানন্দ সসম্মানে গাত্রোত্থান করিয়া গৌরকে আসন প্রদান করিলেন এবং অনুশোচনা করিয়া কহিলেন "আপনি সন্ন্যাসী, কাশীতে আসিয়াছেন, অথচ আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন না কেন? বেদান্তপাঠ সন্ন্যাসীর প্রথম কার্য্য। কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া ভাবুকের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন। আপনাকে দেখিয়া নারায়ণের প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু হীনাচার বর্জ্জন করেন না কেন—তাহার কারণ বিবৃত করুন।" গৌর-

বিনীতভাবে কহিলেন "আমার গুরু আমাকে মূর্খ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর, তাহা দ্বারাই তুমি ভগবান লাভ করিবে।" গুরুর আদেশে কৃষ্ণনাম লইতে লইতে আমার মন ভ্রান্ত হইয়া গেল, আমি অধীর হইয়া উন্মত্তের মত হইলাম। তখন গুরুর চরণে নিবেদন করিলাম "আপনার মন্ত্র জপ করিতে করিতে আমি পাগল হইয়া গেলাম—এ কি মন্ত্র আমাকে দিলেন, গুরু?" গুরু হাসিয়া উত্তর করিলেন 'যে মহামন্ত্র তোমাকে দিয়াছি, তাহা জপ করিলেই কৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণনামের ফলই প্রেম। তোমার সেই প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রেমের স্বভাবই এই যে, যে তাহাকে লাভ করে তাহার চিত্ত ও দেহে ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং সে পাগলের মত হাসে, কাঁদে ও গান করে। তোমার যে প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে—তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি নাচিয়া গাহিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করতঃ জগৎ উদ্ধার কর।' গুরুর এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করতঃই আমি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করি।" গৌরের সুমিষ্ট বিনীত বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ, মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের মন সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। মধুর বাক্যে তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাক্য সত্য। কিন্তু আপনি বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন? বেদান্তের দোষ কি?" তখন গৌর কহিলেন "আমার বাক্যে যদি মনে কষ্ট না পান তবে বলি। বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বরবাক্য। তাহাতে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি অসম্ভব। সূত্রের মুখ্যার্থ সুস্পষ্ট। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সেই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণবৃত্তিতে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে জীবের সর্ব্ব কার্য্য পণ্ড হয়। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ ভগবান্। তিনি "চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান।" তাঁহার বিভূতি ও দেহ চিদাকার। আচার্য্য তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ভাষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার বিভূতি ও দেহকে প্রাকৃত বলিয়াছেন। বিষ্ণু কলেবরকে প্রাকৃত বলিয়া গণ্য করা অপেক্ষা বিষ্ণু নিন্দা আর কিছুই হইতে পারে না। ঈশ্বর জলন্ত অগ্নি সদৃশ, জীব সেই জলন্ত অগ্নির স্ফুলিঙ্গকণা। ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ সুস্পষ্ট। আচার্য্য ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণামবাদে ঈশ্বরকে বিকারী হইতে হয় এই আপত্তি। কিন্তু চিন্তামণি হইতে অসংখ্য রত্নরাশি উৎপন্ন হইলেও চিন্তামণি যেমন অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত ভগবান স্ব-ইচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নিজে অবিকৃত থাকেন। প্রাকৃত বস্তুতেও এই অবিকৃত থাকিবার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরে উহার বিদ্যমানতা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। প্রণব মহাবাক্য। তত্ত্বমসি বেদের একদেশী বাক্য মাত্র। ব্রহ্ম অর্থে বৃহদ্বস্তু। শ্রীভগবানই বৃহদ্বস্তু। তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, মায়াগন্ধ-বিবর্জিত। এই শ্রীভগবানই সমগ্র বেদে গীত হইয়াছেন। তাঁহাকে নির্বিশেষ বলিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়।" অনন্তর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া গৌর সন্ন্যাসীমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিলেন। সন্ন্যাসিগণ তখন পূর্ব্বকৃত গৌরনিন্দা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা যুক্তকরে গৌরকে কহিলেন "তুমি বেদময় মূর্ত্তি

সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমরা তোমার যে নিন্দা করিয়াছি, উহা ক্ষমা কর।" স্বয়ং প্রকাশানন্দ তখন নানাভাবে গৌরের প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিলেন। সকল সন্ন্যাসী সেই অবধি কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলেন। কাশীবাসী লোক দেখিয়া ও শুনিয়া চমৎকৃত হইল। কাশীতে হরিধ্বনি গগন ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল। সন্ন্যাসিগণ ভাগবত বিচার আরম্ভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া বহুদূর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দর্শনলাভেচ্ছায় কাশীতে আসিতে লাগিল। গৌর গঙ্গাস্নান গমনকালে অগণিত লোক তাঁহার উভয় পার্শ্বে সমবেত হইয়া বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপে বারাণসী যখন হরিধ্বনিতে টলটলায়মান, তখন একদিন রাত্রিতে গৌর বারাণসী ত্যাগ করিলেন। গমনকালে সনাতনকে কহিলেন "তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। কাঁথা ও করঙ্গসম্বল আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে গমন করিলে তাহাদিগকে সযত্নে পালন করিও।" চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ, তপন মিশ্র, রঘুনাথ ও পূর্ব্বোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন—কিন্তু তাহাদিগের কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া গৌর বলভদ্র সঙ্গে ঝারিখণ্ড পথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। আঠারনালায় পৌছিয়া বলভদ্রকে পাঠাইয়া নীলাচলস্থ ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিলেন। ভক্তগণ তাঁহার বিরহে মৃতপ্রায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সংবাদে পরমাহ্লাদিত হইয়া সকলে মিলিয়া প্রভুকে প্রত্যভিবাদন করিয়া লইয়া গেলেন।

এদিকে সনাতন বারণসী হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবন পৌছিলেন। এবং তথায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

ধর্ম্মমঙ্গল

(২)

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের কবি মুকুন্দরামের মত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও মানুষ চিনিতেন। কিন্তু মানুষের হৃদয় লইয়া মুকুন্দরাম যে পরিপক্ক রসের সৃষ্টি করিয়াছেন ধর্ম্ম-মঙ্গলে তাহার তত পরিচয় পাওয়া যায় না। ঘনরাম রসাবতারণ শক্তি-সম্বন্ধে মুকুন্দরামের অপেক্ষা অনেক নিম্নে অবস্থিত। অথচ প্রায় সকল রসই তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। করুণরসে ও হাস্যরসেই কবির কৃতিত্ব অধিক এবং বীররসেও নিতান্ত কম নহে। কৃত্তিবাস বা মুকুন্দরামের মত কাঁদাইতে না পরিলেও ঘনরাম করুণরসের চিত্রে হৃদয়ে আঘাত করিতে পারেন, মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারেন। এ কথা যিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাকে পতির মায়ামুণ্ডদর্শনে লাউসেনের পত্নীগণের বিষাদ-বর্ণনা ও সহমরণের জন্য আয়োজন-বর্ণনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঘনরামের এই বর্ণনা হইতে মাইকেল মেঘনাদ-বধে প্রমীলার সহমরণ-যাত্রার বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমগ্র চিত্রখানি পাঠ

করিয়া যিনি ঘনরামের করুণরসসৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রশংসা না করিবেন, তিনি হয় কাব্য-রসাস্বাদনশক্তিহীন, নয় কোনও একটা মত-সমর্থনার্থে কবির শক্তির অপলাপ-প্রয়াসী। ঘনরামের শোকচিত্র প্রায় সর্ব্বত্র সংযত, উচ্ছৃঙ্খল নয়। তাঁহার চরিত্রগুলি শোকাবিষ্ট হইলেও আত্মহারা হন না, ভগবান্‌কে ভুলিয়া যান না। আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন কবিগণ প্রায়ই সংযমের পক্ষপাতী। মুকুন্দরামে আমরা এ বিষয়ের উদাহরণ পাইয়াছি, ঘনরামেও তাহার অভাব নাই; তাঁহারা জানিতেন্

সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সব কর্ম্ম ভোগ।
সংসার অসার সব সার সেই পদ॥

তাই তাঁহাদের শোকেও এক মহা শান্তি ছিল। তখনও ভারতের আধ্যাত্মিকতা প্রবল জড়ভক্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয় নাই—এই জড় জগতের সুখ-দুঃখের অতীত অধ্যাত্ম-চেতনা তখনও লুপ্ত হইতে পায় নাই। লোকে জানিত যে বিপদে সম্পদে তাহাদের আশ্রয় করিবার ধন আছে—ধর্ম্ম। তাই প্রাচীন কবি দুঃখে বা সুখে অধীর না হইয়া বলিতে পরিতেন—

দুখ সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষ ভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ পথের ভিক্ষুক॥

এইরূপ কতকগুলি সুন্দর আদর্শ প্রাচীন কবিরা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই আদর্শগুলির উপর দৃষ্টি রাখিলে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে, কারণ জড় ভক্তির স্রোতে পড়িয়া তাহারা ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। আতিথেয়তার আদর্শ এইরূপ একটা আদর্শ; উহা এখন আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কতক বিকৃত শিক্ষার ও কতক গৃহে অন্নাভাবের জন্য। যখন ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ধৰ্ম্মমঙ্গল-কাব্য প্রণয়ন করেন, তখন বঙ্গে অন্নকষ্ট ছিল না, লোকে পরিবার পোষণ করিয়া সর্ব্বদেবময় অতিথি-নারায়ণের সেবা করিবার সুখ ও পুণ্য ভোগ করিত। প্রাচীন কবিরা সতীত্বের আদর্শও জাগাইয়া রাখিবার প্রয়াস করিয়াছেন; ধৰ্ম্মমঙ্গল-কাব্যে অনেকগুলি হিন্দু-স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, কানাড়া প্রত্যেকেই আমাদের নিত্য-পরিচিত পবিত্র স্ত্রী-মূর্ত্তি। ইহারা সকলেই সেই চিরনূতন প্রাচীন আদর্শে, সীতাসাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। সতীত্বের আদর্শ কেবল উচ্চ সমাজেই রুদ্ধ ছিল না, নিম্নস্তরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কবির "লখে ডোম্‌নী" অপূর্ব্ব চরিত্র। ইহার বিষয় পরে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব নাই; সমাজের দোষগুণ তাঁহার কাছে সবই ধরা পড়িয়াছে—যদিও কবিকঙ্কণের মত কলানৈপুণ্যের সাহায্যে ঐ সকল তথ্য প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা ঘনরামের ছিল না, তথাপি আমরা বাঙ্গালী-সমাজের অনেক কথাই কবির নিকট হইতে জানিতে পারি। যেমন একদিকে হিন্দুর চিরন্তন আদর্শগুলি কবি আঁকিয়াছেন, তেমনি আবার মুসলমান-সংশ্রবে আসিয়া তাহাদের যে বিকৃতি ঘটিয়াছিল তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন; যেমন একদিকে মাতৃত্বের সরল মূর্ত্তিও

আঁকিয়াছেন, তেমনি বিলাসপ্রবৃত্ত হৃদয়ে স্নেহের অযথা উপদ্রব ও কর্ত্তব্যক্ষোভকারী প্রবৃত্তিও আঁকিয়াছেন; যেমন সতীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তেমনি অসতীর চরিত্রও আঁকিয়াছেন। অসতীর চিত্র ফুটিয়াছে ভাল—কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি এ দিকেও খেলিয়াছে। সংসারের পিশাচিনী স্বরূপিনী নয়ানী শুরিক্ষা শুবিক্ষা প্রভৃতি হীন রমণীর চরিত্র—পাপের চিত্র—ধর্ম্ম-মঙ্গলকাব্যে কবি ফুটাইয়াছেন, তাঁহার নায়কের চরিত্র-বিকাশের উদ্দেশ্যে। চিত্রগুলি বোধ হয় কিছু অধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। এতটা না হইলেও চলিত, কিন্তু যতটুকু চিত্রিত হইয়াছে তাহা অসত্য নহে, এ কথা পতিতা নারীর চরিত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন। পতিতা রমণীর সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার ওয়েব্‌ষ্টার তাঁহার "ডেভিল্‌স্ ল কেস" নামক নাটকেব চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলেই কবির নয়ানী-চরিত্র বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন—

"Oh the violence of women !
Why they are creatures made up
and compounded
Of all monsters, poisoned minerals
And sorcerous herbs that grow.
......*They have no more mercies*
Than ruinous fires in great
tempests."

এই সম্পর্কে বলিয়া রাখি যে দেশের কুসংস্কার-গুলিও কবির কাব্যে পরিস্ফুট হইয়াছে; যথা—বিবাহান্তে বশীকরণ-ঔষধ-প্রয়োগ। রঞ্জাবতীর বিবাহান্তে তাহার জননী এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নানা কারণ দেখাইয়া তাহা নিষেধ করিয়াছেন। অন্যান্য বশীকরণ-মন্ত্র ও উপকরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

(১) তৈল পড়া,

(২) "গুয়া পান পড়ায় পুরুষে করে অজা,

(৩) অন্নে মাথে ঔষধ ব্যঞ্জনে পড়ে মন্ত্র।"

এইগুলি শুনিলে কবি মিডল্‌টন প্রণীত "দি উইচ" নাটকের "রিবন্ পড়া" প্রভৃতির কথা মনে আসে। অন্যান্য কুসংস্কার—মায়ামুণ্ড, নিছুটী লাগান অর্থাৎ ঘুম পাড়ান," কামিখ্যার নায়িকাদ্বারা ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করান ইত্যাদি। এ সকলেরও কতক নিদর্শন উক্ত বিলাতী নাটকে পাওয়া যায়।

যেমন কুসংস্কার, তেমনি সুসংস্কার, ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির তথ্যও আমরা কবির লেখা হইতে জানিতে পারি। অন্যান্য প্রাচীন কবির মত ঘনরামও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। দেশ তখনও ধর্ম্মহীন হয় নাই, তখনও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবল প্রভাব দেশের লোকের মন হইতে তিরোহিত হয় নাই! কবির হৃদয়ের উপরও তাঁহার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। ধর্ম্মের গান বুদ্ধ-ধর্ম্মপ্রসূত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্ম বিষ্ণুরূপে পরিণত হইয়াছেন, এবং ধর্ম্মের গান হরিগুণ-গানে পর্য্যবসিত হইয়াছে :—

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তন।
সংসার সন্তাপ সিন্ধু তারণ কারণ॥
পুণ্যভূমি ভারতে মনুষ্য দেহ ল'য়ে।
মিছা মায়া মোহজালে জন্ম যায় বয়ে॥

* * * *

পাপ প্রকাশিয়ে যবে পীড়িবে শমন।
কোথা রবে জায়া পুত্র পরিবার ধন॥
সেকালে সারথি সবে হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম॥

কবির ধর্ম্ম-মঙ্গলে এই সুরই বেশী বাজিয়াছে। তাই যখন কবি ভক্তি-বিগলিত চিত্তে চৈতন্য-বন্দনা গান করিয়াছেন, তখন সে ভাব বুঝিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। ফলতঃ তাঁহার চৈতন্য-বন্দনা এব সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চৈতন্যপার্শ্বদগণের বন্দনায় তাঁহার বৈষ্ণবত্ব ঘোষণা করিয়াছে; এ বন্দনায় এবং বৈষ্ণবকবির চৈতন্য-বন্দনায় কোনও প্রভেদ লক্ষিত হইবে না। ইহাতে কবির ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে।

ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ঐ হরিনাম ধন।
প্রকাশিলা মহাপাপ খণ্ডন কারণ॥
খণ্ডাতে জগতে যত জীবের যন্ত্রণা।
গোবিন্দ কীর্ত্তন নাম রচিল রসনা॥
সর্ব্বজীবে সমভাব ভেদবুদ্ধি নাই।
দীনদয়াল আমার ঐ চৈতন্য গোসাই॥
ভারতে মনুষ্য জন্ম করহ সফল।
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণকমল॥

দ্বিজ ঘনরামের হৃদয় চৈতন্যচন্দ্রের চরণ-মাধুরীতে অভিষিক্ত হইয়া কোমল হইয়াছিল। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্মের গান ভক্তিরসে মিশ্রিত হইয়া কঠোর বস্তুকে কোমলভাবে পরিণত করিয়াছিল। ভক্তির ইহাই মাহাত্ম্য। অতএব ঐতিহাসিক তাঁহার কাব্যে মূল বস্তুর সন্ধান না পাইলেও সাধারণ পাঠকের তাহাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয় নাই। যদি ভগবৎপ্রাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ভক্তির কথা যত বিশুদ্ধ ভাবে কথিত হয়, ততই মঙ্গল। কবি কর্ম্মকে কোথাও খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পান নাই, তবে সকল কর্ম্মে ভক্তির ভাব মিশাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার নায়কেরা ও নায়িকারা কেহই কর্ম্ম-পরাঙ্মুখ নহে, কিন্তু তাহারা সকল কর্ম্মেই ভগবান্‌কে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হয়। হয় তো তাহাদের এই ভগবন্নির্ভরশীলতায় তাহাদের মনুষ্য-চরিত্রের কতক তেজোহানি হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই কর্ত্তব্য অবহেলা করে না।

তাই বলিয়া কবি যে কেবলই কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোকেরই চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কাব্যে কদাচারীর চিত্র, কাপুরুষের চিত্রও যথেষ্ট আছে। এ সংসারে সৎও আছে, অসৎও আছে, সবলস্বভাব ব্যক্তিও আছে, খলও আছে, সতীও আছে অসতীও আছে, যাহা কিছু কবিকে দেখিতে হইয়াছে সবই তিনি দেখিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন। আমার এমনও মনে হয় যে তাঁহার নায়কের চরিত্র অপেক্ষা তাঁহার উপনায়কগুলির চরিত্র যেন ভাল ফুটিয়াছে। এ বিষয়ে দীনেশবাবুর সহিত আমার মত মিলিয়াছে। লাউসেনকে কবি খুব ভাল করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু লাউসেনের কোনও মহত্ত্বই যেন ফোটে নাই, তাহার কারণ লাউসেনের বিপদ দূর করিবার জন্য যখন হনুমান্ মজুত আছেনই, তখন লাউসেন একটু মহত্ত্ব দেখাইয়া লইতে পারেন বৈ কি, তাহাতে তাঁহাকে একটু আধটু বাঁধন ছাঁদন ভিন্ন আর কোনও কার্য্যই তো স্বীকার করিতে হয় না দেখিতে পাই। বাকী যেটুকু "হনুমান্"হীন, সেই মহত্ত্ব-টুকু তাহার নায়কে তিনি অর্পিয়াছেন চুরি

করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আদর্শ মুকুন্দরামের ব্যাধবীরের চরিত্রের ছায়া হইতে লাউসেনের পরস্ত্রী-নিস্পৃহত' আসিয়াছে, এখানেও তত বাহাদুরি দেখি না। যাহা হউক এ কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, লাউসেন মোটের উপর লোকটী ভাল; কিন্তু আমাদের মুখ হইতে কবির অত বড় নায়কের চরিত্রের প্রশংসা ইহার বেশী উঠিতে চাহে না। কবির মনে আদর্শটা যে ছোট ছিল তাহা নহে, তবে কাব্যের উপর কালের প্রভাব অলঙ্ঘনীয়. এবং কবি লাউসেনকে যতই বড় করিবার চেষ্টা করুন না, সে সময়ে দেশের লোকের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল— তাহার নিদর্শন কাব্যে বাধ্য হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তাই লাউসেনের সঙ্গে যথার্থ মহত্ত্বের বা শূরত্বের যেন ঠিক স্বাভাবিক সংযোগ ঘটে নাই। লাউসেনের কীর্ত্তিকলাপ তাহার নহে, হনুমানের; তাহার বিপদে বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ তাহাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য হনুমান হাতের কাছেই আছেন—তাঁহাকে সত্যবাদী প্রমাণ করিবার জন্য মরা ছেলে বাঁচিয়া উঠে, অপ্রাকৃত ঘটনাগুলা সময়ে অসময়ে তাহার একটু ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া কাঁদিবার পূর্ব্বেই তাহার সুবিধামত অবাধে ঘটিয়া যায়; তাহার খাতিরে পূর্ব্বের সূর্য্য চটপট গতি ফিরাইয়া পশ্চিমে গিয়া উদিত হয়। এই সকল অপ্রাকৃত ঘটনাদ্বারা কবি যে তাহার চরিত্র বিকশিত করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, অথবা ইহাদের ভিতর যে মুকুন্দ-রামের কাব্যের অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর মত একটা সহজ স্বাভাবিকতা বা কাব্যোন্মেষ-শক্তি আছে তাহাও বোধ হয় না। এগুলিকে দেখিলে মনে হয় যে কবি যখন তাঁহার নায়ককে একটা বড় কাজের সমক্ষে আনিয়াছেন, তখনই যেন তাঁহার মনে হইয়াছে যে এত বড় কাজটা কি একজন বাঙ্গালী করিতে পারিবে,—একজন রাজা-রাজড়ার ছেলে সে সৌখীনি করিবে, বুল্‌বুলির লড়াই দেখিবে, না রাজ্য জয় করিয়া বেড়াইবে? অমনি কবি লাউসেনকে লুকাইয়া ফেলিয়া হনুমান্‌কে আসরে নামাইয়াছেন। তবু বলিতে হয় যে বাঙ্গালীর চরিত্র তখনও নিতান্ত হীন হইয়া যায় নাই, কারণ তখনও ইন্দ্রিয়-জয়ের আদর্শ ছিল, বীরত্বও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তবে আত্ম-নির্ভরতা লুকাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উচ্চস্তরের বাঙ্গালী "বাবু" হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, অতএব তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার চরিত্রের সার বস্তু অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক লাউসেন যাহা হয় তো নিজের বীরত্বে, চরিত্র বলে সাধন করিয়াছিল, ঘনরামের লাউসেন তাহাই হনুমানের সাহায্যে করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং লাউসেনের কার্য্যকলাপের হাঁক-ডাকের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে একটী খাঁটি জিনিষ, ভবিষ্যৎ—হাসির গানের রচয়িতার কষাঘাতের পাত্র "চম্পটপরিপাটী" পটু কর্পূর, যাহার "মালসাট" পর্ব্বতপ্রমাণ, কিন্তু কার্য্যকালে যাহা কর্পূরেরই মত উপিয়া যায়। দীনেশবাবু এই কর্পূরের নাড়ী ঠিকই বুঝিয়া-ছেন। কর্পূরের সার্ব্বকালীন চেষ্টা গণ্ড-গোলের ভিতর হইতে সরিয়া পড়া, আর গণ্ডগোল মিটিয়া গেলে ঘটনাস্থলে আসিয়া

"সরফরাজি" করা। ইহাই দাঁড়াইয়াছে সাধারণ "বাবু"চরিত্র।

যদি এই অবনতির কারণ জানিতে চাও, তাহা হইলে ধর্ম্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী চরিত্র দেখ। কবিকঙ্কণের খুল্লনা বার বৎসরের শ্রীমন্তকে সমুদ্র পারে পাঠাইতে পারিয়াছিল, কিন্তু ঘনরামের "রঞ্জাবতী" পাছে লাউসেন বঙ্গেশ্বরের সভায় যায় সেই ভয়ে মা ডাকিয়া তাহাকে অঙ্গহীন করিয়া তাহাকে নিজ অঞ্চলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিয়াছিল। কুন্তী গান্ধারীর দেশে মাতৃস্নেহের যখন এমন অবনতি ঘটিয়াছিল, তখন বাঙ্গালীর চরিত্রের যে বিষম ক্ষতি হইবে তাহা তো জানা কথা। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এই অবনতির তরঙ্গ নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পঁহুছে নাই তাহা আমরা ধর্ম্মমঙ্গল হইতেই জানিতে পারির। বোধ হয় ধর্ম্মমঙ্গলেই প্রথম "প্যানপেনে প্যানঘেনে" বাঙ্গালী রমণী, অথবা বাঙ্গালা জননীর আমদানি যেমন একদিকে ইহাতে বারাঙ্গনার মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তেমনি ইহাতে বর্ত্তমান সময়ে সুপরিচিত বঙ্গনারীর প্রথম আবির্ভাব। কালে একটীর প্রসার ও অপরটীর সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটিয়াছে। কেবল এক বিষয়ে পুরাতন আদর্শ স্ত্রী জাতির মধ্যে এখনও প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত আছে—তাহা সতীত্ব। কতক বিকৃত হইলেও ভারতীয় সতী আজও ভারতীয় সতী—"অতুলনা ভারত-ললনা।" সকল সময়েই ভারতীয় কবির কাব্যের সৌষ্ঠব-সাধনার্থ এই অতুল সম্পদ বিদ্যমান ছিল, এই জন্য ধর্ম্মমঙ্গলে আমরা যে কয়েকটী স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহারা আমাদের কাছে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। সতী পতির মঙ্গলের জন্য, পতির সম্পত্তি-রক্ষার জন্য অনেক অসমসাহসিক কাজও করিতে পারে, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্যে কতকগুলি বীররমণীর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বঙ্গ-সাহিত্যে বীররমণীর সৃষ্টি ঘনরামের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—এ কীর্ত্তি নিতান্ত অবাস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উড়াইয়া দিবারও কোনও হেতু নাই, কারণ ইতিহাসেও বীরত্ব-ময়ী বঙ্গাঙ্গনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সে যাহাই হৌক এ কথা বেশ বলা যায় যে, কলিঙ্গা-কানাড়ার বীরত্ব-কাহিনী যে ভাবেই বিবৃত থাকুক ঘনরামের কাব্যে বাঙ্গালীরমণী চরিত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রিয়তা, পতিপুত্রকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখিবার প্রবৃত্তিই ফুটিয়াছে বেশী। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কলিঙ্গা লাউসেনকে রঙ্গরসে মত্ত করিয়া ঢেকুর-যাত্রার সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিও যথাদৃষ্ট তথা-লিখিত করিয়াছেন। তাঁহার বড় বড় আদর্শে চিত্রিত চিত্রগুলিও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়া সমসাময়িক বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি কবিকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ এবং শিক্ষাও উচ্চ সুরে বাঁধা। সে কথা পরে বলিতেছি। যথাযথ চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে কবির মহামদ-চরিত্রটী দেখা যাউক। এ চরিত্রটী কাব্যের প্রধান কুচরিত্র, ইংরাজীতে যাহাকে "রোগ" (Rogue) বলে তাহাই। সেক্ষপীয়রের ওথেলো নাটকে যেমন ইয়াগো, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে তেমনি

মহামদ। এ ব্যক্তি রাজ্যের প্রধান অমাত্য, গৌড়েশ্বরের প্রধান সহায়, অতএব কবি ইহাকে খুব বড় গোছের পদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কবি কখনও তো বঙ্গীয় নবপতিব মহাপাত্ররূপ জীবের সহিত পরিচিত ছিলেন না, দেখিয়াছিলেন জমীদারের গোমোস্তা—অত্যাচারী গোমোস্তা। অতএব অত বড একটা জমকালো পদ সত্ত্বেও মহামদ জমীদারের প্রজাপীড়ক নায়েব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কাব্যে বঙ্গেশ্বর যেমন জমীদাররূপে ফুটিয়াছেন, মহাপাত্রও তেমনি সেই জমীদারের গোমোস্তারূপেই চিত্রিত। রাজা সদাশয়, কিন্তু পাত্র অত্যাচারীর শিরোমণি; তাহার পীড়নে গৌড়রাজ্য ছারখারে যাইতে বসিয়াছে, প্রজারা রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতেছে। মফঃস্বলে ইহার অত্যাচার, ইহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ প্রজাকে মৃতবৎ করিয়া রাখিয়াছে; অথচ কেহ ইহার ভয়ে রাজার কাছে নালিশ করিতেও সাহস করে না। রাজা জানিতে পারেন না যে প্রজারা এত উৎপীড়িত। সহসা একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়া রাজ্যের অবস্থা দেখিতে পাইয়া পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘা প্রতি আনা।
কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড় থানা॥

উত্তরে পাত্র পরের ঘাড়ে, প্রজার ঘাড়ে দোষ দিয়া নিজে সাধু সাজিতে চাহিয়াছে, কিন্তু রাজাকে দেখিয়া আজ প্রজার মুখ ফুটিয়াছে—

রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান জনেক প্রজা কহে কর জুড়ি॥
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রিবর।
তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকর॥
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে॥
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণে কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার॥
এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা নাহি দিলে মন॥

দেশের অবস্থা দেখিয়া ও প্রজার কথা শুনিয়া রাজার আজ চৈতন্য হইয়াছে, তাই মহামদের কোনও ওজরই টিকিল না, তিনি তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন—

"তিন সন কাগজ বুজহ কালে কালে।"

এবং প্রজার মান রক্ষা করিয়া আদেশ করিলেন—

সহরে সকল প্রজা সুখে কর ঘর।
তিন সন অপর না লব রাজকর॥

এই সকল বর্ণনায় অনেকটা সদাশয় অথচ অলস বিলাসী জমীদার ও তাহার অত্যাচার-প্রিয় অসৎ কর্ম্মচারীর চিত্রই বিকশিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের বেশ জানি—জানি না গৌড়েশ্বরের মহাপাত্রকে, কবিও জানিতেন না।

অতঃপর মহামদের যে মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও এ দুনিয়ায় বিরল নহে; আমরা এমন লোকও দেখিয়াছি যাহার পরের ভাল একেবারে সহ্য হয় না; পরের মঙ্গল দেখিলে তাহার অসহ্য গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়, প্রাণপণে তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য সে নিজের সকল ক্ষমতা, সকল বুদ্ধি নিযুক্ত করে। সেক্সপীয়র ইয়াগো, ডনজন, এডমণ্ড প্রভৃতি চরিত্রে এই তথ্য বুঝাইয়াছেন। মহামদও এই ধাতুতে গঠিত। লাউসেন তাহার আপনার ভাগিনেয়, রঞ্জাবতী তাহার বোনের

কনিষ্ঠা ভগিনী; কিন্তু অকারণে অথবা অতি সামান্য কারণে মহামদ তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প, যত উপায়ে এই মহাকার্য্য সাধিত হইতে পারে তাহার কোনও-টীই সে বাকী রাখে নাই। অপরাধ—রাজা তাহার অমতে রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তাই প্রবলের উপর প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া, দুর্ব্বলের উপর তাহার কাল। এই অকারণ বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সে রঞ্জাবতীকে কত কাঁদাইয়াছে, লাউসেনকে কত কষ্ট দিয়াছে, বৃদ্ধ কর্ণসেনকে অপমানিত করিয়াছে, শেষে লাউসেনের রাজ্য ছারখারে দিবার চেষ্টাও করিয়াছে। অন্ততঃ লাউসেনের রাজ্যের সাররত্নগুলি সে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। শেষে যে কবি একটা অপ্রাকৃত ঘটনার আশ্রয় লইয়া পুনরায় তাহাদের বাঁচাইয়াছেন, তাহা হয় তো তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মন রাখিতে, না হয় বিশ্বনাথ কবিরাজের তাড়ায়। মনে মনে তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং লাউসেনের মুখে তাহা ব্যক্তও করিয়াছেন যে—

"দুর্জ্জন মাতুল মোর মজাইল সৃষ্টি।"

কবি "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই অমূল্য উপদেশটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কলির সংসারে যে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জয় হয় না, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছেন তাই ধর্ম্মের জয়-স্থাপনের জন্য প্রাকৃত ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

ভগবানের রাজ্যে কিছুই অকারণে ঘটে না, সকল ঘটনারই একটা উদ্দেশ্য আছে, ইহা কবি ঘনরাম বেশ বুঝিতেন। অন্ধকারের পর আলো যেমন দ্বিগুণ সুন্দর দেখায়, গাঢ় চিত্রপটের উপর সুন্দর ছবি যেমন ফুটিয়া উঠে, তেমনি পাপের পাশে পুণ্যের ছবির সুষমা জ্বলিয়া উঠে। কবি সমগ্র কাব্যে এই ভাবটা ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; অসতী রমণীর সাহায্যে লাউসেনের চিত্র বিকশিত করিয়াছেন, পাত্রের অত্যাচারের দ্বারা রাজার সদাশয়তা প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং পরিশেষে মহামদের পাপের সাহায্যে কতকগুলি চরিত্রের অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা প্রকটিত করিয়াছেন। ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য এই খানে আসিয়া জাগ্রত হইয়াছে, এইখানে তাহার অবসাদ দূর হইয়াছে, এইখানে যেন ইহাতে মহাকাব্যের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। লাউসেন কবির নায়ক বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহার চরিত্র হইতে আমরা অনেক ভাল শিক্ষা পাইলেও, কবি সে চরিত্র জীবন্তভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই, যেথানেই লাউসেন সেই থানেই কবি একটা কল্পিত উপকরণের, একটু কৃত্রিম মহত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এমন একটা বস্তুর অন্তরালে সেই মহত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন যে উহা একেবারেই প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যে যেথানে লাউসেন নাই, সেইখানেই কবির যথার্থ কবিত্ব, যথার্থ শিক্ষা এবং কাব্যের যথার্থ মহত্ত্ব ফুটিয়াছে।

তাই বলিয়া এমন কথা বোঝায় না যে, কবি এই স্থলে স্বভাবের রাজ্য ছাড়িয়া একেবারে আদর্শের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; তাহা নহে, যে ভাবে তিনি পূর্ব্বে লিখিতেছিলেন, সেই ভাবেই এখানেও লিখিয়াছেন, সেই সহজ কথা, সহজ ভাব

এখানেও বিদ্যমান, কিন্তু এখানে এমন একটী উচ্চ সুর বাজিয়াছে যে, তাহাতেই এই স্থানটীকে কাব্যের শীর্ষ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। অথচ এখানকার অর্থাৎ কাব্যের এই অংশের নায়কনায়িকা অধিক স্থলেই নিম্নস্তরান্তর্গত হীনজাতি, যাহাদের নাম করিলে এখন আমরা ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই।

এইখানেই কবির অপূর্ব্ব শিক্ষা। এই জন্যই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যকে অবহেলা করিবার উপায় নাই—উহাকে আদর করিতেই হইবে। কবি শিখাইয়াছেন যে, যে কারণেই সঞ্জাত হউক মহত্ত্ব কোনও শ্রেণীবিশেষের একায়ত্ত নহে, আচার-ব্যবহারে যেমনই পার্থক্য থাকুক নিম্নশ্রেণীর লোকরাও মহত্ত্বের আদর্শ হইতে পারে। মহত্ত্বের এমনি উজ্জ্বল আদর্শ—ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের “লখে ডোম্‌নী।” বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই হউক, অথবা সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষাতেই হউক সে বিষয় লইয়া তর্ক করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই, দেশের নিম্নস্তরের মানুষগুলিও এমন সকল সত্ত্বে সত্ত্ববান্ ছিল যে, আজ আমরা শিক্ষাগর্ব্বিত বাঙ্গালীর সন্তান সে মহত্ত্বের, সে শৌর্য্যের কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পারি না। যদিও আজকাল আমরা অধস্তন স্তরের জন্য মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি—মন্দের সেটাও ভাল—কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি যে, ঐ নিম্নস্তরেরও হৃদয় আছে, ধর্ম্ম আছে, গর্ব্ব করিবার মত মহত্ত্ব আছে, খুঁজিলে তাহা এখনও পাওয়া যায়। এখন যে সহানুভূতি তাহা অনেকটা দেখাইবার জন্য—অনেকটা নিজের গর্ব্ব করিবার জন্য অথবা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিবার জন্য, নয় তো patronize করিবার জন্য, মুরুব্বিয়ানা দেখাইবার জন্য। তখনকার সহানুভূতি হৃদয়োত্থ, তখন রাজপুত্র লাউসেন দলুই সরদার, কালু বীরকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে পারিতেন, তাহার বিপদে প্রাণ দিয়া সহানুভূতি করিতে পারিতেন, তাহার জন্য কাঁদিতে পারিতেন, সামান্য চাকর ভাবিয়া তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন না। দলুই সরদারও তাঁহার জন্য ভাবিতে, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিত। শুধু সে নয়, তাহার পরিবারের যে যে ছিল সে-ই লাউসেনের জন্য প্রাণ দিতে উৎসুক ছিল। বরং এই কালুবীরকেও একদিন তাহার পত্নী “লখে ডোম্‌নী” প্রভুভক্তির মহতী শিক্ষা দিয়াছিল। কলিঙ্গা ও কানড়া লাউসেনের পত্নী, তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল পতির রাজ্য-রক্ষার জন্য, ইহাও মহৎকার্য্য, ইহাতেও আমাদের শিখিবার ও ভাবিবার অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু ইহাতে তত মহত্ত্ব নাই যত মহত্ত্ব এই “লখে ডোমনীর” অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে, মহতী কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এবং অলৌকিকী প্রভুহিতৈষণায় প্রকাশ পাইয়াছে। আজকালকার দিনে কলিঙ্গা-কানড়ার আদর্শও ফেলিবার বস্তু নহে, কার্য্যকালে ধৈর্য্য ও বীর্য্য আমাদের রমণী-গণের শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই,—আজিকার পত্নীগণ স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া কেবল বিলাসিতার পথে অগ্রসর হইতেছেন, অসংযমের পথ উন্মুক্ত করিয়া লইয়া শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছেন, এ সময়ে কলিঙ্গা ও কানড়ার

আদর্শ চোখের সামনে রাখা আবশ্যক বৈ কি?

কিন্তু উহাদের অপেক্ষাও অনেক মহান্ আদর্শ "লখে ডোম্‌নী'। বাঙ্গালাসাহিত্য এখন সৌখীন সাহিত্যে দাঁড়াইয়াছে, তাই আর আজকাল এমন সব চরিত্র দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে না—ক্বচিৎ কদাচ কোনও প্রতিভাবান্ কবি যদি এক আধবার এই চরিত্রের কথা কহেন, অমনি যেন লজ্জিত হইয়া আপনাকে সংবৃত করিবার চেষ্টা করেন, কারণ আমাদের ধারণা হইয়াছে নিম্নস্তরের মানুষ মানুষ নয়, যা কিছু মনুষ্যত্ব আছে উচ্চশ্রেণীর "বাবুদের" ভিতর। কিন্তু আমি অকাতরে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে এই হীনজাতি-সম্ভবা "লখে" যে মহত্ত্ব দেখাইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা ভুলিতে বসিয়াছি। তাহার যে ত্যাগ তাহা আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি, কারণ ত্যাগকে আমরা মূর্খতা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, সংযমকে অসভ্যতা বা প্রাচীন কুসংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। যাহা আমাদের দেশে অতি প্রচলিত ছিল,—পুরাণাদি কথা-দ্বারা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা—তাহা এখন উঠিয়া যাইতেছে, তাই তাহাদের ভিতর যে সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে, সেদিকে আমরা দৃষ্টি করি না, কেবল depressed classes, depressed classes বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমরা তাহাদের চরিত্রগত মূল বস্তুগুলির প্রতি একেবারে দৃষ্টিহীন, তাই তাহাদের কোনও উন্নতিও হইতেছে না। পুরাণাদি-[illegible] ফলিত, তাহার উদাহরণ ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের "লখে ডোম্‌নী।" পুরাণের শিক্ষা কর্ত্তব্যবিমুখতার শিক্ষা নহে, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ফলাফল গ্রাহ্য না করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণতার শিক্ষা, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতার শিক্ষা, তাই লখে ডোমনী সেই কর্ত্তব্য সাধন করিবার উৎসাহে অকাতরে তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন, সাররত্নগুলি ধর্ম্মের মন্দিরে, কর্ত্তব্যতার দেউলে উৎসর্গ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিত-দানে প্রভুর মঙ্গল সাধিয়াছে, অপূর্ব্ব সুশিক্ষায় কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ স্বামী-পুত্রকে কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। লখের মুখে যে উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার এক একটীর দাম আজকালকার অনেকগুলি সমগ্র কাব্যসমষ্টির চেয়েও অধিক। সেই অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে, ডমরুধ্বনি শ্রবণ করিলে সর্পের মত আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ও নাচিয়া উঠে—সর্ব্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে অমনোযোগী যে আমরা, আমাদেরও ক্ষণেকের জন্য কর্ত্তব্য-বোধ জাগিয়া উঠে। লখে কালুবীরের প্রতি যে উপদেশ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা বিদ্যাভিমানী আমরা যদি কর্ত্তব্য স্থলে স্মরণ রাখিতে পারি, তাহা হইলে দেশের যথার্থ উপকার হয়, যদি অসংযমের শিক্ষা না দিয়া এমনি ধর্ম্মময় শিক্ষা আমরা স্ত্রীজাতিকে দিতে পারি, তবেই আমাদের স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ও উদ্যম সফল হইবে। তাই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে।

লখের উৎসাহ অদম্য, সে নিজে যুদ্ধ করিতেছে, অচেতন স্বামীকে পৌরাণিক উদাহরণ শুনাইয়া চেতন করিতে চেষ্টা

করিতেছে, তাহাকে কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ দেখিয়া কত ধর্ম্মসম্মত উপদেশ দিতেছে—

কেন রণ বিক্রম বিপক্ষে হ'লে হারা।
সিংহ হ'য়ে কও কেন শৃগালের পারা॥

* * * *

চিরকাল চাকর রাজার লুন খাও,
প্রমাদে ফেলায়ে পুরী পলাইতে চাও।
কেমনে এমন বোল বেরুল বদনে।
সে সব সেনের সত্যে তরিবে কেমনে॥
নিত্য যে পুরাণ শোন চিত্ত থাকে কোথা।
কালি কি শুনিলে কুরুপাণ্ডবের কথা॥

* * *

কোমর বান্ধিয়া নাথ যুঝ একবার।
রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ ধার॥
অধর্ম্ম আচরি বল কতকাল জীবে।
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ নিবে॥
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
পাছে বল এ মাগী নিষ্ঠুর কথা কয়॥
আয়ুদ্বয় না থাকিলে ঘরে বসে মরে।
সংসার স্বধর্ম্মশীল সব ঠাঁই ভরে॥
বীর হয়ে ঘরে থাকে রণে ভয়-মতি।
তবু তো মরণ আছে কিন্তু অধোগতি॥
আজি মর কিবা বা মরণ বর্ষশতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে॥
সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে চলে যাবে।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে॥

এততেও স্বামীকে উত্তেজিত করিতে না পারিয়া সে পুত্রকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আজ পুরুষগণ সুখলিপ্সু, কর্ত্তব্যবিমুখ, স্ত্রীগণ তাহাদের সুমতি-স্বরূপিণী, তাই পুত্রও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, আবার পরক্ষণেই নিজ স্ত্রীর প্ররোচনায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়া মায়ের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। লখে আজ প্রভুভক্তির বশ-বর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মের উপাসনায় একে একে দুইটী পুত্র বলি দিল। কিন্তু এততেও সে ভাঙ্গিয়া পড়িল না; কাঁদিল না বলিলে মাতৃ-হৃদয়ের অবমাননা করা হয়; মনুষ্যহৃদয়জ্ঞ কবি সে কথা বলেন নাই, সে তখন অভিমন্যুর মৃত্যুতে শক্রনিপাতে দৃঢ়সংকল্প অর্জ্জুনের উদাহরণ দানে আবার স্বামীকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল এবং এবার কৃতকার্য্যও হইল। ক্ষণিক উন্মত্ততায় ভ্রান্ত কালুবীর শেষে সত্যপালনার্থ নিজের মস্তক অকাতরে বিলাইয়া দিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে নিজের মহত্ত্ব বজায় রাখিয়া গেল। শেষে লখের এই স্বর্গীয় উত্তেজনা কলিঙ্গা ও কানাড়াকে গিয়া স্পর্শ করিল, এবং অসূর্য্য-স্পশ্যা রাজবধূদ্বয়কে বীরাঙ্গনাবেশে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ করিল। কলিঙ্গা যুদ্ধে প্রাণ দিল, কানাড়া দেশ হইতে শত্রু তাড়াইয়া স্বামীর রাজ্য নিষ্কণ্টক করিল। এতগুলি ঘটনা ঘটাইয়াছে—মহামদের স্বার্থপরতা, তাহার অকারণ বিদ্বেষবুদ্ধি; ইহাই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে মহামদের চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা।

আমাদের নীতিদাতা মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে, শিক্ষা যদি নীচ হইতেও পাওয়া যায় তাহা আদর করিয়া লইতে হইবে। আমরা সে নীতি আজকাল ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা নীচ জাতিকে ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না, কিন্তু তাহাদের কাছ হইতেও আমাদের শিখিবার অনেক বস্তু আছে। কবি ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে আমরা এই শিক্ষাটুকু পাইতে পারি। ইহাই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের

সৌন্দর্য্য এবং এই গুণে উহা বাঙ্গালীর স্মৃতি-মন্দিরে চিরোজ্জীবিত থাকিবার দাবী করিতে পারে। ধর্ম্মমঙ্গলের কবি কোনও একটা বিশেষ ভাব লইয়া বিভোর হইয়া বেড়ান নাই, তিনি সংসারাভিজ্ঞ সংসারের কবি, সংসারে ভালমন্দ যাহা দেখিতে পাইয়াছেন তাহাই আঁকিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ভিতর যেটুকু আধ্যাত্মিকতা ছিল তাহার দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছেন যে, মানুষ হইতে হইলে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না, সুখে উন্মত্ত হইলেও চলিবে না, ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্মের পথে বেড়াইলেও চলিবে না; স্বার্থ লইয়া কর্ত্তব্যকে ভুলিলে চলিবে না। তিনি দেখাইয়াছেন জগতে কেহই হীন বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে, সকলের ভিতরেই মহত্ব আছে, বাছিয়া লইতে জানিলে হয়। যদি কবিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিয়া তাঁহাকে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা এতদিন যাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম, তাঁহাদের আবার বুকের কাছে আনিয়া নিজেদের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিতে ও যথার্থ দেশের উপকার করিতে পারিব।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

পূর্ব্বরাগ—রূপলালসা

(অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনের ৬৩৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

যৌবন পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেই আমাদের মাধুর্য্যরস-আস্বাদনের যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে। এই যৌবনই মানব-জীবনের বসন্তকাল। বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতি যেমন নূতন বরণকীরণগন্ধে বিভোর হইয়া, নবজীবনের পসরা লইয়া, বিশ্বময় আপনাকে ছড়াইয়া দিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে, মানুষের দেহ-মনও সেইরূপ, এই প্রস্ফুটযৌবনপ্রাপ্তিতে, অপূর্ব্ব শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া, আপনাকে বহু করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়ে। এই যে নিজেকে বহু করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহাই শারীর তত্ত্বে প্রজননপ্রবৃত্তি নামে অভিহিত হয়। ঈশ্বর যেমন প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সেই ইচ্ছা হইতেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, জীবও সেইরূপ পূর্ণযৌবন প্রাপ্তিতে, প্রজাসৃষ্টির লালসায় চঞ্চল হইয়া উঠে। এই চাঞ্চল্য তার আত্ম-বিকাশেরই চেষ্টা মাত্র। এইজন্য ইহাতে নিয়ত এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জাগিয়া উঠে। আত্মবিকাশ আর আত্মচরিতার্থতা একই কথা। আপনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াই, জীব আপনার চরিতার্থতা লাভ করে। সে আপনার অংশবিশেষকে ফুটাইতে পারিলেই পরম তৃপ্তি লাভ করে না। তার সমগ্রকে, সম্পূর্ণরূপে, সে ফুটাইয়া তুলিতে চাহে। সে নিজেকে আপনার জ্ঞানের বিষয় করিবার

জন্য লালায়িত হয়। সে নিজেকে নিজের আনন্দের আশ্রয় ও উপজীব্য করিতে চাহে। আপনাকে আপনি ভোগ করিবে,—এই বাসনা তার অন্তরে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। যৌবনের সূচনার সঙ্গেই এই আত্ম-রতির আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণের ভিতরে অলক্ষিতে জাগিয়া উঠে। প্রথম যৌবনের প্রসাধন প্রয়াস, আপনাকে সুন্দর করিবার, শোভন করিবার, সাজাইবার সখ এই আত্ম-রতিরই লক্ষণ। বাল্যে জীব আহার্য্যাদি বাহিরের বিষয়ের মধ্যে আনন্দ অন্বেষণ করে। তখন তার খাইয়া শুইয়া, দেখিয়াই সুখ। বাহিরের জিনিষেই তখন তার সকলের চাইতে বেশী লোভ। কিন্তু যৌবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হয়। তখন সে বারংবার দর্পণোপরি আপনার প্রতিকৃতি দর্শন করিতে আরম্ভ করে। কিসে তার দেহের শোভা, মুখের লাবণ্য বাড়িবে তাহাই অন্বেষণ করে। তখনও সে অপরের আকর্ষণে পড়ে নাই। নিজেই নিজের টানে বাঁধা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু দর্পণে নিজের রূপ দেখিয়া ক্রমে আর তার তেমন তৃপ্তি হয় না। সে আপনাকে বাহিরে খুঁজিতে আরম্ভ করে। শৈশবে সে আদর কাড়িত, যৌবনে সে রূপ খুঁজিতে লাগিল। আর এই যে রূপের অন্বেষণ ইহা হইতেই ক্রমে মাধুর্য্যরস জাগিয়া উঠিয়া, উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তার জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে।

কিন্তু রূপ কখনও স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। সে যার তার রূপে তৃপ্ত হয় না। সে বাহিরে, অপরের ভিতরে, প্রকৃত পক্ষে, তার নিজের যে স্বরূপ তাই অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যতক্ষণ এই স্বরূপটী সে না পাইয়াছে, ততক্ষণ তার রূপান্বেষণের নিবৃত্তি হয় না। আমরা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন মানুষের রূপের আদর্শ কেন যে বিভিন্ন হয়, ইহার কারণ বুঝিয়া উঠি না। রূপের একটা সার্ব্ব-ভৌমিক আদর্শ আজও জগতে কেন প্রতিষ্ঠিত হইল না, ইহা ভাবিয়া লোকে বিস্মিত হয়। এইজন্য অনেকে রূপ-লালসাকে একটা অলীক মৃগতৃষ্ণিকার মতন নিতান্ত কাল্পনিক ও মায়িক বলিয়াও মনে করেন। রূপ বলিয়া জগতে কোনও বস্তু নাই—রূপের জ্ঞান বা ভোগ এই জন্য কদাপি বস্তুতন্ত্র হইতেও পারে না। বস্তুই যখন নাই, তখন আর বস্তুতন্ত্রতা আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু যে দিক্ দিয়া রূপের বস্তুত্ব উড়াইয়া দিতে পারা যায়, সেই দিক্ দিয়া স্বরূপেরও আর কোনও সত্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। রূপের আদর্শ যেমন সকলের এক নহে, এক হইতেই পারে না, আজি পর্য্যন্ত কোথাও এরূপ ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; সেইরূপ স্বরূপ বস্তুও তো সকলের এক নয়, এক হইতেই পারে না, আজি পর্য্যন্ত কোথাও জীবের এই স্বরূপের এরূপ কোনও নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য তো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি যাহা তাহাই তো আমার স্বরূপ। তুমি যাহা তাহাই তো তোমার স্বরূপ। আর আমি যাহা তুমি তো তাহা নহ। তুমি যাহা হাজার চেষ্টা করিলেও আমি তো ঠিক তাহা হইতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া তুমিও যে কোনও কিছু নহ, আমিও যে কোনও কিছু নহি; আমরা উভয়েই যে

একটা অহেতুক ও অজ্ঞাত স্বপ্নের ক্ষণিক খেয়াল মাত্র, এমন কথা তো বলিতে পারি না। আমি ঠিক তোমারই মতন না হইয়াও যেমন বস্তু, আমার একটা সত্তা ও সত্তা আছে; সেইরূপ আমার যে রূপের আদর্শ তাহা তোমার রূপের আদর্শের ঠিক অনুরূপ না হইয়াও যে সত্য ও আমি যে রূপ দেখি ও সম্ভোগ করি তাহা যে বস্তু, একটা ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি নহে, ইহাও সত্য। যদি আমার ভোগ্য ও ভাব্য এই রূপের বস্তুত্ব অস্বীকার কর, তবে আমার এই স্বরূপের অস্তিত্বও অস্বীকার করিতে হইবে। ফলত আমার চক্ষে যে রূপ ভাসিয়া উঠে, তার সঙ্গে আমার নিজের এই স্বরূপটীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী। আমার স্বরূপের ছায়াতেই, এই স্বরূপের ছাঁচেই, এই স্বরূপের সংকেত অনুসরণ করিয়া, এই যে ভিতরের স্বরূপ তাহাকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিবার ও প্রকট করিবার জন্যই আমার এই রূপের প্রকাশ হয়। দর্পণে যেমন আমি আমার মুখচ্ছবি দেখিতে পাই, অন্যথা তাহা দেখিবার আর কোনও উপায় আমার নাই, তেমনি আমার চক্ষু রূপ বলিয়া যাহাতে যাইয়া, মধুগন্ধমত্ত ভ্রমরের মতন, উড়িয়া গিয়া পড়ে, তারই মধ্যে আমি আমার ভিতরকার স্বরূপের প্রতিচ্ছবি দেখি। তাতেই সে আমাকে এমন করিয়া টানে। এ রূপ আমার ভিতরকে বাহিরে আনিয়া, আমাকে বাহিরে টানিয়া আনে। এ তো রূপ নয়, এ যে আমার অন্তরাত্মার দর্পণ। আমার নিজের রূপে, নিজনাভিগন্ধে মাতোয়ারা মৃগের মতন, আমি পাগল হইয়া, এই বাহিরের রূপেতে যাইয়া, অনলে পতঙ্গের মতন পুড়িয়া মরি। আর মরিতে মরিতে আপনাকেই বেশী করিয়া, ভাল করিয়া, পূর্ণতরভাবে ফিরিয়া পাই বলিয়াই এই রূপের আগুনে পুড়িয়া মরিতেও আমার এমন আনন্দ হয়। এই রূপতত্ত্বই জীবের আনন্দময় কোষের গূঢ়তম কথা। এই রূপতত্ত্বই সৃষ্টিতত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা। এই তত্ত্বেই "কহস্যাম প্রজায়েহতি"—এই প্রাচীন শ্রুতি-বাক্যের সত্য মর্ম্ম প্রাপ্ত হই। এই তত্ত্বেতেই, আবার, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বেরও নিগূঢ় সংকেত ও সত্য প্রামাণ্য পাইয়া থাকি।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
এই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বস্তু, শ্রীরাধা তাঁরই রূপ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যামৃতময়ী হইয়াই, তাঁহাকে এই আনন্দাস্বাদন করাইয়া থাকেন। কারণ সজাতীয় বস্তুই একে অন্যের আনন্দোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, বিজাতীয় বস্তুর এ অধিকার নাই। নিখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ রস, অনাদ্যনন্ত ভেদাভেদের বা আত্মবিভাগের বা 'Self-differentiation' এর দ্বারা রাধাকৃষ্ণ এই যুগল মূর্ত্তিতে নিত্যকাল আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শ্রীভগবানের এই নিখিলরসামৃতের পরম আশ্রয় শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকার এই অনাদ্যনন্ত প্রেমার একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের স্বরূপ; শ্রীরাধিকা

সেই স্বরূপেরই রূপ। এই রূপের মধ্যেই, এইজন্য শ্রীভগবান আপনার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ, তার আবার হ্রাসবৃদ্ধি কি? অথচ রূপ নিত্য নবভাবে বাড়িয়া উঠে। এইজন্যই

স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার—
"অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারা নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে
এ দর্পণের আগে নব নব রূপ ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য আর রাধার দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।

আর আপন মাধুর্য্যের এই নিত্য নব বিকাশ দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের তাহা আস্বাদন করিবার জন্য লোভ হয়। কিন্তু

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

এই যে স্বরূপের সঙ্গে রূপের ও রূপের সঙ্গে স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, তাহাই মাধুর্য্যের পরম তত্ত্ব ও চরম অর্থ। আমার চক্ষে যে রূপ ভাসিয়া উঠে, তাহা আমার স্বরূপেরই অংশ। এইজন্য এই রূপ আমার, তোমার বা অপরের সমান ভোগ্য হয় না। তোমার চক্ষে যে রূপ ভাসে, তাহা তোমার বিশিষ্ট যে স্বরূপ, তারই বহিঃপ্রকাশ, সুতরাং তোমার নিকটে সে রূপের প্রামাণ্য তোমার অন্তরঙ্গ আনন্দ, আমার চক্ষের বর্ণপরিচয় বা আকার-নির্ণয় নহে। এই রূপ যখন আমাদের চক্ষে ভাসিয়া উঠে, বিষয় রূপে আমাদের সম্মুখীন হয়, তখনই তাহা আমাদের অন্তরের আনন্দময় কোষকে যাইয়া আলোকিত করিয়া তোলে। তখনই আমরা আমাদের নিত্য আনন্দ স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করি। আর এই রূপের মধ্যে আমাদের স্বরূপের ছায়া দেখিয়া, সেই স্বরূপকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই আমরা পাগলপারা হইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া যাই।

রূপ সকলকেই লুব্ধ করে, অথচ একের চক্ষে যাহা সুন্দর, অপরের চক্ষে তাহা সুন্দর হয় না কেন? এইখানেই এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রাপ্ত হই। রূপ আমাদের স্বরূপেরই প্রতিচ্ছায়া, রূপাসক্তি প্রকৃতপক্ষে আত্মরতিরই একরূপ প্রকাশ। আর আমরা পরিচ্ছিন্ন, বিশিষ্টস্বভাবসম্পন্ন জীব বলিয়া, এই জীবত্বের ভূমিতে আমাদের স্বরূপও বিশিষ্ট ও পরস্পর হইতে পরিচ্ছিন্ন। আমার আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব, ইংরেজিতে যাহাকে personality বা individuality বলে, তাহাকেই এখানে আমি আমাদের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। বেদান্ত যাহাকে আত্মা বলেন, এ স্বরূপ সেই বস্তু নয়, এ স্বরূপ অহংতত্ত্বের উপরে পৌঁছায় না। আর আমরা যাকে রূপ বলিয়া লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াই, তাহা এই স্বরূপের, এই আমিত্বের বা personalityর, এই ব্যক্তিত্বের বা individualityরই প্রতিরূপ। যার যেমন এই আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব, যে ছাঁচে যাঁর এই পরিচ্ছিন্ন অহং

তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে, তার রূপের আদর্শও ঠিক সেইরূপই হয়। এই জন্যই আমার চক্ষে যাহা সুন্দর তোমার চক্ষে সর্ব্বদা তাহা সুন্দর নাও বা হইতে পারে। অন্যদিকে, আমার চক্ষে দশজন লোক যদি সুন্দর হয়, দশজন যদি আপন আপন রূপের টানে আমাকে আকর্ষণ করে, তাদের এই দশটী রূপের বা মূর্ত্তির তুলনা করিলে অনেক সময় দেখিয়া আশ্চর্য্য হই যে তাদের প্রত্যেকের মুখছবিতে বা দেহগঠনে একটা না একটা সাধারণ ভাব হয় প্রস্ফুট না হয় লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই দশ জন লোকের মুখাকৃতি দশ প্রকারের, তাঁদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, দেহগঠনেও মোটের উপরে আপততঃ কোনও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে প্রায়ই দেখিতে পাই যে, ইহাদের প্রত্যেককেই কোনও না কোনও একটা অবস্থায়, আমার দৃষ্টির কোনও না কোনও একটা বিশেষ angleএ দেখিতে পারিলে, তাদের রূপের ভিতরে একটা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সামান্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই angleটী ঠিক করা কঠিন। ঘটনাক্রমে কখনও তাহা আপনা হইতেই হঠাৎ একদিন না একদিন ধরা পড়িয়া যায়। নতুবা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানাভাবে, নানা অবস্থায়, তাদের লক্ষ্য করিয়া এই সামান্য ধর্ম্মটী অন্বেষণ করিলে পরে, তাহা ধরিতে পারা যায়। মোট কথা এই, আমাদের অভিজ্ঞতার কোনও কিছুই অহেতুক বা অনর্থক নহে। এই যে আমার চক্ষে একটী লোককে বড় মিষ্টি লাগে, অপরের চক্ষে সে তেমন মিষ্ট বোধ হয় না, ইহারও একটা না একটা কারণ অবশ্যই আছে। আর মিষ্টি-লাগা ব্যাপারটাকে যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে মানবের দেহ-মনের কোনও না কোনও একটা পিয়াসা বা প্রবৃত্তিকে পূর্ণ বা চরিতার্থ করিয়াই কোনও বস্তু বা বিষয় তাহাকে সন্তোষ বা আনন্দ দান করিতে পারে। মিষ্টি-লাগার বা তৃপ্তির বা আনন্দের অন্য কোনও হেতু নাই, থাকিতেই পারে না। যার ভিতরে যে বস্তু আস্বাদনের শক্তি বা ইন্দ্রিয় নাই, সে বস্তু বাহির হইতে কিছুতেই তাহাকে কোনও তৃপ্তি বা আনন্দ দান করিতে পারে না। কোনও বস্তু সম্ভোগ করাই তাহাকে আত্মসাৎ করা। যতক্ষণ কোনও বস্তুকে সম্যক্‌রূপে আত্মসাৎ করিতে না পারিলাম, ততক্ষণ তাহা হইতে কখনই পূর্ণমাত্রায় সন্তোষ বা আনন্দলাভও করিতে পারি না। আর আমার আত্মার সমধর্ম্মাপন্ন যাহা নহে, তাহাকে কদাপি আমার পক্ষে আত্মসাৎ করাও সম্ভব নহে। আত্মা এখানে অন্নময় কোষরূপেই প্রতিপন্ন হউক, কিম্বা প্রাণময় বা মনোময় বা বিজ্ঞানময় বা আনন্দ-ময় কোষরূপেই প্রত্যক্ষ হউক, আমরা প্রকৃত যে কোষাতীত তুরীয় আত্মতত্ত্ব তাহারই সাক্ষাৎকারে এই সকল অধ্যাস বিনষ্ট হইয়া, এই আত্ম-বস্তু পরমতত্ত্বরূপেই অনুভূত হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যে ভাবেই আত্মাকে দেখ না কেন, তার অনুরূপ বিষয় দানে ও তাহাকে সেই বিষয়কে আত্মসাৎ করিবার অবসর দিয়াই কেবল তৃপ্ত ও আনন্দিত করিতে পার। অন্যথা আনন্দ সম্ভবে না। এই ব্যাপক অর্থে, জাগতিক রূপ-লালসাও আত্মরতিরই নামান্তর ও

আকারান্তর মাত্র। ইহারও মধ্যে রূপের মধ্যে স্বরূপের আত্মান্বেষণ ও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। নতুবা রূপে এত আনন্দ থাকিত না। এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই উপনিষদ ব্রহ্মানন্দকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও জীবের মৈথুনজনিত যে আনন্দ তাহাকেও সেই শুদ্ধচিন্ময় ভূবায়ানন্দের পরিমাণ-দণ্ডরূপে ব্যবহার করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠাও বোধ করেন নাই। কারণ আনন্দ মাত্রেতেই (অজ্ঞাতসারেও) আত্মাই কেবল আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। জীব যত কেন মোহাচ্ছন্ন হউক না, চিদংশে সে যেমন ব্রহ্মচৈতন্যেরই অনু প্রকাশ, সেইরূপ সে যত কেন নিকৃষ্ট হউক না, আনন্দাংশে সে সেই ব্রহ্মানন্দেরই ভোক্তা। ব্রহ্মাণ্ডে যদি দুই সত্তা বা সত্য, দুই জ্ঞান বা চৈতন্য, দুই আনন্দ বা রতি থাকিত, তবে অন্য কথা বলা সম্ভব ও সঙ্গত হইত। কিন্তু যারা অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাস করেন, সে অদ্বৈততত্ত্ব শুদ্ধই হউক আর বিশিষ্টই হউক, দ্বৈতাদ্বৈতই হউক, আর ভেদাভেদযুক্তই হউক,—তাদের পক্ষে জীবের সকল আনন্দই যে ব্রহ্মানন্দের স্বল্পাধিক কণা,—জীবসকল যে এতস্যানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি—এ কথা অস্বীকার করা অসাধ্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রেখা-চিত্র

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

নবাব-সরকার বা ইংরাজ রাজসরকার এ উভয়ের কোথাও হইতে কোন প্রকার রাজ সম্মান লাভ না ঘটিলেও ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর বাঙ্গালাদেশের আপামর সাধারণ জনমণ্ডলীর নিকট 'প্রিন্স" এই উচ্চ অভিধানে অভিহিত ও সর্ব্বসমক্ষে ঐ রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার নাম জানে, সে তাঁহাকে প্রিন্স বলিয়াই জানে।

তাঁহার নামের গোড়ায় এই মহাসম্মান জনক 'প্রিন্স' শব্দ কেমন করিয়া সংযুক্ত হইল? ইহার একটা কারণ এই যে তিনি অসামান্য রূপবান পুরুষ ছিলেন। রূপবান পুরুষও আরও অনেক ছিলেন, সকলের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ ছিলেন বলিলেও প্রিন্স শব্দ প্রয়োগের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় না। যদি বলা যায়, তাঁহার চাল-চলন, রকম-সকম, ভাব-ভঙ্গী, তাঁহার কায়দা কেতা, কথা-বার্ত্তা, রীতি-নীতি প্রিন্সের মত ছিল, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ উপাধি-অর্জ্জনের দাবি-দাওয়া কতকটা প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নহে, কারণ ঐরূপ দাবিদাওয়াবিশিষ্ট লোক যে তাঁহার সময়ে আর কেহ ছিলেন না, তাহাও বলা যায় না। রূপ ও ভাব-ভঙ্গী ৺কালী-প্রসন্ন সিংহ মহোদয়েরও ছিল, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেবেরও ছিল, আরও আশে পাশে দু'চারিজনের ছিল। তবে দ্বারকানাথ

ঠাকুরই কেন 'প্রিন্স'পদবাচ্য হইলেন? তাহার কারণ অবশ্যই ছিল।

প্রথম কারণ—তিনি তাঁহার সময়ে আপন বুদ্ধিবলে অসামান্য ক্ষমতা ধারণ করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধপক্ষ যখন ধর্ম্ম-সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই ধর্ম্ম-সভার প্রতিষ্ঠার মূলে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা পরিদৃষ্ট হয়, পরে যেই তিনি আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মসভার নেতৃত্ব ত্যাগ করিলেন ও রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ধর্ম্মসভা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, আর ব্রাহ্মসভা শক্তি লাভ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিল। এতেই বুঝা যায় যে, তিনি নিজে একটা বৃহৎ শক্তি-কেন্দ্র ছিলেন। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত থাকিতেন সে স্থানটা যেন তাঁহার প্রভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত, এখনকার বড় লোকদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, আর তিনি যেখানে উপস্থিত হইতেন, সে স্থানটা যেন নত মস্তকে তাঁহার উপস্থিতি স্বীকার করিয়া লইত। এরূপ প্রভাববিশিষ্ট মানুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তারপর তিনি যে কাজে হাত দিতেন, সে কাজ যেন আপনা আপনি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহারই বশ্যতা স্বীকার করিত। এই দিক দিয়া আমাদের স্যর আশুতোষ কতকটা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধাতুর পরিচয় দিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

প্রিন্স দ্বারকানাথের গুণ-গৌরবের বিবরণও নিতান্ত অল্প নহে। বহুপদস্থ ব্যক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য দীন-দরিদ্রও তাঁহার স্নেহ ভালবাসা উপভোগ করিত। একদিকে লালা বাবুর অপরিমেয় সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ ৺গোপীনাথ রায় (টাকির মুন্সি) তাঁহার সুপরামর্শের অধীন হইয়া চলিতেন, এবং সেই কাল হইতে রায় কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারকানাথের স্নেহভাজন সুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। অপর দিকে তিনি তাহার বাল্য-সুহৃদদিগের আশ্রয়স্থল স্বরূপ ছিলেন। দুইটি ঘটনা ইহার সাক্ষ্যরূপে আজিও বর্ত্তমান। একবার একটি বাল্যসুহৃদকে ইংরাজ-দপ্তরে একটা বড় চাকরী করিয়া দেন। সে লোকটি বড়ই ব্যয়শীল, অর্থাৎ রেখে ঢেকে খরচ করিতে জানিত না, অর্থবিষয়ে কতকটা উচ্ছৃঙ্খল, তাই কোনও দিনই তাহার আয়ব্যয়ের মিল থাকিত না, দুঃখ কষ্ট-অনটন সর্ব্বদাই তার সঙ্গের সঙ্গী, আর ঋণ ভার বৃদ্ধি হইয়া তাহার জীবন ভারবহ করিয়া তুলিয়াছিল। দু'চারিটা দেনার ডিক্রী সর্ব্বদাই তাহার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিত। এমন অবস্থায় সর্ব্বদাই তাহাকে মধ্যে মধ্যে আফিসে অনুপস্থিত থাকিতে হইত। কোন কোন সময় ফরাশডাঙ্গায় পলাইয়া গা ঢাকা দিতেন। আফিসের বড়কর্ত্তা সাহেব বিরক্ত হইয়া তাহার কর্ম্মে এক যোগ্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ এই বিপৎপাত অবগত হইয়া তাহার ডিক্রীগুলির পরিশোধের ভার লইলেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার আফিসে গিয়া তাহার স্থানে তাহাকে বসাইয়া দিয়া উপরওয়ালা সাহেবের হুকুম রদ করাইয়া পরে নিরস্ত হইলেন। প্রিন্স-পদবাচ্য দ্বারকানাথের এই দরিদ্রবন্ধু-সেবা আজ-কালকার দিনে আর দেখিতে পাইব না।

অপর ঘটনা। বাল্যকালে পাঠশালায়

পড়ার সময় জোড়াসাঁকো অঞ্চলের একটি গরিব ছেলে তাঁহার সঙ্গে পড়িত ও তাঁহার পাঠে সাহায্য করিত। উত্তরকালে যখন বালক দ্বারকানাথ প্রিন্স, তখন সতীর্থ বালক অধুনা বার টাকার বিল সরকার একদিন বিলের টাকা আদায় করিতে সেই সহাধ্যায়ী দ্বারকানাথের সম্মুখে উপস্থিত। কত কাল চলিয়া গিয়াছে। স্মরণ থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। দ্বারকানাথ টাকা দিবার সময় পুনঃপুনঃ লোকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আর বিল সরকারের আত্মারাম শুকাইয়া যাইতেছে; বারবার বেশ নিবিষ্ট চিত্তে তাহাকে দেখিয়া প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় কোথায় দেখেছি?" সে ব্যক্তি ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল "আজ্ঞে আপনি রাজার রাজা, আর আমি সামান্য লোক। আমাকে আপনার দেখার কোন সম্ভাবনা নাই।"

প্রিন্স ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি পরিচয়প্রার্থী হইয়া যতই পীড়াপীড়ি করিতেছেন, সে ব্যক্তি পরিচয় দিতে তাই কুণ্ঠা বোধ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিতেছে, আর বলিতেছে, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকার বা পরস্পরের জানার কোনও সম্ভাবনা নাই।" দ্বারকানাথ বিল পেমেণ্ট বন্ধ করিয়া বলিলেন "তোমার ঠিক পরিচয় ও আমার সঙ্গে কখনও কোন কালে জানা-শুনা ছিল কি না, তাহা না বলিলে, টাকা দিব না।" তখন সে ব্যক্তি ভয়ে কম্পিত কলেবরে আত্মপরিচয় দিয়া বলিল "মহারাজ ছেলেবেলা এক পাঠশালে কিছুদিন পড়িয়াছিলাম, আর সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইলে আপনার পড়া বলিয়া দিতাম।" প্রিন্স, "তাই বল, তুমি অমুক?" লোকটি আরও ভয়ে ভীত হইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার মণিমুক্তাখচিত ঝালর-আঁটা সামিয়ানাতলে দুগ্ধফেণনিভ শয্যাশোভিত পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া সেই দীনদরিদ্র বাল্যসুহৃদের হাতখানি ধরিয়া টানিয়া নিজ শয্যায় বসাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, আর সে ব্যক্তি আজানু ধূলাভরা হাটা-ফাটা পায়ে সে নবাবী গালিচার উপর পদার্পণ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত, তাই কিছুতেই সেদিকে যাইবে না; কম্পিত কলেবরে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! কেমন সুন্দর দৃশ্য! এই দ্বারকানাথই প্রিন্স ছিলেন। প্রিন্স পীড়াপীড়ি করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে নিজের নিকট বসাইলেন। সে ব্যক্তি নিতান্ত ম্রিয়মান, কুণ্ঠিত ও কাতরভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন তাহাকে সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন "বল ত ভাই ক'টাকা মাইনে পাও।" সে ব্যক্তি বলিল "আজ্ঞে, বার টাকা।" প্রিন্স বলিলেন "এতেই চলে?" বন্ধু "আজ্ঞে অতি কষ্টে এক বেলা খেয়ে কোন রকমে বাঁচিয়া আছি।" দ্বারকানাথ বলিলেন, এখন "আফিসে যাও, রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া বৌদিদির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে, কয়টি টাকা হইলে, বেশ সুবিধামত মাস মাস দিন চলিয়া যায়। তার পর সকালে সেই সংবাদ আমাকে জানাইবে।" বলিয়া বন্ধুকে আগামী কল্য পুনরায় আসিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। পরদিন সেই ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, ঘরে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, মাসে ৩০৲টি টাকা হইলেই আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে।"

প্রিন্স তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাস মাস ত্রিশ টাকা পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া দিলেন—"প্রতি মাসে ৩০৲ টাকা আমার নিকট পাইবে। চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিদিন আহারান্তে অপরাহ্ণে আমার এখানে আসিয়া ছেলেবেলার গল্প করিবে, তোমার আর অন্য চাকুরি করিতে হইবে না।" কেমন স্নেহ, কেমন উদারতা।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের যশে গৌরবে যখন কলিকাতা সমাজ টলমল, তখনই কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত, ও এদেশীয় যুবকগণকে পাশ্চাত্যপদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। তদানীন্তন সকল শিক্ষার আয়োজনের পশ্চাতে প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার বিরাজ করিতেন। মধুসূদন গুপ্ত প্রথম হিন্দুযুবক হেয়ারের উৎসাহপূর্ণ উপদেশে সাহস করিয়া শবব্যবচ্ছেদে অগ্রসর, কিন্তু তথাপি সাহসে কুলাইতেছে না, প্রিন্স এবং অন্যান্য অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সে দিন তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই মহদনুষ্ঠানে উৎসাহ দান করিয়া ছিলেন, তথাপি মধুসূদনের হৃদয়ে পূর্ণসাহস আসিতেছিল না। কলিকাতার দুর্গপ্রাচীর হইতে মধুসূদনের সম্মানার্থে তোপধ্বনি হইবে সকলেই সে জন্য মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, বিলম্ব দেখিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় অগ্রসর হইয়া মধুসূদনকে সাহস দিবার জন্য অস্ত্র একখানি অস্ত্র হাতে লইয়া শব-অঙ্গে বসাইয়া দিয়া ছাত্রের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবামাত্র মধুসূদন অগ্রসর হইয়া শবে অস্ত্রাঘাত করিলেন। তাই আজ ক্রমে পারদর্শী চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাহা না হইলে, হয় ত, আজিও অস্ত্রবিদ্যাবিমুখ কবিরাজগণের ন্যায় ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ অস্ত্রবিদ্যায় বঞ্চিত থাকিতেন।

একবার চিৎপুরের বাজারে আগুন লাগিয়া অসংখ্য লোকের যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইতেছে এমন সময়ে সেই পথ দিয়া টাকির স্বনামধন্য দানশৌণ্ড ৺বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সি মহোদয় টাকির বাবুদের কালেক্টরীর খাজনার টাকা আলিপুরে চালান লইয়া যাইতেছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির নাম শুনিবামাত্র বাজারের লোক কপালে করাঘাত করিতে করিতে তাঁহার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। বৈকুণ্ঠনাথ আত্মবিস্মৃত হইয়া কল্পতরুর ন্যায় টাকা বিতরণ আরম্ভ করিলেন; অবশ্য বাজারটা তাঁহাদের নহে। দিতে দিতে খাজনার টাকা সব ফুরাইয়া গেল। তখন বৈকুণ্ঠনাথের চৈতন্য হইল। পরদিন সেই লাখ্ লাখ্ টাকা দিতে না পারিলে, জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইবে। নিরুপায়। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ কালীনাথের নিকট সংবাদ পাঠাইতেও ভয় হইল। ভাবনার ভারে বিব্রত হইয়া প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বলিলেন, যত বড় বিপদ হউক না কেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর দমিয়া যাইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিকারপরায়ণ হইলেন। গভর্ণর-জেনারেল ব্যাপার অবগত হইয়া প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন, প্রথমে এ ব্যাপারে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, পরে যখন ঘটনাটা যথার্থ সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইলেন, তখন

বৈকুণ্ঠনাথের হৃদয়ের বিস্তৃতি ও গভীরতা অনুভব করিয়া, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রিন্সের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারকানাথ খাজনার টাকা দাখিল করিবার জন্য সময় চাহিলেন। গভর্ণর-জেনারেল তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় সময় মঞ্জুর করিয়া এক হুকুমনামা জারি করিয়া দিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের এমনই উচ্চ প্রতিষ্ঠা ছিল।

প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রিন্সের অনেক ঘটনা বর্ত্তমান, সে গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ সংগ্রহ ও আলোচনা একদিনে এক প্রবন্ধে হয় না। সেকালের সুপ্রিমকোর্টের জজেরা, গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সেলের মেম্বরগণ সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিলেন, এবং তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, প্রিন্স কথাটার সৃষ্টি তাঁহারাই করিয়াছিলেন। যত বড় পদস্থ লোক হউক না কেন, তাঁহার সম্মুখে যেন হীনবুদ্ধি, হীনপ্রভ ও অবনত ভাব অনুভব করিত। তাই অনেক সময়ে বজরা আরোহণে জলবিহারে জজেরা সখ করিয়া দাঁড় টানিলে তিনি আরাম চেয়ারে বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতে করিতে বাহবা দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ইহাও সামান্য কথা, ইহাপেক্ষা বৃহত্তর ও উচ্চতর স্থানে যেরূপভাবে বিচরণ করিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। পদমর্য্যাদায় তিনি বড়র বড় ছিলেন, তাই "প্রিন্স" কথাটা তাঁহার নামের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়াছে। তিনি সত্যই প্রিন্স ছিলেন।

দ্বারকানাথের সম্বন্ধে আর একটি অতি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী সহৃদয়তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। কলিকাতায় সে কালে সরিফ্-সেলে যে সকল সম্পত্তি বিক্রয় হইত সেই সকলের অধিকাংশ স্বর্গীয় মতিলাল শীল আর দ্বারকানাথ ঠাকুর ক্রয় করিতেন। মতি শীলের ক্রয় করা সম্পত্তির অধিকার লাভের সময়ে সঙ্গে অনেক লোকজন যাইত। কিন্তু প্রিন্স অনেক সময়ে একাকী এক দ্বারবান সঙ্গে সম্পত্তি দখল করিতে যাইতেন, এ বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত প্রভাবশালী রাজা রামমোহনের শিষ্য ছিলেন।

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একখানি শোভনদৃশ্য অট্টালিকা দেনার দায়ে সরিফ-সেলে বিক্রয় হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই বাটী ক্রয় করেন। এক দ্বারবান সঙ্গে লইয়া তিনি সেই বাড়ীখানি দেখিতে ও দখল করিতে যান। সদর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বাড়ীর অবস্থা, সজ্জিত পূজার দালান, বৈঠকখানা ইত্যাদি দেখিতেছেন, এমন সময়ে সেই বাড়ীর আড়াই বৎসর বয়স্ক বালকপুত্র মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া উপরের তালার ঝিলিমিলির পশ্চাৎ হইতে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা! এরা কারা!" জননী অশ্রুসিক্ত মুখে, কাতর দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া ও সেই কোমল কমল-মুখ চুম্বন করিয়া ও তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "বাবা, আমাদের এই বাড়ী বিক্রি হইয়া গিয়াছে, যারা কিনেছে, তারা বাড়ী দখল করিতে আসিয়াছে"। বালক বলিল "মা! কোথায় থাক্‌বো?" জননী আকুল হৃদয়ে সম্ভব মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন "বাবা, ভগবান যেখানে রাখবেন সেইখানেই থাক্‌তে হবে।"

প্রিন্স মা ও ছেলেব এই কথা শুনিতে পাইয়া নিকটে দণ্ডায়মান জনৈক প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন “যে ছেলেটি কথা কহিতেছে, ও কে?” প্রতিবেশী বলিল, “যাঁহাব বাড়ী, তাঁহাবই আড়াই বৎসব বয়সেব ছেলে।” প্রিন্স পুনবায় জিজ্ঞাসা কবিলেন, “উহাব আব কে আছে?” প্রতিবেশী বলিল, “ওব মা আছে উহাদেব আব কেহ নাই।” দ্বাবকানাথ একবাব বালককে একবাব আনিতে বলিলেন। বালক মায়েব কোল ছাড়িয়া কিছুতেই আসিবে না, অনেক পীড়াপীড়িব পব যদিও আসিল, প্রিন্সকে দেখিয়া, তাঁহাব সুন্দব বাবরিকাটা কেশগুচ্ছধৃত অনুপম সৌন্দর্য্যশোভিত মুখেব দিকে, যে দিকে অনেক দেশ ও সম্মানিত বিবাট পুরুষও সাহস কবিয়া পূর্ণ দৃষ্টিপাত কবিতে সাহস কবিত না সেদিকে তাকাইতে চাহিল না। ভয়ে জড়সড় হইয়া যাহাব কোলে ছিল তাহাকে আকড়াইয়া ধবিয়া মুখ লুকাইয়া বহিল। কিছুতেই মুখ তুলিবে না, চাহিয়া দেখিবেও না। দ্বাবকানাথ কি আশ্চর্য্য কৌশল জানিতেন সহজে আপনাব যে বুদ্ধিবলে বড বড় লোককে বশে বাখিতেন সেই অজ্ঞাত কৌশল-জাল বিস্তাব কবিয়া বালকেব ভয় ভাঙ্গিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বালককে দেখিয়া তাঁহাব স্নেহেব উদয় হইয়াছে, উহাকে একবাব ক্রোড়ে লইবাব ইচ্ছাব উদয় হইয়াছে। ক্ষণকাল অতি স্নেহভবে তাহাব পৃষ্ঠে হাত দিতে দিতে তাহাকে একটু বশে আনিলেন, তখন বালক সভয়ে উঁকি মাবিয়া তাঁহাব দিকে তাকাইতেছে। ক্রমে সম্পূর্ণরূপে তাহাব ভয় দূব কবিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। তখনও সে বালক তাঁহাব দিকে তাকাইতে পাবিতেছে না। যথেষ্ট আদব ও স্নেহ দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি তোমাব মাকে কি বলিতেছিলে?” সে বলিল, উত্তবে মা কি বলিয়াছেন, তাহাও বলিল যে, তাহাব কোথায় থাকিবে জিজ্ঞাসা কবায় তাহাব মা বলিতেছিলেন, “বাবা, ভগবান যেখানে বাখবেন, সেইখানে থাকবো।” প্রিন্স দ্বাবকানাথ স্নেহবিগলিত আর্দ্রহৃদয়ে ও মধুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, “তোমাব মা'কে বলগে ভগবান তোমাদিগকে এই বাড়ীতেই বাখলেন। আমি এ বাড়ী তোমাকে দিয়ে গেলাম। এ বাড়ী থেকে তোমাদেব বাহিব হ'তে হবে না।”

শ্রীচণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারী-সমস্যা

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মনুষ্যসমাজে কন্যা অপেক্ষা পুত্র অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে—ইহা আজকাল সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশেব আদম-সুমাবীব বিবরণ ও জন্মমৃত্যুসংখ্যার আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। আমাদেব ভারতবর্ষেও তাহাই দেখিতে পাইতেছি।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বিখ্যাত ডারুইন সাহেব ইউরোপের বিভিন্নদেশের পুত্রকন্যা জন্মসংখ্যার তুলনা করিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন। পশুপক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষই বেশী সংখ্যায় জন্মায়, তাহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন *। কিন্তু সে বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করা বিশেষ সহজ নহে, তাহাও তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

কিন্তু কন্যা অপেক্ষা পুত্র যেমন জন্মগ্রহণ করে বেশী, মরেও তেমনই সংখ্যায় বেশী। প্রায় সকল সভ্যদেশেই কন্যা অপেক্ষা পুত্রের মধ্যে মৃত্যুর হার এত বেশী যে, জন্মগ্রহণকালে যদিচ পুত্রের সংখ্যাই বেশী থাকে,—কিন্তু কিয়ৎকাল পরে কন্যার সংখ্যাই বেশী হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী। হিন্দুসমাজেও কন্যা অপেক্ষা পুত্রই বেশী মরে—কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার মত অত বেশী মরে না। ফলে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী না হইলেও প্রায় সমান সমান। কেন যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ তুলনায় এত বেশী মরে, তাহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা অনেক পণ্ডিতই করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মতের বিভিন্নতাও যথেষ্ট আছে। তবে মোটামুটি নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রায় অনেকেই সম্ভবপর মনে করেন বলা যায়।

(১) কন্যা অপেক্ষা পুত্রের জীবনীশক্তি কম। সেইজন্য জন্মগ্রহণের পর প্রাকৃতিক বা সামাজিক নানা প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া কন্যা যে পরিমাণে টিকিয়া থাকিতে পারে পুত্র তাহা পারে না। তাহার ফলে কন্যার তুলনায় পুত্রই বেশী মরে।

(২) জীবিকার জন্য স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষকেই বেশী খাটিতে হয়। প্রায় সকল দেশেই অল্পবিস্তর (যেখানে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে সেখানেও) পুরুষদিগকেই কাজের জন্য বাহিরে থাকিতে হয়, দেশদেশান্তরে যাইতে হয়, নানা বিপদসঙ্কুল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। অধিকাংশ পরিশ্রমসাধ্য আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্যে তাহাদিগকেই ব্যাপৃত থাকিতে হয়, যুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় অকালমৃত্যুজনক ব্যাপারে তাহারাই লিপ্ত হয়। আর স্ত্রীলোকদিগকে প্রায়ই গৃহকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়; পরিশ্রমও কম করিতে হয়, দেশান্তর-গমনেরও তেমন প্রয়োজন হয় না। আর এই সকল কারণে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই বেশী রোগাক্রান্ত হয়, তাহাদেরই মরিবার বেশী সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

(৩) কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানদের শরীর ও মুণ্ডের আয়তন সাধারণতঃ বেশী। কাজেই প্রসবনির্গমনের সময় কন্যার অপেক্ষা পুত্রেরই আঘাত লাগিবার ও শারীরিক অনিষ্টের সম্ভাবনা বেশী। ইহার ফলে জন্মগ্রহণের পর পুত্রসন্তানেরা অধিক দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হয় ও অধিক মরে। যে সকল সন্তান গর্ভ হইতেই মৃত অবস্থায় পতিত হয়, তাহাদের মধ্যেও সেই কারণে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়।

এই সকল কারণে অধিকাংশ সমাজেই

* Sexual Selection—Ch. VIII.

পুত্রের অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপে ও আমেরিকার প্রায় সকল সভ্যদেশেই এই নিমিত্ত পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। স্কটলাণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খবই বেশী। সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান থাকাই বোধ হয় স্বাভাবিক নিয়ম। যেখানেই এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, স্ত্রীর সংখ্যা কি পুরুষের সংখ্যা অত্যধিক হইবে, সেখানেই তাহার ফলে সমাজের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর অবস্থার কিছু রূপান্তর হইবে। যে জাতির মধ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সেই জাতির মধ্যে ধ্বংসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন। পক্ষান্তরে যে সকল সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেখানে এই আধিক্যের পরিণাম যে ভাল, তাহা বলা যায় না।

প্রথমতঃ, যেখানে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কম সেখানে অনেক স্ত্রীলোকের বিবাহ হইতে পারে না। যে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে তাহার কথা অন্যরূপ। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টীয়সভ্যতা-প্রধান দেশসমূহে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। ফলে অনেক স্ত্রীলোককেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। আর বিবাহার্থিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বিবাহার্থী পুরুষের অপেক্ষা বেশী হওয়াতে অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সেই হয়। স্কটল্যাণ্ডে ৬০।৬৫ বৎসর বয়সেও স্ত্রীলোকদের বিবাহ হইতে দেখা যায়;—আর এরূপ বিবাহের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। আমরা এখানে একটু নমুনা দেখাইতেছি। মিঃ গেন্ ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্ট (১৯০১) ইউরোপের কয়েকটী দেশের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদের সংখ্যার সঙ্গে ভারতের বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের সংখ্যার তুলনা করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কা প্রতি দশহাজার স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহিতাদের হার এই সকল দেশে নিম্নলিখিতরূপ :—

	অবিবাহিতা	বিবাহিতা	বিধবা
স্কটল্যাণ্ড	৮৬২৩	১৩৬০	১৭
জার্ম্মাণী	৯১০৭	৮৭৭	১৬
হাঙ্গেরী	৫৪১৩	৪৪৬১	১২৭
ভারতবর্ষ	১৪৯	৮১৯১	১৬৬০

সমাজে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যার এত আধিক্য যে নৈতিক হিসাবে খুব ভাল, তাহা নহে। সমাজে আইনতঃ বহুবিবাহ বন্ধ করা এরূপ স্থলে সহজ নহে। আর তাহার ফল নৈতিক অবনতি, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি। কিছুদিন পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে ইংলণ্ডে নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যে একটা দশম বাৎসরিক তালিকা দাখিল করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, জারজসন্তানের হত্যাপরাধে অপরাধিনী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। অষ্ট্রীয়ায় ত জারজ সন্তান সরকার হইতে প্রতিপালন করিবার জন্য ব্যবস্থাই করিতে হইয়াছে।*

দ্বিতীয়তঃ, অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদের এত আধিক্যের ফলে, সেই সকল অবিবাহিতা

* ভূপ্রদক্ষিণ—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার প্রণীত।

স্ত্রীলোকদিগকে নিজেদের জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। বিদ্যা, জ্ঞান, শিল্পপটুতা প্রভৃতি সকলবিষয়েই এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। এমন কি রাজনৈতিক সত্ত্ব ও অধিকার লাভের জন্যও তাহারা পুরুষদের সঙ্গে দ্বন্দ্ববিগ্রহ করিতে ছাড়িবে না। Suffragettes বা রাজনৈতিক সত্ত্বপ্রার্থিনী রমণীদের অভ্যুদয়েই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যাইতেছে। এই প্রতিযোগিতার সংগ্রাম ভোট-প্রার্থিনীর দল এতদূর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে যে, তাহা সমাজের পক্ষে এক প্রকার ভয়াবহ ও অশান্তিকর ব্যাপারই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার, রমণীগণ পুরুষদের ন্যায় দর্শন-বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলে বা রাজনৈতিক কূট-চর্চ্চায় পারদর্শিতা লাভ করিলে তাহা যে গার্হস্থ্যজীবনের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে, এ বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল লোক সন্দেহ করেন। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চর্চ্চার ফলে স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়, কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইহাও বলেন। ফ্রান্সে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে বলিয়া আজকাল সেখানকার দেশনায়কগণ ভবিষ্যতের জন্য কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তথাকার রমণীগণের অতিরিক্ত Intellectualism বা মানসিকতাই ইহার কারণ। ইউরোপের কাইসার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালনই স্ত্রীলোকদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। সুতরাং নারীগণের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে সর্ব্বত্রই একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাত প্রকৃতিরই নিয়ম। কোন কার্য্যের প্রতিক্রিয়া যে কিরূপভাবে হয়, তাহা ভাবিলে অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয়। আমরা কতকটা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদের সংখ্যার আধিক্যের ফলে, প্রত্যক্ষে না হোক্, পরোক্ষভাবে, তাহাদের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ও ভোটপ্রার্থিনীর দল প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই সকলেরই প্রতিক্রিয়ার ফলে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা যে হ্রাস হইয়া যাইবে না তাহা কে বলিতে পারে? বরং এইরূপ হওয়াই যে কতকটা সম্ভব, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

(১) যে কঠোর জীবন-সংগ্রামের ফলে পুরুষদের আয়ুঃক্ষয় ও অকাল-মৃত্যু হয়, এতকাল স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহা ছিল না। কিন্তু এখন আর তাহা বলিবার উপায় নাই। স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়েই পুরুষদের প্রতিযোগিতা করিতেছে। ভোট-প্রার্থিনী দলের উদ্ভব হইয়া এই প্রতিযোগিতা চরমে উঠিয়াছে। জীবিকার জন্য বহুল পরিমাণে দেশান্তরে গমন, যুদ্ধপ্রভৃতি কার্য্যেও যে অদূরভবিষ্যতে স্ত্রীলোকেরা প্রবৃত্ত হইবে তাহাও অসম্ভব নয়। সুতরাং এই সকল ব্যাপারে পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও আয়ুঃক্ষয় ও অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি হইবে। ফলে তাহাদের সংখ্যা কমিতে থাকিবে।

(২) পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানদের শরীর ও মুণ্ডের আয়তন বেশী। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদের দেহ ও মস্তিষ্ক উভয়ই বেশী চালনা করিতে হয় বলিয়াই বংশানুক্রমের ফলে পুরুষদের শরীর

ও মুণ্ড আয়তনে বাড়িয়া গিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরাও যেরূপ ভাবে পুরুষদের ন্যায়ই দেহ ও মস্তিষ্ক চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদেরও শরীর ও মুণ্ড যে শীঘ্রই পুরুষদের ন্যায় অধিক আয়তনবিশিষ্ট হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। ফলে প্রসবনির্গমনের সময় তাহাদেরও পুরুষদের ন্যায়ই আঘাতপ্রাপ্তির অনিষ্টাশঙ্কার সম্ভাবনা বেশী হইবে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহাতেও স্ত্রীলোকদের সংখ্যা এখনকার তুলনায় কমিতে থাকিবে।

(৩) পূর্ব্বোল্লিখিত আতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফল বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইয়া স্ত্রীলোকদেরও জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দিবে এবং তাহার ফলে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের ন্যায় সংখ্যায় বেশী মরিতে থাকিবে।

সমাজশক্তির গতি ও ক্রিয়া অতি কঠিন। সে সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তই অনুমান মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে স্ত্রীলোকদের সংখ্যার হ্রাস হইয়া, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে চিরন্তন বৈষম্য তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে কমিয়া, কালে একটা কঠিন সামাজিক সমস্যার সমাধান হইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

বিশ্বসৃষ্টিতে মানবের স্থান*

মানুষের মধ্যে চিরদিনই একটা অপূর্ণতার অভাব জাগিতেছে। তাই সে পশুপক্ষীর মত প্রাত্যহিক জীবনের কাজ-কর্ম্মের মধ্যেই একটা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যেন তার সব তৃষা পূরে নাই, সব আশা মিটে নাই, যেজন্য সে পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহার সার্থকতা-সাধন হয় নাই—এই কথাই তাহার মনে সর্ব্বদা জাগিতে থাকে। 'আমার যা হবার তা 'আমি হব'—এ কথা তাহাকে জোর করিয়া বলিতেই হইয়াছে, এবং সেই না-হওয়ার উপলব্ধিতেই তাহার যন্ত্রবেদনা। ভগবান চান যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এক মানুষই আপনি আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশিত করিবে। তাই তিনি মানুষকে আর সকল জীবের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ করিয়া, অসহায় দুর্ব্বলের বেশে পাঠাইয়াছেন। সেই দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়াই তাঁর পরমা শক্তির প্রকাশ হইবে, সেই অসম্পূর্ণতা তাঁরই পূর্ণ লীলা প্রকট করিয়া ধন্য হইবে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাই তিনি ময়ূরকে নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, আর মানুষের

* গত মাঘোৎসবের দিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজে যে বক্তৃতা দেন তাঁহার সারসঙ্কলন।

মধ্যে একটি রঙের বাটি দিয়া বলিয়া দিয়াছেন—"তোমাকে আপন সাজে সাজতে হবে; উপকরণ সব দিয়েছি, তা দিয়ে আপনাকে তুমি আপনি গড়ে তোল।" আমরা যদি তা না করি, তা হলে কি তাঁর লীলা ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?

কিসের ব্যর্থ আবর্ত্তনে দিনের পর দিন আমরা ঘুরিয়া মরিতেছি! আমি মানুষ হব, ভগবানের অভিপ্রায় আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ করে তুলব—এ সংকল্প ত কই গ্রহণ করা হইল না। কয়েদীর মত ঘানিতে বদ্ধ হইয়া, জীর্ণ বোঝা লইয়া, শুধু একই চক্রনেমির পথে ঘুরিতেছি, শুধু একই হেয় জিনিসের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। এমন কোন নূতনত্বের চেতনা পাই না যাহাতে মনে করিয়া দেয় যে, আমি মানুষ; যে, এ মোহপাশ টুটিয়া সত্যের আলোকে আমাকে মনুষ্যত্বের সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। অভ্যাসের জড়স্তূপে, মলিনতার উপর মলিনতার আবরণে, নিত্যকার কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে প্রতিদিন আমরা এ কি আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি;—বিশ্বভুবনের আশ্চর্য্য লীলা দর্শন হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতেছি। যাহা কিছু আমাদের আয়োজন সবই ত দেখি নিজের জন্য। বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাঁহার আসন পাতা, শুধু আমাদের কলঙ্কমণ্ডিত এই অন্তর থাকিতেই তাঁর স্থান আমরা করি নাই।—অথচ আমাদের হৃদয়ে নিমন্ত্রিত না হইয়া তিনি আসিবেন না,—এইটুকুই তাঁর অভিমান। তাই তিনি চিরদিন বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমরা তাহাকে ডাকি না, সুখ-দুঃখের অংশ দিই না; অথচ, বাসনা কামনা স্বার্থ আসিয়া জোর করিয়া সে আসন দখল করিয়া বসে, যাহা পায় সবই কাড়িয়া লয়,—আমরা নিবারণ করিতে পারি না।

এইরূপেই আমরা আমাদের জীবন ব্যর্থ করিতেছি; এবং সেই সঙ্গে তাঁহারও উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতেছি। তিনি যে বলিয়াছেন আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা সংসারের সুখের মধ্যেই মগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—সে পিতৃসত্য আমাদের পালন করিতেই হইবে, বলিতে হইবে—'হে নাথ, আমার ধন মান, জীবন যৌবন, সবই তোমার জন্য কারণ তুমি আমার পিতা,—পিতা নোঽসি।'

এই সত্যকে জানিবার জন্য, এই সত্যকে স্বীকার করিবার জন্য মানুষ এক একটা দিনকে পৃথক করিয়া রাখে। প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত অসত্যের গ্লানি, খ্যাতি প্রতিপত্তির চরণে হীন নতি, মলিনতার কলঙ্কের স্তূপীকৃত জঞ্জাল সব দূরে ঠেলিয়া, ঘানির ভার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া, অন্ততঃ সে দিন মানুষ বুঝিতে চায় যে, আনন্দলোকে অমৃতলোকেই তার জন্ম, কারাগারের রুদ্ধ কক্ষে নয়।

স্বর্গলাভের জন্য মানুষ একদিন কত ব্রত-অনুষ্ঠান, কত তীর্থ-পর্য্যটন, কত আত্মনিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু স্বর্গ বলিয়া ত পৃথক কিছুই নাই। সংসারে ভগবানকে আনিলেই সংসার স্বর্গ হয়। তিনি বলিয়াছেন—'তোমায় আমায় মিলেই স্বর্গ সৃষ্টি হবে; তোমার আত্ম-নিবেদনের অপেক্ষায় এতদিন এতবড় একটা চরম সৃষ্টি সম্পূর্ণ হতে পায়নি।' এইখানেই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছেন; আর এইজন্যই তিনি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

পৃথিবীও একদিনে এমন শস্যশ্যামলা সৌন্দর্য্যশালিনী হয় নাই; কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ শীতল হইয়া, তরল হইয়া, কঠিন হইয়া তবে এ রূপ সে পাইয়াছে। স্বর্গলোকও ঠিক সেইরূপ বাষ্পাকারে আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; তাহাকেও এইভাবে একটা অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতা আমাদের দিতেই হইবে; তাঁহার রচনাকার্য্যে সহায়তা করিতেই হইবে। কিছু অভাব পূরণ করিয়াছি, কিছু অজ্ঞানতা দূর করিয়াছি, কিন্তু সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছি, এ কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদের বলিবার অধিকার যেন থাকে। তাঁহার সে সৃষ্টির মাঝে শিল্পীর ন্যায় আমাদের কতক কারিকুরি যেন থাকে। তাঁহার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া, তাঁহার আনন্দের সহিত নিজেদের প্রেম আনন্দ মিলাইয়া আমাদের ধন্য হইতে হইবে। হোক্ সে বাণী অস্ফুট, হোক্ সে সুর ক্ষীণ, তবু তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। তাঁহার মুখের তৃপ্তির ভাব অনুভব না করিলে কবি কবি নয়, শিল্পী শিল্পী নয়, গায়ক গায়ক নয়; মানুষের সভায় দাঁড়াইয়া মানুষের জয়মাল্য লইবার জন্যই যাহার আগ্রহ, সে মানুষই নয়। কিন্তু কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য্য, বা সুর, বা রস নয়,—সবই লইতে হইবে; সমস্ত জীবন দিয়া তাঁরই সব জিনিষ তাঁহারই সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে। জীবনকে তাঁহার অমৃতরসে কাণায় কাণায় পূর্ণ করিয়া নিবেদন করিতে হইবে। তাঁহার নৈবেদ্য হইতে প্রায় সব জিনিসই আমরা চুরি করিয়া সামান্যমাত্র উদ্বৃত্ত তাঁহার জন্য রাখিয়া দিই; আর সেইজন্যই, সেই নিজের নেওয়া জিনিষে অন্তর ভরে রাখি বলেই, অভাব আমাদের কখনও যায় না। সব জিনিষ যদি কোন দিন তাঁকে নিঃশেষে দান করিতে পারি, তাহা হইলে সে দিন আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না।

আজ এই দিনে সেই কথাটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বলিতে হইবে যে—হে স্বামি, তোমার আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে তুমি এস; যে, তুমি না আসিলে গৌরব আমার গৌরব নয়, সব খ্যাতি সব পাওয়া আমার ব্যর্থ; যে, একলা আমার রচিত যে সৃষ্টি তাহা এক আঘাতেই চূর্ণ হইয়া যায়—আমি আর তাহা চাহি না; এস আজ তোমায় আমায় মিলে এমন এক নূতন সৃষ্টি করি যাহা কখনও লোপ পাইবার নয়। আমি ক্লান্ত, আমি অক্ষম, আমি দুর্ব্বল—সব কৃত্রিমতা আজ দূর করিয়া দিলাম। তোমার জন্য দুঃখ পাইলাম এ কথা জানাইবার সুখ আমায় দাও; সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথের দুঃখ-বোঝা আজ তোমার চরণে ফেলিয়া দিলাম,—তুমি আনন্দ তুমি অমৃত এ কথা বলিবার অধিকার আমায় দাও। বিশ্বজগতকে যেভাবে প্রকাশিত করিতেছ, আমাকে তেমনি প্রকাশিত কর; সংসারের অন্ধকারের মধ্যে তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠুক;—সত্যে, জ্ঞানের জ্যোতিতে, মৃত্যুর পরপারে অমৃতলোকে তোমার সহিত আমাকে মিলিত কর।

পূর্ব্বরাগ।

যায় যায় যায় যায় ফিরে চায়,
চরণে নূপুর বাজে,
নরমের আশা, প্রাণের পিয়াসা
লুকাতে চায় সে লাজে।
লাজ বলে তারে চল সখি চল,
মন মানা করে তারে;
মুগ্ধা কিশোরী, না পারে থাকিতে
ফিরে যেতে নাহি পারে।
ধীরে ধীরে যায়, যেতে নাহি চায়
মুখে মৃদু মৃদু হাসি,—
হিয়া যেন তার চোখে এসে বলে,
"ভালবাসি—ভালবাসি!"
চোরা চাহনিতে দেখে মোহনিয়া
দাঁড়ায় কদম তলে;
অনুরাগ তার বনমালা হয়ে
দুলিছে বিনোদ গলে।
থমকি' চমকি' ফিরে যেতে চায়
শিহরি' বাঁশীর গানে,
নত করে আঁখি, "সে যদি গোপন
মরম কথাটি জানে।"
ভিজা নীল শাড়ী, মুকুতা ঝরিয়া
পড়িছে পথের পরে,—
তনুর পরশ হারাবে ভাবিয়া
সে বুঝি ঝরিয়া মরে।
শিথিল দুকূল, কবরীর ফুল
মাটীতে খসিয়া পড়ে,
পায় পায় বাধা, পায় যেন বাধা,
কে যেন পা'দুটি ধরে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

সপ্তবিংশ অধ্যায়

গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও রূপ সনাতন সাক্ষাতোৎসব

সন্ন্যাসগ্রহণ কালে গৌরের বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর ছিল। তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন, একবার গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন, এবং বারাণসী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি একাধিক্রমে অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে নীলাচল ত্যাগ করিয়া তিনি কুত্রাপি গমন করেন নাই। নীলাচলেই তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার অবসান হয়।

গৌরের নীলাচল-প্রত্যাগমন-সংবাদ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে, তথাকার ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বাধীনে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দের প্রিয় একটী কুকুরও তাহাদের সহিত যাত্রা করিয়াছিল। পথিমধ্যে কুকুরটী অদৃশ্য হয়। বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া শিবানন্দ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন। কিন্তু নীলাচলে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার প্রিয় কুকুরটী গৌরের অদূরে উপনীত হইয়া তৎপ্রদত্ত নারিকেল শস্য ভক্ষণ করিতেছে, গৌর তাহাকে কৃষ্ণ নাম পড়াইতেছেন, সেও নারিকেল চর্ব্বণ করিতে করিতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছে। বিস্ময়স্তিমিত লোচনে কিয়ৎক্ষণ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া শিবানন্দ কুকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে সেই ভক্ত কুকুর কুকুর-দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থিত হয়।

গৌড়ীয় ভক্তগণ বহুদিন পরে প্রভুকে দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। গৌরও পরম প্রীতি সহকারে সকলের অভ্যর্থনা করিয়া সকলের সহিতই যথাযোগ্য আলাপ করিলেন। ভক্তগণ চারি মাস প্রভু-সহবাসে নীলাচলে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

রূপ প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া একমাস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত স্থান

দর্শন করিলেন। অনন্তর সনাতনের অন্বেষণে ভ্রাতা অনুপমের সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা গঙ্গাতীর দিয়া প্রয়াগ অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই সনাতন রাজপথে বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভ্রাতাদিগের সাক্ষাৎ হইল না। রূপ ও অনুপম প্রয়াগ হইতে বারাণসী গমন করিলেন। তথায় তপন মিশ্রের নিকট সনাতনের প্রতি গৌরের অনুগ্রহের সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহারা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। দশদিন বারাণসীতে অবস্থিতি করিয়া উভয় ভ্রাতা গৌড় যাত্রা করিলেন। গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল রূপ গৌরের দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে বাসকালেই এক খানা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক রচনা করিবার জন্য রূপের ইচ্ছা হইয়াছিল। বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভও করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ ও নান্দী শ্লোক বৃন্দাবনেই তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌড় হইতে নীলাচল গমন কালে সেই প্রারব্ধ নাটকের কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এবং যখন যাহা মনে হইতে লাগিল তাহা লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে সত্যভামাপুরে বিশ্রাম কালে তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। এক দিব্যরূপধারিনী রমণী স্বপ্নে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া আদেশ করিলেন "রূপ, আমার নাটক তোমাকে পৃথক লিখিতে হইবে।" নিদ্রান্তরে স্বপ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া রূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, সত্যভামা দেবীই স্বপ্নে তাঁহার সম্বন্ধে পৃথক নাটক লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। রূপ ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্রে রচনা করিতেছিলেন; স্বপ্নাদেশ পাইয়া উভয় লীলা পৃথক লিখিতে মনস্থ করিলেন।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া রূপ প্রথমেই হরিদাসের গৃহে গমন করিলেন। হরিদাস পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। গৌর প্রত্যহ হরিদাসের গৃহে গমন করিতেন; সেদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া রূপকে দেখিতে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। হরিদাসের আবাসেই রূপের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একে একে নীলাচলের সকল ভক্তের সহিত রূপ পরিচিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রূপ প্রতিদিন গৌরের নিকটে গমন করিয়া নানা আলাপে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন কথায় কথায় গৌর কহিলেন "রূপ, কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না।" এবং রূপ উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রূপ বুঝিলেন তাঁহার আরব্ধ নাটককে লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তখন সত্যভামাপুরের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। সত্যভামা ও গৌরের আদেশের ঐক্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

গৌরের সহিত পরমসুখে রূপের সময় কাটিতে লাগিল। তাঁহার বিষয়-তাপদগ্ধ প্রাণ ভক্তির সুশীতল স্রোতে অবগাহন করিয়া শীতল হইল। রথযাত্রাকালে তিনি রথাগ্রে গৌরের নৃত্য দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব
চৈত্র ক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ
কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-
লীলাবিধৌ
রেবা রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎ-
কণ্ঠতে।"

[যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছেন, তিনিই আমার বর, সেই চৈত্রমাসের রজনী; সেই বিকশিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্ব কাননের মন্দ মন্দ সমীরণ, সেই সবই আছে, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুর তলে সুরত লীলা-বিধানার্থে আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।]

এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে ভাবোদ্বেল হৃদয়ে গৌর যখন তাঁহার বিহ্বল চরণ ভূমিতলে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তখন এক রূপ ও স্বরূপ ভিন্ন কেহই তাঁহার তদানীন্তন মানসিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। রূপ বুঝিলেন সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের অভ্যন্তরে একটী নারী-হৃদয় আছে, কোন্ অতীত যুগের এক মধুর স্মৃতি তাহার মধ্যে উদিত হইয়া তীব্র আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাহাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। প্রভুর কাতর হৃদয়ের কম্পনে প্রিয় ভৃত্যের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত লাগিল। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রূপ প্রভুর মানসিক অবস্থাপ্রকাশক এই শ্লোকটী রচনা করিলেন—

"প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।"

[সহচরি, আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল; আমিও সেই রাধিকা, উভয়ের মিলন জনিত সুখও সেই, তথাপি আমার মন সেই যমুনা-পুলিনবর্ত্তী বিপিনে—যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর মধুর পঞ্চমতানে খেলিয়া বেড়াইতেছে সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।]

তালপত্রে শ্লোকটী লিখিয়া রূপ গৃহের চালে তালপত্রটী গুঁজিয়া রাখিলেন। গৌর গৃহে এসোগত হইলে তালপত্রটী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই শ্লোক পাঠ করিয়া তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন সময় রূপ সমুদ্রস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৌর সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া সেই তালপত্র তাহাকে দেখাইয়া কহিলেন "আমার মনের মধ্যে যে ভাব অতি দৃঢ় ছিল, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, রূপ?" অনন্তর স্বরূপ গোস্বামীকে সেই শ্লোক দেখাইয়া কহিলেন "দেখ দেখ স্বরূপ; রূপ আমার মনের ভাব কেমন এই শ্লোকে অবিকল ব্যক্ত করিয়াছে। সে আমার মনের ভাব জানিল কিরূপে?" স্বরূপ কহিলেন "তোমার কৃপা হইয়াছে—তাই জানিয়াছে।" তখন গৌর কহিলেন "ইঁহাকে দেখিবার পর হইতেই ইঁহার প্রতি কেমন আমার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ইঁহাকে যোগ্য পাত্র জানিয়াই প্রয়াগে ইঁহাকে ভক্তি-তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলাম। স্বরূপ তুমিও ইঁহাকে বিস্তারিত ভাবে রসতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।"

গৌড়ীয় ভক্তগণের দেশে প্রত্যাগমনের পরেও রূপ স্বীয় প্রভুর চরণে রহিয়া গেলেন। সংকল্পিত নাটক অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে লিখিতে লাগিলেন। একদিন রূপ লিখন-কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় গৌর তথায় উপস্থিত হইয়া গ্রন্থের একটী পাতা হাতে তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন রূপের মুক্তাপংক্তি বিনিন্দি অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্॥
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং
কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি
বর্ণদ্বয়ী॥"

"জানিনা কৃষ্ণ এই দুইটা বর্ণ কীদৃশ অমৃত দ্বারা গঠিত। বর্ণ দুইটী যখন রসনায় নৃত্য করে, তখন রসনাপংক্তি (বহুসংখ্যক জিহ্বা) পাইতে অভিলাষ হয়; শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইলে অর্ব্বুদসংখ্য কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে এবং মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই এতৎসকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।"

গৌর শ্লোক পাঠ করিয়াই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। হরিদাস শুনিয়া কহিলেন "বহু শাস্ত্রে বহু সাধুর মুখে কৃষ্ণনামের মহিমা-কীর্ত্তন শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ বর্ণনা এখন পর্য্যন্ত কর্ণগত হয় নাই।" সেদিন রূপ ও হরিদাসকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া গৌর প্রস্থান করিলেন; কিন্তু অচিরেই সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রূপের গ্রন্থ শুনিতে আগমন করিলেন। রূপ সকলকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিয়া হরিদাসের সহিত মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের শ্লোকটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। রূপ লজ্জায় মৌন হইয়া রহিলেন; সার্ব্বভৌমের মত পণ্ডিত, রামানন্দ ও স্বরূপের মত ভক্তের সম্মুখে স্বীয় প্রথম রচনা পাঠ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। তখন স্বরূপ "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" ইত্যারব্ধ শ্লোকটী পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া রামানন্দ কহিলেন "প্রভু, তোমার প্রসাদ ভিন্ন এরূপ শ্লোক রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে স্বীয় শক্তি আমাতে সঞ্চারিত করিয়া আমার মুখ দিয়া অনেক সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া লইয়াছিলে, রূপও তোমার প্রসাদেই এই শ্লোক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে।" তখন রামানন্দ গ্রন্থে ইষ্টদেবের বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে, শুনিতে ইচ্ছুক হইলে, রূপ প্রথমতঃ লজ্জায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভুর আদেশে পাঠ করিলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যে মধুর রস পূর্ব্বে কখনও জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই মধুর রসরূপ নিজভক্তিসম্পৎ জগৎবাসীকে প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়-কন্দরে প্রকাশিত হউক।

শ্লোক শুনিয়া গৌর কহিলেন "রূপ, এখানে

অতিস্তুতি হইয়াছে।” কিন্তু ভক্তগণ কহিলেন “তোমার শ্লোক শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।” অনন্তর রামানন্দ প্রশ্ন করিয়া একে একে রূপের গ্রন্থের অনেক অংশ শুনিয়া লইলেন। রূপ প্রভুর আদেশ লইয়া পাত্র-সন্নিবেশ, প্রবোচনা, প্রেমোৎপত্তি, পুর্ব্বানুরাগ, বিকার-চেষ্টা, প্রণয়-পত্রিকা, ভাবের স্বভাব, সহজপ্রেমের প্রকৃতি, মুরলী-নিস্বন প্রভৃতি অংশের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইলেন; রামানন্দ অশেষ প্রকারে গ্রন্থের প্রশংসা করিলেন। গৌর প্রেমভরে রূপকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রূপ সকল ভক্তকে প্রণাম করিলেন।

কতিপয় মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। দোলযাত্রার পরে গৌর রূপকে কহিলেন—“রূপ, এখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। তথায় অবস্থিতি করিয়া রসশাস্ত্র নিরূপণ এবং লুপ্ততীর্থরাজির উদ্ধার ও প্রচার কর। কৃষ্ণ-সেবা ও রসভক্তি-প্রচার তোমার মুখ্য-ব্রত হউক। আমি একবার তোমার কৃত কর্ম্ম দেখিবার জন্য বৃন্দাবন যাইব। কিন্তু তৎপুর্ব্বে সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইয়া দিও।” ইহার অচিরকাল পরেই রূপ প্রভু ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া গৌড়ে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রভুর আদেশ পালনে রত হইলেন।

রূপ নীলাচল ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরে সনাতন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও প্রভুর ন্যায় ঝারিখণ্ডের পথে আসিয়াছিলেন। ঝারিখণ্ডের দূষিত জলসংস্পর্শে তাঁহার কণ্ডুরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যখন তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডুতে আচ্ছন্ন এবং তাহা হইতে অনবরত রসক্ষরণ হইতেছিল। ইহাতে সনাতন মনে করিলেন “একে ত আমি নীচজাতি, তাহাতে এই ঘৃণ্য-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। হতভাগ্য আমি, না পাইব জগন্নাথের দর্শন, না পাইব ইচ্ছামত আমার প্রভুকে দেখিতে। এই জঘন্য শরীর রক্ষা করিয়া আর লাভ নাই। রথযাত্রাকালে জগন্নাথের রথতলে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিব।” নীলাচলে সনাতন হরিদাসের আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সনাতনের চিত্ত গৌরের দর্শন-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত। ভক্তবৎসল অচিরেই ভক্তগণ সহ হরিদাসের আবাসে উপস্থিত হইয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া সনাতন ও হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। গৌর সনাতনকে প্রথমে দেখিতে পান নাই, তিনি প্রথমে হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন হরিদাস কহিলেন “প্রভু, সনাতন তোমায় প্রণাম করিতেছে।” সনাতনের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। বাহু প্রসারিত করিয়া তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন সনাতন পশ্চাতে সরিয়া গিয়া কহিলেন “প্রভু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় স্পর্শ করিও না। আমি একে নীচ জাতি, তাহাতে সমস্ত গাত্র আমার কণ্ডুরসে লিপ্ত।” গৌর তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া সবলে তাঁহাকে ধারণ করতঃ প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। সনাতনের কণ্ডু-ক্লেদে তাঁহার

শরীর লিপ্ত হইল, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একে একে সমস্ত ভক্তের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সকলের চরণ বন্দনা করিয়া সনাতন হরিদাসের পিঁড়ার নিম্নে উপবেশন করিলেন। গৌর ভক্তগণ সহ পিঁড়ার উপর উপবেশন করিয়া সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদে প্রভু দুঃখিত হইয়া তাহার ভক্তির অশেষ সুখ্যাতি করিলেন। অনুপম রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। রূপ ও সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যে অনুপম প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবার কল্পনা যখনই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তখনই এক নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার মন কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল; যখন রঘুনাথের চিন্তা কিছুতেই মন হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত মিনতির সহিত তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিলেন "আমি রঘুনাথের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিব না। সে চিন্তামাত্রেই আমার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হয়। তোমরা অনুমতি দাও জন্মজন্মাবধি আমি রঘুনাথের চরণ সেবা করিব।" সনাতন এই কাহিনী বর্ণনা করিলে গৌর ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের গৃহেই সনাতনের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গৌর ভৃত্য গোবিন্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন; এবং স্বয়ং প্রত্যহ হরিদাসের আবাসে আসিয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-কথালাপে অনেক সময় কাটাইতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গৌর কহিলেন "সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণলাভ হয় না। দেহ ত্যাগ করিলেই কৃষ্ণ যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে কোটী দেহ থাকিলেও, তাহা ত্যাগ করা বিশেষ কঠিন কার্য্য হইত না। ভক্তি ও ভজন ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণ-প্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। দেহত্যাগ তমোধর্ম্ম। রজঃ ও তমো অবলম্বনে কৃষ্ণের মর্ম্ম বোধগম্য হয় না।" শুনিয়া সনাতন বুঝিলেন তাঁহারই আত্মহত্যার সংকল্প লক্ষ্য করিয়া প্রভু এই কথা বলিতেছেন, তিনি প্রভুর চরণ মূলে পতিত হইয়া কহিলেন "হে সর্ব্বজ্ঞ, হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি আমাকে যেরূপ নাচাইতেছ, যন্ত্রের মত আমি তেমনি নাচিতেছি। কিন্তু আমার মত নীচ ও পামরকে জীবিত রাখিয়া তোমার কি লাভ হইবে প্রভু?" গৌর কহিলেন "সনাতন তুমি আমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ, তোমার দেহ এখন আমার। পরের দ্রব্য নষ্ট করিবার অধিকার তোমার নাই। তোমার শরীরে আমার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এখনও ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব সম্যক নিরূপিত হয় নাই। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-আচারপদ্ধতি এখনও সম্যক বিধিবদ্ধ হয় নাই, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণসেবা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। লুপ্ত তীর্থরাজির এখনও উদ্ধার হয় নাই; বৈরাগ্য-শিক্ষা এখনও প্রচারিত হয় নাই। তুমি দেহত্যাগ করিলে মথুরা ও বৃন্দাবনে বসতি করিয়া এ সমস্ত কার্য্য কে করিবে? যে দেহ দ্বারা এতগুলি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে সে দেহ তুমি ত্যাগ করিতে চাও?" অনন্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হরিদাস, সনাতন পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহেন, তুমি নিষেধ করিও।"

সনাতন দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ

করিলেন। হরিদাস ও প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথালাপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রাকালে আসিয়া চারি মাস নীলাচলে অবস্থান করতঃ দেশে ফিরিয়া গেলেন। সনাতন স্বীয় চরিত্রমাধুর্য্যে নীলাচলে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখিয়া সনাতন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠমাসে গৌর যমেশ্বরটোটা গমন করিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্নকালে তিনি সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সনাতন প্রভুর আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র পরমাহ্লাদিত মনে সমুদ্রতীরস্থিত বালুকাপথে যমেশ্বরটোটা গমন করিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। তপ্তবালুকা-সংস্পর্শে পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু বিপুল আনন্দে মন ভরপূর থাকায় সনাতন তাহা জানিতে পারিলেন না। সনাতন উপস্থিত হইলে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "সনাতন কোন পথে আসিয়াছ?" সনাতন কহিলেন "সমুদ্র পথে।" গৌর কহিলেন "সিংহদ্বারের শীতল উদ্যান-পথ ত্যাগ করিয়া, তুমি উত্তপ্ত বালুর পথে আসিলে কেন? পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে।" তখন সনাতন কহিলেন "আমার কষ্ট বেশী হয় নাই। পায়ে ব্রণ হইয়াছে—কষ্ট আমি তো তা জানিতে পারি নাই। আমি নীচ জাতি, ঠাকুরের সিংহদ্বারে যাইবার আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ সিংহদ্বারে ঠাকুরের সেবকগণ অনবরত যাতায়াত করে, তাহাদের সহিত গাত্রসংস্পর্শ হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইত।" সনাতনের বিনীত বচনে পরম তুষ্ট হইয়া গৌর কহিলেন "সনাতন, তোমার মত ভক্তের স্পর্শে মানব ত দূরের কথা, মুনি ও দেবতাগণও পবিত্র হইয়া যান। তথাপি তুমি মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর নাই; ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদার রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি না ঐছে করিলে করে কোন্ জন॥"

এই বলিয়া গৌর সনাতনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কণ্ডুরসাচ্ছন্ন শরীর আলিঙ্গন করিলেন; গৌরের গাত্রে স্বীয় কণ্ডুরস লাগিতে দেখিয়া সনাতন মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। গৌর তাঁহার নিষেধ গ্রাহ্য করিতেন না—মাঝে মাঝে প্রায়ই তাহাকে আলিঙ্গন দিতেন। ইহাতে সনাতন আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া মনঃপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। একদিন মনোদুঃখে তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে কহিলেন "নীলাচলে আসিলাম প্রভুকে দর্শন করিয়া মনের দুঃখ দূর করিতে; কিন্তু এখানে আসা অবধি মনস্তাপেই দিন যাইতেছে। আমার কণ্ডুরস দ্বারা আমি প্রভুর শরীর কলঙ্কিত করিতেছি, এ অপরাধ হইতে আমার নিস্তার নাই; আমার কিসে হিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" জগদানন্দ কহিলেন "বৃন্দাবনই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান। রথযাত্রা দেখিয়াই তুমি তথায় গিয়া বাস কর।" সনাতন কহিলেন "সেই ভাল কথা। সেই খানেই আমি যাব। সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ।" ইহার কতিপয় দিবসান্তে হরিদাসের

আবাসে সনাতন দূর হইতে গৌরকে প্রণাম করিলেন। গৌর বারংবার ডাকিলেও নিকটে গমন করিলেন না। অগত্যা গৌর সনাতনের অভিমুখে গমন করিলেন। সনাতন পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। গৌর তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন "তুমি ত আমার এই পূতিগন্ধময় শরীর আলিঙ্গন কর। কিন্তু এই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এখানে থাকিলে আমার কল্যাণ হইবে না। জগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তিনি আমাকে বৃন্দাবন যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তুমি অনুমতি দেও, আমি প্রস্থান করি।" এই কথা শুনিয়া গৌর বিশেষ রুষ্ট হইয়া কহিলেন "কি অধিকার আছে জগদানন্দের তোমাকে উপদেশ দিতে? কালিকার জগদানন্দ কি এত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন যে, আমার প্রাণাধিক, আমার উপদেষ্টা সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হন? মূর্খ জগদানন্দ নিজের মূল্য অবগত নহে।" তখন সনাতন গৌরের চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন "হায় জগদানন্দ কি সৌভাগ্যবান্। তুমি তাহাকে আপনার জন বলিয়া মনে কর, তাই তাহাকে তিরস্কার করিতেছ; আর আমার ভাগ্যে কেবল গৌরব ও স্তুতি—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিসিন্দারস॥

হায়, আজিও আমার প্রতি তোমার আত্মীয়-জ্ঞান হইল না—আমার দুর্ভাগ্য!" সনাতনের আক্ষেপে গৌর লজ্জিত হইয়া কহিলেন "জগদানন্দ কখনও তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমার একান্তই অসহ্য।

কাঁহা তুমি প্রাণাধিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন॥

তোমাকে উপদেশ করিতে গিয়াছিল বলিয়াই জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে যে বহিরঙ্গ জ্ঞানে স্তুতি করিয়াছি তাহা মনে করিও না। সন্ন্যাসী আমি; চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই আমার নিকট তুল্য। তোমার নিকট বীভৎস বোধ হইতে পারে; কিন্তু আমার নিকট তাহা অমৃত সমান বোধ হয়। এ বৎসর তুমি আমার সহিত বাস কর। তারপরে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব।" এই বলিয়া গৌর পুনরায় সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন চক্ষুর নিমেষে সনাতনের চর্ম্মরোগ প্রশমিত হইয়া গেল। সুবর্ণের মত তাঁহার দিব্য অঙ্গ দীপ্তি পাইতে লাগিল। সকলে চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

এক বৎসর প্রভু-সহবাসে অতিবাহিত করিয়া সনাতন বৃন্দাবন-যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। যে পথে গৌর বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সনাতনও সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। প্রভুর চরণরেণু-পূত পথে মনের আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে রূপও তথায় আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া নানা শাস্ত্র সহযোগে লুপ্ততীর্থ সকলের উদ্ধার করিলেন এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলেন। সনাতন "ভাগবতামৃত", "সিদ্ধান্ত-সার", "হরিভক্তি-বিলাস" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিলেন। রূপ "উজ্জ্বল-

নীলমণি", "রসামৃত সিন্ধুসার", "দান-কেলি-কৌমুদী" প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কালে বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী সর্ব্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করিলেন এবং "ভাগবতসন্দর্ভ", "গোপালচন্দ্র", "ষট্‌সন্দর্ভ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম দিক্-দিগন্তে প্রচার করিয়া দিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জনমদুঃখিনী সীতা

বাঙ্গালী-সমাজে একটা ধারণা আছে যে, সীতা জনমদুঃখিনী; তাঁহার নামে কোনও মেয়ের নাম রাখিলে সেও জন্মদুঃখিনী হইবে। এই কারণে বঙ্গদেশের কোন বালিকার সীতা নাম পাওয়া যায় না।

কিন্তু সীতা কি সত্যসত্যই "জনমদুঃখিনী"?

বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জনকের গৃহে সীতার বাল্যকাল যে খুব সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বনবাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্বশুরালয় দশরথ-গৃহে বাসও তাঁহার পক্ষে সুখময় ছিল। তারপর চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস। এই বনবাসও কি শুধু দুঃখেরই ছিল? এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ বর্ষ সীতা রামের সঙ্গিনী ছিলেন। কেবল বাকী এক বৎসরের অনধিক কাল তিনি রাবণের গৃহে বন্দিনী ছিলেন।

বনবাস-কালের ত্রয়োদশ বর্ষ সীতার জীবনে সুখের কি দুঃখের সময় তাহা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙ্গালী-সমাজে সুখ ও বিলাস প্রায় একার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সুখের মধ্যেও যে দুঃখ থাকিতে পারে এবং দুঃখের মধ্যেও যে সুখ থাকিতে পারে তাহা তাহারা বুঝে নাই। বীরত্বের মধ্যে ও ত্যাগের মধ্যেও যে যথেষ্ট সুখ আছে তাহা তাহারা ভাবিতে চেষ্টা করে নাই। বনচর জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখ যে বেশী হইতে পারে, এ কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে চেষ্টা করে নাই। তপোবনের তাপস ও তাপসীদিগের সঙ্গ; তটিনীর কলনাদ; মৃগশাবকগণের ক্রীড়া; ময়ূরের নৃত্য; বন্য কুসুমের অপূর্ব্ব শোভা ও সৌরভ নদীতটের উপলখণ্ডরাশির আকার ও বর্ণের বৈচিত্র্য; পার্ব্বত্য মৃত্তিকার বিচিত্র বর্ণসম্ভার; বিবিধ বর্ণের ও আকারের বিচিত্র বিহঙ্গশ্রেণী এবং তাহাদের বিবিধ মধুর কাকলী; বিবিধ বিচিত্র উদ্ভিদ—তাহাদের পত্র পুষ্প ও ফলের সৌন্দর্য্য; স্বচ্ছসলিল সরোবর ও তাহাতে সঞ্জাত কুমুদ, কহ্লার, রক্তকমল ও পদ্মের রাশি সীতার বন্য-জীবনকে কবিজনবাঞ্ছিত অপূর্ব্ব আনন্দে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে বিচিত্র সুখের কথা শুনিয়া আমাদেরও সরমার ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"শুনিলে তোমার কথা রাঘব-রমণি
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে। ইচ্ছা হয় ত্যজি রাজ্য,
যাই বন মাঝে।"

আর এই ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া,—সমস্ত যৌবন-কাল ব্যাপিয়া সীতা নিজ প্রিয়তমের নিত্য-সঙ্গিনী ছিলেন। অযোধ্যায় রাজপুরীতে সীতা কি রামচন্দ্রকে এমন একান্ত ভাবে পাইতে পারিতেন? সেই জনহীন অরণ্যে সীতার প্রেমের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কে বলিতে পারে, নবীন যৌবনে অযোধ্যার বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিলে রামচন্দ্রের চরিত্রের অবনতি ঘটিত না? তিনিও পূর্ব্ব পুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিবাহ করিতেন না? তাহা না হইলেও রাজকার্য্যই রামচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশ সময় অপহরণ করিত; সীতা দিবসের অতি অল্পমাত্র সময়ই রামচন্দ্রকে পাইতেন। এই হিসাবে দেখিলে মনে হইবে সীতার সেই চতুর্দ্দশ বৎসরের বনবাস তাঁহাকে তাহার সমস্ত জীবনের দুঃখ অপেক্ষা শত গুণ অধিক সুখ প্রদান করিয়াছিল।

যে কয়মাস সীতা রাবণ-গৃহে বাস করিয়াছিলেন সে কয়মাস যে তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখাবহ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সে দুঃখ নিতান্তই দুঃসহ ও মর্ম্মন্তুদ। কিন্তু তাঁহার সুখ দুঃখের জমা খরচের খাতায় সেই দুঃখ কি শোধ হইয়া যায় নাই? সেই সুখ-দুঃখের ভিতরে তিনি কি নিজ প্রণয়াস্পদের অবিচলিত প্রীতি ও প্রণয়ের নিদর্শন পান নাই? আর এই যে এখনও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নরনারী নিজের কত দুঃখের বোঝার ভারে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, কয়জন লোকে তাহাদের সে দুঃখের সংবাদ লইয়া থাকে? কিন্তু সেই যে কোন্ এক অতীত যুগে সীতা দুঃখে মুহ্যমান হইয়া কাঁদিয়াছিলেন, কতকাল পরে আজিও তাহার সেই দুঃখের কাহিনী অগণ্য নরনারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অন্তস্তল হইতে অশ্রুধারা আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে;—এই যে তাঁহার দুঃখের প্রতি একটা বিশ্বজনীন সহানুভূতি—সেই সহানুভূতির কি কোনও মূল্য নাই?

রাবণগৃহ হইতে উদ্ধার পাইয়া সীতা অযোধ্যায় সম্রাজ্ঞী হইলেন। রাজার এক-মাত্র রাণীর যে কত সুখ তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক করে না।

তার পর সীতার দ্বিতীয় বনবাস। সীতা-জীবনের এই অংশ লইয়া বিবিধ বিতণ্ডা চলিয়াছে। এই বনবাসে সীতার যে দুঃখের তুলনায় সুখও বেশী হইয়া থাকিতে পারে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের আরোপ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। রামচন্দ্রের এই কার্য্যকে বর্ব্বর পিশাচের কার্য্য বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাকে ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে রাখিয়া আসেন নাই; রাখিয়াছিলেন ঋষি বাল্মীকির শান্তিময় তপোবনে। বনবাসের কথা শুনিলেই আধুনিক বাঙ্গালীর মনে বিপুল আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যের নিকটে বনবাস বিভীষিকাময় মূর্ত্তি লইয়া উপনীত হইত না। শুধু প্রাচীন কেন, আধুনিক ভারতীয় মনেরও তপোবনের প্রতি কেমন একটা অননুভবনীয় আকর্ষণ আছে। তপোবন তাহার কল্পনার নিকটে বিচিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে উপনীত হয়। সেই তপোবন, যেখানকার আকাশ কোমল-কণ্ঠ ঋষিবালকগণের সামগানে মুখরিত

থাকিত ; যেখানে শুভ্রবেশ, শুভ্রকেশ, ও সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি বৃক্ষতলে আসীন হইয়া শাস্ত্রালাপে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন ; যেখানে বন্য হরিণকুল ঋষিবালাগণের হাত হইতে খাদ্য পাইবার আশায় সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষা করিত ; যেখানে সরোবর ও তটিনীর স্ফটিকজলে মাছগুলি করুণাদ্র হস্ত হইতে খাবার কাড়িয়া লইয়া ইতস্ততঃ নাচিয়া নাচিয়া হুড়াহুড়ি ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত ; যেখানে পাপিয়া ও দয়েল, কোকিল ও কাক, ময়ূর ও ছাতার, শ্যামা ও শুকের নৃত্যে ও গানে বাধা দিতে কোন ব্যাধ আসিত না , যেখানে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, কোণহীন, চক্রাকার, বর্ত্তুলাকার ও ডিম্বাকার এবং লাল, নীল, সবুজ, পীত, গৈরিক ও পাংশুবর্ণ উপলখণ্ডসকল নদীর নির্ম্মল জলের মধ্যে আলোড়িত হইত, কিম্বা বেলাভূমিকে বিচিত্র আবরণে সাজাইয়া রাখিত ; যেখানে বৈশাখের নবপত্রবাসপরিবৃত অশ্বত্থের শ্যামল স্নিগ্ধ ও বিশাল মূর্ত্তি আতপক্লিষ্ট পান্থের অন্তরে পুলক সঞ্চার করিত, এবং তাহার বায়ুভরে আন্দোলিত দীর্ঘপুচ্ছ পত্রাবলীর সরসর শব্দ তাহার কর্ণকুহরে অপূর্ব্বসঙ্গীত বর্ষণ করিত, কৃষ্ণচূড়ার নিবিড় লোহিত পুষ্পাচ্ছাদিত তনু তাহার নয়নকে পরিতৃপ্ত করিত, এবং বিল্বপুষ্পের মধুরগন্ধবাহী পবন তাহার নাসিকাকে পুলকিত করিত ; যেখানে শরৎকালে নদীতীরের বায়ু কাশকুসুমরাশির উপর দিয়া বহিয়া বড় বড় তরঙ্গ উৎপন্ন করিত ; যেখানে হেমন্তের বায়ু শেফালিকার মোহন মৃদুগন্ধ বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত ; যেখানে শীতকালে উপবনগুলি ভাটের ফুলের দ্বারা আলোকিত হইয়া থাকিত ; যেখানে ফাল্গুনের আম্রমুকুলের গন্ধ বিশ্ববাসিগণকে পুলকিত করিয়া তুলিত ;—সেই তপোবনের সীতার জীবনের শেষ কয় বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই সময়ের মধ্যেই সীতা নিজ প্রিয়তমের প্রণয়ের পূর্ণ নিদর্শন পাইয়াছিলেন এবং সে নিদর্শন বিশ্ববাসীজনের নিকট স্থাপন করিবার সুযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। যে সময়ে রাজাদিগের বহুপত্নী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল সেই সময়ে সেই রাজা আপাতঃদৃষ্টিতে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াও পুনরায় বিবাহ করেন নাই। যে সময়ে লোকে অপুত্রক অবস্থায় পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডজল লোপ পাইবে ভাবিয়া বিহ্বল হইত, সে সময়ে তিনি পুত্রের অছিলা করিয়াও পুনরায় বিবাহ করেন নাই। এবং পরিশেষে অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময়ে তিনি বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন যে তিনি সীতা ও নিজেকে সমাজের হিতার্থ বলি দিয়াছেন মাত্র। সীতার সহিত তাঁহার শারীরিক বিচ্ছেদমাত্র সংঘটিত হইয়াছে, উভয়ের মানসিক মিলন তখনও পরিপূর্ণ।

বিধাতার এমনই বিচিত্র বিধান যে, পৃথিবীতে যে যাহা চায় তাহার জন্য তাহাকে মূল্য দিতে হয়। আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী যতই উৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে ততই অধিকতর মূল্য দিয়া লইতে হইবে। এই কারণে সেই আদর্শ নরপতিকে নিজের মহৎ আদর্শের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হইয়াছিল ; সে মূল্য—সীতা-বর্জ্জন। সমাজের যাঁহারা আদর্শ স্থানীয় তাঁহাদের দায়িত্বও গুরুতর। সাধারণ মানবের যে স্বাধীনতা আছে সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তির সে স্বাধীনতা নাই। থ্যাকারের ভাষায়

বলিতে হয় "One must not only be virtuous but must appear also virtuous." বিশেষতঃ যাঁহাকে সকলে অনুকরণ করিবে, যাঁহার সামান্য একটু ত্রুটী পাইলে ভণ্ড ও দুষ্টগণ তাহার অনুকরণ করিয়া সমাজ মধ্যে বিষম বিপ্লব ঘটাইয়া তুলিবে, তাঁহাকে শুধু ধার্ম্মিক হইলেই বলিবে না, তাঁহার আচরণ এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে অতি বড় পাপিষ্ঠও যেন কোন ছল ধরিতে না পারে। যেমন কোন কোন সেনাপতি যুদ্ধকালে রাজকীয় ও সামরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরে হয় নিজের কৃত কার্য্যতার দ্বারা কিম্বা সাধারণ অপরাধীর মত নিজ জীবনের দ্বারা নিয়ম-লঙ্ঘন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, তেমনি মহাপুরুষগণ মাঝে মাঝে সমাজ বিগর্হিত কার্য্য করিয়াও পরে সে কার্য্যের নির্দ্দোষিতার বিবরণ সুস্পষ্ট প্রমাণ করেন কিম্বা সাধারণ অপরাধীর মত দণ্ড গ্রহণ করেন। সীতা রাবণের গৃহে বাস করা সত্ত্বেও রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অযোধ্যায় লোকসমাজের নিকটে তাই তাঁহাকে কৃতকার্য্যের সদুদ্দেশ্যের পরীক্ষা দিতে হইল। সে পরীক্ষায় রামচন্দ্র জয়ী হইলেন; তিনি প্রমাণ করিলেন যে তিনি অলোকসামান্যা রূপবতী সীতার রূপ-মোহে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই; সীতার আন্তরিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। বহুবর্ষের অদর্শনও তাঁহার হৃদয়-পটে সে পবিত্র স্মৃতিকে বিন্দুমাত্রও ক্ষীণ করিতে সমর্থ হয় নাই। আর সীতা তাঁহার বনবাস এবং শেষ পরীক্ষা দ্বারা জগতের সমক্ষে নিজ বিশুদ্ধির এমন প্রমাণ দিলেন যে পৃথিবীর অতি বড় দুর্ম্মুখের পাষাণ হৃদয়ও তাহাতে বিগলিত হইয়া গেল।

সে পরীক্ষা হইয়াছিল সীতার জীবনের শেষ দিনে অযোধ্যায় রাজসভায়। কাষায় বসনধারিণী জানকীকে দেখিয়া সমবেত জনগণের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইতেছিল। কিন্তু জনসাধারণের করুণা ও রোষ নিতান্তই অকস্মাৎভাবে স ত ও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। ঋষি বাল্মিকী সীতার বিমল চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন; তত্রাচ সীতাকে পুনরায় জনসাধারণের সমক্ষে পরীক্ষা দিতে হইবে। সে মহীয়সী মহিলার জীবনের কার্য্য তখন শেষ হইয়াছে। পতিপরিত্যক্তা হইয়া তাঁহার একদিনও জীবন ধারণ করিবার অভিলাষ ছিল না, কেবল তাহার সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাদিগের এখন ব্যবস্থা হইয়াছে। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা তাহা একান্তই পরা প্রেম বা ভক্তি; তাহাতে স্বার্থপরতার লেশমাত্রও নাই। তিনি কি অযোধ্যায় রাজসুখভোগের জন্যই রামচন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলেন? তিনি কি মূঢ় জনসাধারণকে ভেল্কি দেখাইয়া ভুলাইয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্যসুখভোগলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন? রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার সে ভক্তি যদি পরাভক্তি হয় তবে 'হে পৃথিবী তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও জানকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শান্তি লাভ করুন।'

রাম চরিত্রের এই অংশের সমালোচনা বর্ত্তমান কালের লোকের পক্ষে, যে সময়ের লোকের কাছে ঈশ্বর পরকাল প্রভৃতি সকলই অত্যন্ত অস্পষ্ট—বিশ্বজগতের নিগূঢ়

কারণ মানুষের অন্যতম সুবিধাজনক কল্পনা মাত্র বলিয়া বিবেচিত, সে সময়ের লোকের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। যে সময়ে লোকে ধর্ম্ম, পরলোক, ও ভগবানকে প্রত্যক্ষবৎ বিশ্বাস করিত সে সময়ের লোকের কার্য্যের অন্তস্তলে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকিত তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা এখনকার জনসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। গৌরবের জন্য ধর্ম্মের জন্য যাহারা কথায় কথায় প্রাণ দিত, "জীবন ও মৃত্যু যাহাদের পায়ের ভৃত্য" ছিল, তাহাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য, জীবিত থাকাটাকেই যাহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া ভাবে, তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে? কে বলিবে সেই রাজতপস্বীর হৃদয় সেই কর্কশ ব্যবহারের সময় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল না? কে বলিবে তিনি সেই আপাতঃ কর্কশ ব্যবহার দ্বারা জানকীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার করিতেছিলেন না? জীবন দুদিনের, ঐহিক সুখও দুদিনের; কীর্ত্তি অনন্তকালব্যাপিনী। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরনারীগণ নিজেদের কীর্ত্তিকে বিমল রাখিবার জন্য জীবন ও মৃত্যু কাহারই উপর অত্যধিক প্রীতি দেখান নাই। ইক্ষ্বাকুবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাম; ইক্ষ্বাকুবংশীয় শ্রেষ্ঠ নারী সীতা; তাহারা কি নিজেদের যশঃ প্রভাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন না? কে বলিবে সেই মহাপুরুষ নিজে কলঙ্কের বোঝা লইয়া নিজের প্রিয়তমার যশকে প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই? বিশ্বজগতের সীতার প্রতি সহানুভূতি এবং রামচন্দ্রের প্রতি রোষ, সীতার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয় লাভ।

সেই মহান রাজা কি নিজের সন্তানদিগের প্রতি বনবাসের দ্বারা অবিচার করিয়াছিলেন? অথবা সেই বিরাট পুরুষ—প্রকৃতি যাঁহাকে অলোকসামান্য গুণগ্রামে বিভূষিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিল, শ্রেষ্ঠব্রহ্মবিৎ ঋষি বশিষ্ট যাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ঋষি বিশ্বামিত্র যাঁহাকে রাজনীতি ও রণনীতি-বিশারদ করিয়াছিলেন, বিপুল দুঃখ যাঁহার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিয়াছিল,—তিনিই সংসারে দুঃখের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন। তিনি নিজের বহুদর্শিত্বে বুঝিয়াছিলেন মহদ্‌গুণাবলী লইয়া যাহারা জন্মিয়াছে, দুঃখ তাহাদের প্রধান শিক্ষাদাতা; দুঃখ তাহাদিগকে নিষ্পেশিত করিতে পারে না, তাহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলে। বুঝি তিনি ভাবিয়াছিলেন বাল্মীকির তপোবন ও তাপসীমাতার চরিত্র ও আশীর্ব্বাদ কুমার-যুগলের শিক্ষার প্রধান সহায় হইবে।

সেই দুঃখের ভিতরেও যে সীতার কোনও সুখ ছিল না এমন নহে। সীতার পত্নীত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল প্রথম বনবাসে। তাঁহার মাতৃত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাঁহার দ্বিতীয় বনবাসে। অযোধ্যার প্রাসাদের বিলাসিতার মধ্যে তাঁহার এ দুই মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। তাঁহার বিশাল হৃদয়ের বিপুল ভালবাসা জগতের চারিদিক হইতে প্রতিহত হইয়া আসিয়া সন্তান যুগলের প্রতি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। সেই ভালবাসা-জনিত সুখ যে অযোধ্যায় রাজবাটীর বহুজনের কোলাহলের মধ্যে ঘটিত না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সীতার সেই বনবাসের জীবনে আর একটা সুখ ছিল; সেটা আমরা এখনকার

দিনে ভাল বুঝিতে না পারিলেও কতকটা কল্পনা করিতে পারি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শিক্ষা এমনই সুন্দর ছিল, উহা পরস্পরবিরোধি ভাবকে এথনই সুন্দরভাবে সমঞ্জস করিয়া লইত যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন নরনারীকেই জীবনের কোন অবস্থাতেই অতিমাত্রায় দুঃখী করিয়া তুলিতে পারিত না। যে গৃহহীন আশ্রয়হীন তরুতল ভূতল নিবাসী সেও মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া প্রতিবৃক্ষের পত্রে প্রতি বালুকণার মধ্যে প্রতি বায়ুর হিল্লোলে বিশ্বস্বরূপের সত্তা অনুভব করিয়া গাহিত—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বংভুবন-
মাবিবেশ।
যো ঔষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমোনমঃ॥

যেথানে সূর্য্যের কিরণ পৌছে না, যেথানে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পৌছে না, যেথানে মুক্ত নির্ম্মল বায়ু বহে না, এমন কারাগারের মধ্যে যে অবস্থিত সেও সেই "সর্ব্বভূতেষুগুঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট" "শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্‌" পুরুষকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া বিমল শান্তি লাভ করিত। ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্ম-যোগের শিক্ষার ফলে কোন দুঃখই তাহাদিগকে অতিমাত্রায় ব্যথিত করিতে সমর্থ হইত না। তাই সেই কুটীরের মধ্যে সেই অন্ধকারের মধ্যেও সীতা ধ্যান-যোগে নিজের প্রিয়তমকে নিজের হৃদয়ে আসীন দেখিতেন। সমাধির অবস্থায় তাঁহার মনে হইত রামচন্দ্র তাঁহার যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন, তাঁহার বাহিরে আছেন, তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া আছেন; তিনি ও রাম যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন; বাহিরের সর্ব্বত্রই তিনি রামরূপ দেখিতে পাইতেন; বিশ্বভুবন তাঁহার কাছে রামময় হইয়া যাইত। সুতরাং বিরহ তাঁহাকে অতিমাত্রায় ক্লেশ দিতে পারিত না। এই-রূপে সীতা-জীবনের প্রকৃত তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে সাধারণতঃ লোকে যে জন্য মানুষকে সুখী বলিয়া মনে করে জনমদুঃখিনী সীতার জীবনে তদপেক্ষা বহুতর সুখের উপকরণ বিদ্যমান ছিল।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় স্তর

(৬)

জাভার্টের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া ফ্যান-টাইন ম্যাডেলিনের আতুরাশ্রমে আনীতা হইল। তখন তাহার ভয়ানক জ্বর; সমস্ত রাত্রি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিয়া অবশেষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—স্বেচ্ছাসেবিকাদ্বয় তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ

হইল তখন সর্ব্বপ্রথম ম্যাডেলিনের মূর্ত্তিখানি তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। ম্যাডেলিন তন্ময়-চিত্তে কক্ষপ্রাচীর গাত্রে কিসের প্রতি চাহিয়া-ছিলেন। ফ্যানটাইন সে দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—সেটা একটা ক্রুশ চিহ্ন। মুগ্ধা ফ্যানটাইন কতক্ষণ তাঁহার সে ধ্যানরত মূর্ত্তিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল; গভীর শ্রদ্ধায় ক্রমশঃ তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল; অবশেষে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌ছেন, আপনি?"

ম্যাডেলিন প্রায় একঘণ্টা হইতে সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে সম্বোধনে ফ্যানটাইনের কাছে সরিয়া আসিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি তুলিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"কেমন আছ এখন?" "ভাল আছি। ঘুমিয়ে শরীরটা ভাল বলে মনে হচ্ছে।" "ভাল।—কি করছিলাম জিজ্ঞাসা করছ?—যিনি একদিন আপনাকে বলি দিয়েছিলেন, স্বর্গের সেই দেবতার কাছে প্রার্থনা করছিলাম।" তার পর মনে মনে বলিলেন—"মর্ত্ত্যে যে আপনার জীবন বলি দিয়ে এখানে আজ পড়ে রয়েছে, তার জন্য।"

সন্ধ্যার সে ঘটনার পর হইতেই, ম্যাডেলিন, ফ্যানটাইনের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন; তাহার দুঃখদৈন্যময় জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতক্ষণে তিনি জানিয়াছিলেন। তাই বলিলেন—"হাঁ, অভাগিনী জননী,—বড় যন্ত্রণাই তুমি পেয়েছ। তবে, দুঃখ কোরো না; দুঃখ যন্ত্রণা পরীক্ষাই মানুষে দেবত্বের অংশ ফুটিয়ে তোলে; তুমি আজ সেই অমরত্বের অধিকারিণী হয়েছ। যে নরককুণ্ড থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছ,—সেই-ই স্বর্গের সোপান। সেইখান থেকেই আমাদের সবাইকে অগ্রসর হতে হয়।" বলিয়া ম্যাডেলিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। আনন্দে বিশ্বাসে ফ্যানটাইনের মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল,—শ্রীভ্রষ্ট দন্তপাতির সৌন্দর্য্য-পরিহাস!

সেই রাত্রিতে জাভার্ট প্যারীর পুলিশের অধ্যক্ষকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া, পরদিন স্বহস্তে ডাকে দিয়া আসিল।

ডাকঘরের লোকেরা শিরোনামায় তাহার হস্তাক্ষর দেখিয়া ভাবিল সেটা বুঝি তাহার কর্ম্মত্যাগ পত্র,—কারণ, সে দিনের সন্ধ্যার সে ঘটনা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে, ম্যাডেলিন আর কালবিলম্ব করিলেন না।—ফ্যানটাইনের কাছে থেনে-ডিয়ারদের ১২০ ফ্রাঙ্ক পাওনা হইয়াছিল,—পরদিন তিনি তাহাদের নামে ৩০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন—"কসেটকে অবিলম্বে লইয়া আসিবেন; তাহার মাতা সংশয়াপন্না পীড়িতা, তাকে তিনি দেখিতে চান।"

সে পত্র পাইয়া থেনেডিয়ার বিস্মিত হইল। স্ত্রীকে বলিল—"ব্যাপার কি বুঝছ? মেয়েটাকে ছাড়া হবে না,—যত পার একে এখন থেকে দু'য়ে নাও। মাগী বুঝি কোন কাপ্তেন পাক্‌ড়েছে।"

উত্তরে, থেনেডিয়ার ৫০০ ফ্রাঙ্কের এক বিল পাঠাইল;—তাহাতে এক ডাক্তারের বিলই ৩০০ ফ্রাঙ্কের ছিল। অবশ্য সেটা কসেটের জন্য নয়;—সে সুস্থই ছিল—সেটা যথার্থতঃ ইপোনাইন ও এজেলমার চিকিৎসা-ব্যয়। একটু নামের তফাৎ মাত্র—তাহাতে এমন কি? অবিশ্বাসক মত সেটা ঈষৎ

পরিবর্ত্তিত করিয়া থেনেডিয়ার তাহার নীচে লিখিল—"৩০ ফ্রাঙ্ক পাইলাম।" তার পর পত্রের মধ্যে সেখানা গাঁথিয়া পাঠাইয়া দিল।

ম্যাডেলিন তৎক্ষণাৎ আরও ৩০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন—"পত্রপাঠ কসেটকে লইয়া আসিবেন।"

সে পত্র পাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিতে বসিল। স্থির হইল,—কসেটকে হাতছাড়া করা হইবে না।

এদিকে ফ্যানটাইনের রোগমুক্তির কোন ক্রুতসম্ভাবনা দেখা গেল না। জ্বর প্রলাপ সমভাবেই চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম স্বেচ্ছাসেবিকাদ্বয় তাহার সেবা করিতে যেন আন্তরিক কিছু ক্ষুণ্ণ হইত। সেবা-ব্রত গ্রহণ করিলেও রমণী চিত্তের গভীর সংস্কার তাহারা দূর করিতে পারে নাই,—তাই অন্তরের সহিত সে পতিতার সেবা তাহারা করিতে পারিত না। কিন্তু ফ্যানটাইনের বাৎসল্য রসপূর্ণ সে মাতৃহৃদয় ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও অন্তর স্পর্শ করিল।—একদিন প্রলাপে সে বলিতেছিল—"আমি পাপী, মহাপাপী,—কিন্তু তবু ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন, তা আমি জানি। যে দিন কসেটকে তিনি আমার বুকে ফিরিয়ে এনে দেবেন, সেইদিন জানব তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। যতদিন আমি মন্দ ছিলাম ততদিন কসেটকে কাছে আনিনি। কেন?—তার ব্যথাভরা চোখের নীরব তিরস্কার সহ্য করতে পারব না বলে। তারই জন্য, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার জন্যই আমি পাপে ডুবেছিলাম,—তাই ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন। যেদিন কসেট আসবে, সেদিন তাঁর আশীর্ব্বাদও সে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তার দিকে চেয়ে, তার সরল পবিত্র মুখখানি দেখে, আমার এ শরীর মন পবিত্র হয়ে যাবে। সে যে দেবদূত,—তোমরা তা জান না বুঝি, দিদি? তার মত বয়সে তাদের পাখা ত ঝরে যায় না।"—স্বেচ্ছাসেবিকাদ্বয় করুণনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

ম্যাডেলিন প্রত্যহ দুইবার করিয়া তাহার সম্বাদ লইয়া যাইতেন। প্রতিবারই ফ্যানটাইন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত—"আমার কসেট? করে আস্‌বে সে? করে তাকে দেখতে পাব?" ম্যাডেলিন উত্তর দিতেন—"শীঘ আসবে, আজকালের মধ্যে এল বলে।"—অমনি ফ্যানটাইনের শীর্ণ মুখখানি আশায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

কিন্তু চিকিৎসায় ফল বড় হইতেছিল না। ফ্যানটাইনের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছিল। অবশেষে একদিন ডাক্তার ম্যাডেলিনকে বলিলেন "দেখুন, এঁর মেয়েকে আর আনতে দেরী করবেন না।"

ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন। তবে কি আর কোন আশা নাই?

"কি বলছিলেন ডাক্তার?"

ম্যাডেলিন অতি কষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া, শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বলছিলেন তোমার মেয়েকে শীঘ আনতে। সে এলে তুমি সেরে উঠবে, তাই।"

"ঠিক কথা। দেখেছেন, ডাক্তার সাহেব ঠিক বোঝেন।—কিন্তু তাকে তারা পাঠাচ্ছে না কেন? এইবার সে আস্‌বে আমি ঠিক জানি।"

কিন্তু থেনেডিয়ারেরা নানা ওজর আপত্তি

তুলিতে লাগিল। কসেটের স্বাস্থ্য ভাল নয়, এ দারুণ শীতে তাহার যাওয়া অসম্ভব, তার উপর, খুচরা খরচ হিসাবে তখনও তাহাদের অনেক পাওনা বাকী,—সে সবের হিসাবপত্র তাহারা করিতেছে, ইত্যাদি। অবশেষে ম্যাডেলিন বলিলেন—'দেখ্‌ছি, সুবিধা নয়। এখান থেকেই কা'উকে পাঠাই। তেমন দেখি ত, নিজেই না হয় যাবো।" বলিয়া ফ্যান-টাইনের জবানী একখানা পত্র লিখিয়া তাহা ত তাহার সহি করাইয়া লইলেন।—পত্রে শুধু এই কয়টি কথা লেখা ছিল :—"থেনেডিয়ার মহাশয়। পত্রবাহকের হাতে কসেটকে দিবেন। তিনি আপনার সমস্ত দেনাপত্র মিটাইয়া দিবেন। আমায় নমস্কার জানিবেন। ইতি—"

কিন্তু, মানুষ গড়ে দেবতায় ভাঙ্গে। সহসা কোথা হইতে অতর্কিতভাবে এক দারুণ বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। যে বহস্যাচ্ছন্ন প্রস্তরস্তূপ হইতে মানব জীবনের উদ্ভব, সে প্রস্তরখণ্ড আমরা যতই মার্জ্জিত করিনা কেন, অদৃষ্টের কাল শিরা নিয়তই তাহাতে বাহির হইতে থাকে।

(৭)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার দু' একদিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে ম্যাডেলিন, অফিসে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সম্বাদ দিল—"জাভার্ট সাহেব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।" ——জাভার্ট ?—ম্যাডেলিনের মুখে একটা বিরক্তির ছায়া পড়িল,—ফ্যানটাইনের প্রতি তাহার সে ব্যবহার তিনি তখনও ভুলিতে পারেন নাই ;—বলিলেন—"আস্‌তে বল।"

ম্যাডেলিন অগ্নিকুণ্ডের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, জাভার্ট নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে কিছু দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যাডেলিন আপনমনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

জাভার্টের তৎকালীন মুখভাবের বর্ণনা করা দুরূহ। তবে তাহার অন্তরের মধ্যে যে সম্প্রতি একটা তুমুল সংগ্রাম গিয়াছে, তাহার চিহ্ন তখনও তাহার মুখে প্রকটিত ছিল। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে মুখে তাহার অন্তরছবি সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হইয়া থাকিত।—কি হইয়াছে তাহার ? অকৃত্রিম বিবেকী, সবল, ন্যায়নিষ্ঠ, স্পর্দ্ধী জাভার্ট, আজ দীনের ন্যায়, বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর ন্যায়, ম্যাডেলিনের নিকটে উপস্থিত কেন ? একটা গভীর নৈরাশ্য, বেদনাব্যঞ্জক সঙ্কল্পের ছায়া সে মুখে পরিব্যাপ্ত কেন ?

অনেকক্ষণ পরে ম্যাডেলিন লেখনী পরিত্যাগ করিয়া তাহার দিকে ফিরিলেন।—"কি চাও, জাভার্ট ?"

জাভার্ট কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, যেন আপনাকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইল। তারপর ব্যথিতস্বরে সরলভাবে উত্তর করিল—"হাকিম সাহেব,—একটা অন্যায় ঘটনা হয়েছে।"

"কি ঘটনা ?"

"একজন নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মানহানি করেছে।—কর্ত্তব্য ভেবে আমি তাই সে কথা আপনাকে জানাতে এসেছি।"

"কে সে কর্ম্মচারী ?"

"আমি।"

"তুমি ?"

"আজ্ঞে, হঁ।"

"আর, সে ম্যাজিষ্ট্রেট ?"

"আজ্ঞে, আপনি।"

ম্যাডেলিন সোজা হইয়া বসিলেন। জাভার্টের দৃষ্টি গম্ভীর; অবনতমুখে সে বলিল—"হাকিম সাহেব, আমি তাই অনুরোধ করতে এসেছি যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে আমায় কাজ থেকে বরখাস্ত করে দিন।"

ম্যাডেলিন বিস্মিত হইলেন। জাভার্ট বলিয়া চলিল—"আপনি বলবেন যে আমি কর্ম্মত্যাগ পত্র ত দিতে পারি ? পারি, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করার যে সম্মান, আমি সে সম্মানের অধিকারী নই। আমি অপরাধী, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত—কাজ থেকে বরখাস্ত হওয়াই আমার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি।" তারপর থামিয়া,——"সে দিন অন্যায়ভাবে আমার উপর কঠোর হয়েছিলেন, আজ ন্যায়-বিচারে সেই রকম কঠোর হোন্।"

"কি বলছ তুমি ? কি অন্যায় করেছ তুমি ? কি হিসাবে নিজেকে দোষী বলছ ? তুমি কি কাজ থেকে অবসর দিতে চাও ?"

"অবসর নিতে নয়, বরখাস্ত হতে।"

"আচ্ছা তাই না হয় হ'ল। কিন্তু, আসল ব্যাপারটা কি ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, দুঃখিত স্বরে জাভার্ট বলিল—"ঘটনা গুরুতর। মাস দেড়েক আগে সেই স্ত্রীলোকটার ঘটনার পর, আপনার উপর ভয়ানক রাগ হওয়ায় আমি আপনার নামে নালিশ করি।"

"আমার নামে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।—প্যারীর পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে।"

ম্যাডেলিন হাসিয়া বলিলেন—"কেন ? ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে পুলিশের ওপর হুকুম চালিয়েছি বলে ?"

"একজন পুরাণো আসামী বলে।"

ম্যাডেলিনের মুখ সহসা আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।—জাভার্ট মুখ না তুলিয়াই বলিয়া চলিল——"আমি তখন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম। অনেক দিন থেকেই আমার মনে আপনার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জেগেছিল। আপনার চেহারা, ফ্যাবেরোল-গ্রামে আপনার অনুসন্ধান সম্বাদ, আপনার অসাধারণ শক্তি, বৃদ্ধ ফসিলেভাণ্টের ঘটনা, আপনার বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্য, আপনার অল্প খুঁড়িয়ে চলার ভাব,——এ সব দেখে আমার মনে ধারণা হয়েছিল যে আপনি নিশ্চয়ই জীন ভ্যালজিন।"

"কি বল্লে ? কি নাম বল্লে ?"

"জীন ভ্যালজিন। বিশ বছর আগে ত্যুলঁতে আমি তাকে প্রথম দেখি। গ্যালি থেকে খালাস পেয়ে, শুনতে পাই, সে কোন্ এক ধর্ম্মযাজকের জিনিষ পত্র চুরি করে; তারপর, হাতিয়ার নিয়ে, রাজপথে একটা ছোঁড়ার ওপর সে রাহাজানি করে। আট বৎসর ধরে তার সন্ধান চল্‌ছিল। আপনাকে আমি সেই জীন ভ্যালজিন ভেবেছিলাম।"

ম্যাডেলিন কাগজপত্রে পুনরায় মনোনিবেশ করিতে করিতে, তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন——"কর্ত্তৃপক্ষেরা তাতে কি উত্তর দিলেন ?"

"যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"তাই ?"

"আজ্ঞে তাই। তাঁদের কথাই ঠিক।"

"ভাল কথা।"

"আজ্ঞে হাঁ, কারণ আসল জীন ভ্যালজিন ধরা পড়েছে।"

সহসা কাগজপত্রগুলা ম্যাডেলিনের হস্তচ্যুত হইয়া কক্ষতলে পতিত হইল। ম্যাডেলিন স্থির দৃষ্টিতে জাভার্টের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন——"হুঁ !"

"ঘটনাটা সব শুনবেন ? তবে বলি।—এইলি-লে-হট্ ক্লচার বলে যে একটা জায়গা আছে তারই কাছে ফাদার স্যাপম্যাথিউ বলে একটা সাদাসিদা ধরণের বুড়ো অনেকদিন থেকে বাস করত। সে বুড়ো একদিন কার এক বাগান থেকে কতকগুলা নোনা আতা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। চুরি, পাঁচিল টপ্‌কানো, গাছের ডাল ভাঙ্গা;—(হাতে একটা ডাল শুদ্ধ সে ধরা পড়ে)—কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তার ফাটকের হুকুম হয়ে গেল। দৈবের খেলা, তাই তখন সেখানকার জেলখানা সারানো হচ্ছিল বলে তাকে অ্যারাসের জেলে পাঠানো হয়। সেখানে ব্রেভেট বলে এক পুরাণো কয়েদী তাকে দেখেই বললে—'এ যে জীন ভ্যালজিন দেখছি।' 'জীন ভ্যালজিন আবার কে ?' বলে বুড়ো তাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে। কিন্তু তা কি হয় ? পুলিশ থেকে তখন তদন্ত আরম্ভ হল। শেষে, প্রমাণ পেলে যে ত্রিশ বছর আগে সে ক্যাবেরোলে কাঠুরিয়ার ব্যবসা করত; গ্যালিতে যাবার আগে জীন ভ্যালজিনেরও সেই ব্যবসা ছিল। তার পর,—নাম। এ লোকটার দীক্ষা-নাম জীন, মায়ের বংশের নাম ম্যাথিউ; সুতরাং তার আসল নাম হল জীন ম্যাথিউ। কিন্তু কিছুদিন এ অভার্ণেতে থাকে; সেখানকার লোকে 'জীন'কে 'স্যান' বলে উচ্চারণ করে;—কাজেই জীন ম্যাথিউ থেকে স্যান ম্যাথিউ সহজেই হয়; আর, তার পর তা থেকে স্যাপম্যাথিউ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য, ক্যাবেরোলে তার বংশের কারও সন্ধান এখনো মেলে নি,—তা তাতে এমন কিছু এসে যায় না; অনেক বংশ এমন ভাবে বেমালুম লোপ পেয়ে যায়। তার পর, তুলোঁ থেকে দুজন যাবজ্জীবন কয়েদী আনা হয়েছিল,—তারাও তাকে সনাক্ত করেছে। আমিও নিজে গিয়েছিলাম।"

"হুঁ"

"আমিও তাকে চিনেছি। সত্য যা, তা চিরদিনই সত্য।

ম্যাডেলিন মৃদুস্বরে বলিলেন—"ঠিক বলছ, তোমার কোন ভুল হয় নি ?"

"আজ্ঞে না।"—জাভার্ট হাসিল,—স্থির বিশ্বাসের সে হাসি।

সহসা ম্যাডেলিন বলিলেন—"আচ্ছা, সে লোকটা কি বলে ?"

"সে ? সে বড় ঝানু; সে স্যাকা সেজে বসে আছে। অন্য কেউ হলে কত কাঁদাকাটি করত, সে যে জীনভ্যালজিন নয় তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করত; কিন্তু এ বড় ধূর্ত্ত। তাই শুধু বলে 'আমি স্যাপমাথিউ, আমি দোষী নই।' কারণ সে খুবই বোঝে যে তার পরিচয়-মাত্রেই যা কিছু গুরু অপরাধ; পরিচয় একবার প্রমাণ হয়ে গেলে জীবনের শেষ কটা দিন গ্যালিতেই কাটবে। দু' দুটো

অভিযোগ তার নামে,—এক এই চুরি, দ্বিতীয়—আট বছরের আগেকার সেই রাজপথে রাহাজানি। কিন্তু তার ন্যাকামি খাটবে না। চারজন লোকে তাকে সনাক্ত করেছে। অ্যারাসের সেসনে তার বিচার হবে,—আমারও যাবার জন্য শমন হয়েছে।"

ম্যাডেলিন পুনরায় কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; কখনও পড়িতেছিলেন, কখনও লিখিতেছিলেন—যেন বড় ব্যস্তসমস্ত ভাব। কিয়ৎক্ষণ পরে জাভার্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "থাক্, ও সব বিস্তারিত সম্বাদে আমার আগ্রহ নেই,—সময় নষ্ট করা মাত্র।—বলছিলাম কি, দেখ, তুমি ফলওয়ালা বুসপিয়ে বুড়ীর কাছে গিয়ে তাকে গাড়ীওয়ালা পিয়ারে চেসসেলভের নামে নালিশ করতে বলে দিয়ো। সেটা একটা পশু, বুড়ী আর তার ছেলেকে মেরে ফেলবার মত করেছিল—তার শাস্তি হওয়া দরকার।" তার পর তাহাকে অন্যান্য অনেক কার্য্যের ভার দিয়া বলিলেন—'৩। এত কাজ কি তুমি এর মধ্যে করতে পারবে? ৮।১০ দিনের মধ্যেই না তুমি অ্যারাসে যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে, তারও আগে। কাল বিচার,—আমাকে আজ রাত্রের ডাকগাড়ীতেই যেতে হবে।"

ম্যাডেলিনের দেহ ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল।

"ক' দিন লাগ্‌বে?"

"বড় জোর একদিন। কাল সন্ধ্যার পরই রায় বেরুবে নিশ্চয়। তবে, আমি ততক্ষণ থাক্‌ব না। আমার সাক্ষী হয়ে গেলেই আমি চলে আস্‌বো।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ম্যাডেলিন তাহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু জাভার্ট নড়িল না।

"কি চাও আর?"

"আজ্ঞে, বরখাস্তের হুকুম।"

ম্যাডেলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"জাভার্ট, তুমি ন্যায়নিষ্ঠ আমি জানি, সেজন্য তুমি আমার সম্মানের পাত্র। অনর্থক নিজের দোষটাকে বড় বলে ভাবছ। বিশেষতঃ কথাটা ত আমাকে নিয়েই?—তুমি যে রকম কার্য্যদক্ষ, তাতে তোমার পদোন্নতি হওয়াই উচিত। আমি বল্‌ছি তুমি কাজ ছেড়ো না।"

জাভার্ট ম্যাডেলিনের প্রতি চাহিল,—তাহার অমার্জ্জিত কঠোর এবং পবিত্র অন্তরছবিখানি সে চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল। ধীর স্বরে সে বলিল "মাপ কর্‌বেন, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না।"

"দেখ, কথাটা আমার নিয়েই।—তোমার এ বিষয়ে বিচারের কোন আবশ্যকতা নেই।"

কিন্তু জাভার্টের তবু সেই এক কথা। সে বলিল—"দেখুন, আমার দোষ যে আমি অনর্থক বাড়াচ্ছি, তা নয়। সন্দেহ যে করেছিলাম সেটা কিছু নয়, আমাদের ব্যবসাই সন্দেহ করা। কিন্তু, যথার্থ প্রমাণ না পেয়ে, রাগের মুখে, শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্য, আপনাকে——একজন ভদ্রলোক হাকিম নগরাধ্যক্ষকে——একটা সামান্য তাঁবেদার মাত্র হয়ে যে একজন গ্যালীর আসামী বলে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছি—সে অপরাধের ক্ষমা হ'তেই পারে না। আমার তাঁবেদার কেউ এ কাজ করলে তাকে কি আমি ক্ষমা

করতাম? এ ক্ষেত্রে নিজে দোষী বলেই কি আমি রেহাই পেয়ে যাব?—এ কি কথা? বিচার আমার পক্ষে একরকম, অন্যের পক্ষে আর একরকম, তা হতে পারে না। যে যত বড়ই হোক্ না কেন, অন্যায় করলেই তাকে আর দশজনের সঙ্গে সমান ভাবে শাস্তি নিতে হবে। দয়া আমি চাইনে, সে দিনকার মত আজ আর করুণার অপব্যবহার না। আমি চাষ বাস করে খাব সেও ভাল। পুলিশ-বিভাগের মর্যাদারক্ষার জন্যও না হয় আমাকে তাড়িয়ে দিন——আমি সেই হুকুমেরই প্রার্থনা করছি।” জাভার্টের কণ্ঠস্বর স্থির, কতকটা মরিয়া হওয়ার মত, নম্রতাসূচক, অথচ ভিক্ষানুনয়ের ছায়ামাত্র শূন্য, তাহা যেন তাহার নিষ্ঠার জীবনে এক অদ্ভুত মহিমা আনিয়া দিতেছিল।

“আচ্ছা পরে ভেবে দেখ্‌ব।” বলিয়া ম্যাডেলিন করমর্দ্দনের জন্য তাহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন।

জাভার্ট চকিতে কয়েকপদ পিছাইয়া গেল। —“ক্ষমা করবেন, হাকিম হয়ে গুপ্তচরের সঙ্গে করমর্দ্দন করবেন না।” আপন মনে অস্ফুট-স্বরে বলিল—“গুপ্তচরই ত। যে মুহূর্ত্ত থেকে আমি আমার পদমর্য্যাদার অপব্যবহার করেছি সে মুহূর্ত্ত থেকেই ত আমি হীন গুপ্তচর হয়েছি।” তার পর, গভীর সম্ভ্রমের সহিত ম্যাডেলিনকে অভিবাদন করিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল। দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অবনতমুখে বলিল—“যে ক'দিন আমায় অবসর না দিচ্ছেন শুধু সেই ক'দিন আমি কাজ করব।”

জাভার্টের স্থির পদক্ষেপ শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল; ম্যাডেলিন বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

(৮)

সে দিন অপরাহ্নে ম্যাডেলিন যখন ফ্যানটাইনকে দেখিতে আসিলেন, তখন তাহার অসুখ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তবু ম্যাডেলিনকে দেখিয়া তাহার মুখে আনন্দ-রেখা ফুটিয়া উঠিল, সাগ্রহে সে সুধাইল ——“কসেট?”

মৃদু হাসিয়া ম্যাডেলিন উত্তর দিলেন—“শীঘ্রই আসবে।”

সেদিন অর্দ্ধঘণ্টার স্থানে পূর্ণ এক ঘণ্টাকাল তিনি সেখানে রহিলেন; এবং প্রত্যেককে ডাকিয়া, রোগিনীর যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দিলেন। রোগিনীর অবস্থা ক্রমশই সঙ্কটাপন্ন হইতেছিল, —ডাক্তার আসিয়া একরূপ জবাবই দিয়া গেলেন। ম্যাডেলিন, স্তব্ধ গম্ভীরভাবে কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বিদায় লইলেন।

সেখান হইতে বরাবর অফিসে আসিয়া ফ্রান্সের পথ ঘাটের মানচিত্রখানা লইয়া একখানা কাগজে কি টুকিয়া লইয়া, ম্যাডেলিন একটা নির্জ্জন সোজা পথ ধরিয়া নগরের অপর-প্রান্ত অভিমুখে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। পথে, ধর্ম্মযাজকের বাটি, তাহা অতিক্রম করিয়া কতকদূর অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া তার সদর দরজার কড়াটা ধরিয়া একবার দাঁড়াইলেন; তারপর কয়েকমুহূর্ত্ত ধরিয়া কি ভাবিলেন; অবশেষে, ধীরে ধীরে সেটাকে ত্যাগ করিয়া, চিন্তান্বিত মুখে পুনরায়

আপনার গন্তব্যস্থল স্কফ্লেয়ারের বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

স্কফ্লেয়ার ঘোড়া এবং আবশ্যক হইলে যানাদিও ভাড়া দিত। সে তখন বাড়ীতেই ছিল,—একটা ঘোড়ার সাজ মেরামত করিতেছিল। ম্যাডেলিন বলিলেন—— "দেখ, তোমার ভাল ঘোড়া আছে?"

"ভাল ঘোড়া? আমার সব ঘোড়াই ভাল। কি রকম চান আপনি?"

"একদিনে ২০ লিগ পথ চল্‌তে পারে?"

"গাড়ী নিয়ে?"

"হাঁ" বলিয়া ম্যাডেলিন সেই কাগজখানা বাহির করিয়া বলিলেন "৫, ৬, ৮৷৷—একুনে কুড়িই ধর। আছে এমন ঘোড়া?"

"আছে। আমার সাদা ঘোড়াটা আট ঘণ্টায় পৌঁছে দিতে পারবে। কিন্তু ভারী গাড়ী চলবে না। আমার খোলা টমটম্ খানা নিতে হবে। রোজ ত্রিশ ফ্রাঙ্ক ভাড়া লাগবে কিন্তু তাতে।"

"এই নাও দুদিনের আগাম ভাড়া।" বলিয়া দুইটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার হাতে দিয়া ম্যাডেলিন উঠিলেন।—"কিন্তু আজ রাত্রি ৫৷৷ টার সময় যেন আমার বাড়ীর দরজায় গাড়ী ঘোড়া হাজির থাকে।" তারপর কি ভাবিয়া বলিলেন—"তোমার গাড়ী ঘোড়ার দাম কত হবে?"

"কেন, আপনি কিন্‌তে চান?"

"না, তা নয়; তবে, দামটা আমি দিয়ে রাখতে চাই। না হয় ফিরে এসে আবার টাকাটা ফিরিয়ে নেবো।"

"পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক।"

"এই নাও।" বলিয়া একখানা নোট তাহার হাতে দিয়া ম্যাডেলিন সে স্থান ত্যাগ করিলেন।—বেচারা স্কফ্লেয়ার আপশোষ করিতে লাগিল ১০০০ ফ্রাঙ্ক সে কেন বলে নাই?

ফিরিবার সময় ম্যাডেলিন, একটু ঘুরিয়াই, বড় রাস্তা দিয়া আসিলেন;—ধর্ম্মযাজকের আবাসে বুঝি তাঁর কিসের প্রলোভন ছিল।

খাতাঞ্চির কক্ষ ম্যাডেলিনের কক্ষের ঠিক নীচে। মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।—উপরের কক্ষে কে যেন পাদচারণা করিতেছে। ধীরভাবে কতক্ষণ ধরিয়া সে শুনিল—সে পদক্ষেপ ম্যাডেলিনের। কিয়ৎক্ষণ পরে যেন আলমারি খোলার শব্দ হইল, কি যেন একটা জিনিষ কে স্থানান্তরিত করিল,—তারপর পুনরায় সে পাদচারণা আরম্ভ হইল।—সে রাত্রে আরও দুইবার তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়; প্রতিবারই উপরের কক্ষে সেই ধীর স্থির পাদচারণা তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতে লাগিল।

(৯)

ম্যাডেলিনই যে জীনভ্যালজিন, সে কথা বোধ হয় আর পাঠক পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

পূর্ব্বে একবার তাহার অন্তর-প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়াছি, আজ এই পরিচ্ছেদে আর একবার করিব।—মানব-জীবন চিরদিনই দুর্ভেদ্য রহস্যাচ্ছন্ন। ইহা অপেক্ষা ভীষণ, জটিল, রহস্যময়, সীমাতীত বুঝি আর কিছু নাই;—মানবের কল্পনায় আর কিছু আসিতেও পারে না। সমুদ্রের অপেক্ষা রহস্যময় একটা জিনিষ আছে—তাহা নভোমণ্ডল; এবং তদপেক্ষাও অদ্ভুত রহস্যাচ্ছন্ন আর একটা জিনিস আছে,—তাহা মানবের আত্মা, অন্তরতম প্রকৃতি।

যে কোন মানব—হউক সে মহান্, হউক সে পিশাচতুল্য—তাহার যথার্থ অন্তরতম প্রকৃতি লইয়া যদি কখন কেহ এক সম্পূর্ণ কাব্য লিখিতে পারে,—তাহা হইলে সে কাব্যের কাছে জগতের আর সকল কাব্যকেই ম্লান হইয়া পড়িতে হইবে। মরীচিকার ছলনা, লালসা-প্রলোভনের ক্ষেত্র, কামনা-বাসনার অগ্নিকুণ্ড, দৈন্য পরাজয়ের গুহাভ্যন্তর অবিশ্বাসের অট্টহাস, রিপু দানবের সংগ্রাম-ক্ষেত্র——এই না মানবের অন্তর? বাহিরের কৃত্রিম শান্তির অন্তরালে কি সে অশান্তির তীব্র কশাঘাত। হোমর-বর্ণিত রাক্ষসের সংগ্রাম; মিল্টনের পিশাচগণের মেলা, ছায়াবাজীর খেলা; দান্তের নরকচিত্র;—সবই তাহাতে একাধারে বর্ত্তমান। কি সে অন্ধকার মানবের অসীমত্বকে ছাইয়া আছে। তাই মানব, অসীমত্বের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিতে গিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে বসে—কোথায় তাহার ইচ্ছাশক্তি, কতটুকু বা তার কার্য্যশক্তি!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছোকরা জারভিসের সহিত সে ঘটনার পর সহসা জীনের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে,—বুঝি সেটা শুধু পরিবর্ত্তন নয়—সে যেন নবজীবনের চেতনা। বিশপের আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছিল।

ডি—হইতে পলাইয়া আসিয়া, রূপার বাতিদান দুইটা বাদে অন্যান্য বাসনগুলা বিক্রয় করিয়া সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে; তারপর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে ম—তে আসিয়া পৌঁছায়। তাহার পরবর্ত্তী ইতিহাস আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে জানিয়াছি।

ম—তে আসিয়া আশায় বিশ্বাসে শান্তিতে ম্যাডেলিন কাল কাটাইতেছিলেন। দুইটি মাত্র তাঁহার লক্ষ্য ছিল;—আত্মগোপন এবং পবিত্রভাবে জীবন-যাপন; মানুষ হইতে দূরে থাকা, এবং ভগবানের চরণে ফিরিয়া যাওয়া। সে দুইটি একই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, ওতঃপ্রোতভাবে তাঁহার সমস্ত জীবন, কার্য্য এবং চিন্তা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তবে, সময়ে সময়ে তাহাতে বিরোধ বাধিত।—বিশপ-প্রদত্ত বাতিদান-রক্ষণে, তাঁহার মৃত্যুতে শোকচিহ্ন-ধারণে, হা-ঘরে বালকদিগের প্রতি প্রশ্নে, ফ্যাবেরোল পল্লীতে পুরাতন বংশীয়দের অনুসন্ধানে, জাভার্টের তীব্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সত্ত্বেও বৃদ্ধ ফসিলেভাণ্টের উদ্ধার-সাধনে,—দুইদিক তাঁহার রক্ষা হয় নাই। সে সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই তাঁহার বলবান হইত,—সে সব সময়ে তিনি ভাবিতেন তাঁহার প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য—অপরের প্রতি, নিজের স্বার্থ-রক্ষা নয়।

কিন্তু আজিকার এ পরীক্ষার ন্যায় ভীষণ পরীক্ষায় ম্যাডেলিন ইতিপূর্ব্বে পড়েন নাই! স্বার্থ-পরার্থের জীবন মৃত্যুর এ কি ভীষণ সংগ্রাম! প্রথম যখন জাভার্টের মুখে তাঁহার বহুকাল বিস্মৃত পুরাতন নাম উচ্চারিত হইতে শুনিলেন, তখন প্রথমটা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তিনি বিকল হইয়া পড়িলেন,—অদৃষ্ট যেন পরিহাস করিয়া তাঁহার শ্রবণে পৈশাচিক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তার পর, একটা ভীষণ আঘাতের পূর্ব্ব সূচনার ন্যায় তাঁহার দেহ একবার কম্পিত হইয়া উঠিল। ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বে মহীরুহ যেরূপ আনত হইয়া থাকে, তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ ঘটিল।

তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বজ্রগর্ভ রাশি রাশি মেঘ একত্রিত হইয়া প্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা করিতেছিল। একবার তাঁহার মনে হইল, —তখনি ছুটিয়া গিয়া, আপনার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিয়া, নিরীহ বৃদ্ধকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া, নিজে তাহার স্থলে গিয়া দাঁড়ান। কিন্তু সে চিন্তা তীব্র সূচীবেধের ন্যায় সহসা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল, অমনি তিনি ভাবিলেন—"ভাল, দেখাই যাক না, কতদূরে গিয়ে দাঁড়ায়?" অবশ্য বিশপের সে অপূর্ব্ব করুণার পর, এত বর্ষের অনুতাপ এবং আত্মত্যাগের পর, যদি ম্যাডেলিন এ ভীষণ পরীক্ষার দিনে পশ্চাৎপদ না হইয়া, এ করালবদনবিস্তারী আকস্মিক বিপদের মুখে আপনাকে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেই বুঝি তাঁহার জীবন সার্থক হইত। কিন্তু আমরা কাল্পনিক নহি, বাস্তবজীবনে যাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি মাত্র।

সর্ব্বপ্রথমে আত্মসংরক্ষণের ভাবটাই তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। জাভার্টের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া, দারুণ ভীতিতে চকিতে চিত্ত স্থির করিয়া লইয়া, তিনি আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইলেন।

সমস্ত দিন তাঁহার সেই 'বাহিরে প্রশান্তি তার অন্তরে আগুণ' ভাবে কাটিল। আত্মরক্ষার জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন চলিতেছিল। একটা নিদারুণ আঘাতের অনুভূতি ব্যতীত অপর কিছু বুঝিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় দৈনিক কার্য্যাদি করিয়া গেলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, কি জানি যদি অ্যারাসে যাইতে হয়, তাই স্কফেয়ারের কাছে গিয়া ঘোটকের এবং যানের বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন।

কিন্তু কোন একটা স্থির সঙ্কল্প তখনও তাঁহার ছিল না।—যাই হউক, স্বেচ্ছাসেবিকা স্বহস্তে ফ্যানটাইনের সমস্ত ভার দিয়া, এবং যানাদির ব্যবস্থা করিয়া, আকস্মিক যে কোন ঘটনার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

কি অদ্ভুত এ ঘটনা। ম্যাডেলিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া কক্ষের অর্গল দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন। বাহির হইতে হঠাৎ কেহ যেন তাঁহার উপর না আসিয়া পড়ে।—মুহূর্ত্ত পরে বাতিটাও নিভাইয়া দিলেন। যদি কেহ সে আলোতে তাঁহাকে দেখিতে পায়?

কে আসিবে? কে দেখিবে? হায় ম্যাডেলিন। যাহাকে বাহির করিবার জন্য অর্গল বন্ধ করিলে, যাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দীপ নির্ব্বাপিত করিলে—তাহাকে ত দূরে রাখিতে পারিলে না। সে যে অন্তরেই রহিয়া গেল। সে যে তোমার বিবেক—স্বয়ং ভগবান।

প্রথমটা কিন্তু ম্যাডেলিন আপনাকে নিশ্চিন্ত মনে করিলেন। অন্ধকারে টেবিলের উপর কনুয়ের ভর দিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"কোথায় আমি? এ কি স্বপ্ন নয়, সত্য?—জাভার্ট এ কি সম্বাদ আনিয়া দিল? কি এর পরিণাম?"—তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে কিছুরই ধারণা হইতেছিল না। চিন্তারাশি স্রোতের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—ম্যাডেলিন দুইহস্ত দিয়া

ললাট দেশ চাপিয়া ধরিয়া বিফল প্রয়াসে তাহাদের গতি রোধ করিতে চাহিতেছিলেন। —সমস্ত মস্তিষ্ক ব্যাপিয়া লেলিহ অগ্নিশিখা উঠিতেছিল। কি তীব্র তাপ তার। ম্যাডেলিন উঠিয়া বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিলেন,—আকাশে তারার চিহ্নমাত্র নাই। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পূর্ণ একঘণ্টাকাল এইরূপ কাটিল।

তারপর ধীরে ধীরে, সে ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া দু'একটি রেখা চিত্র ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ম্যাডেলিন আপন অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিলেন।

তাঁহার এই কয়বৎসরের কার্য্যাবলির নৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিলে, এতদিন ধরিয়া তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন—তাহা আত্ম-নাম-গোপনের উদ্দেশ্যে শুধু গহ্বর-খননের ন্যায়ই বুঝি ব্যর্থ হইয়াছে। বিনিদ্র রজনীতে আত্ম চিন্তার মধ্যে একটিমাত্র চিন্তাতেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন—পাছে কখনো পুনরায় সে নাম তাঁহার কর্ণে পশে। সে দিন বুঝি তাঁহার সকল আশা ভরসা, কার্য্য-চিন্তা, এবং এ নূতন জীবনের অবসান ঘটিবে।—আজ ত সে মুহূর্ত্ত আসিয়াছে,—কিন্তু চিন্তার অতীত, কল্পনারও অতীতভাবে! এ যে তাঁহার নূতন জীবনের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতেই চায়, রহস্যকে আরও গভীর করিয়াই তোলে! দশের শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান বৃদ্ধিই করিয়া দিতে চায়!—এ কি ঘটনার রহস্যলীলা!

ম্যাডেলিনের দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমশই কুয়াসা অপসৃত হইতেছিল। যেন এইমাত্র তিনি কোন অদ্ভুত স্বপ্নে মগ্ন ছিলেন,—যেন গভীর রজনীতে এক অতলস্পর্শী গহ্বরের কাছে তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছেন,—আর দূরে, অন্ধকারে, অপর একজন লোককে, তাঁহাকে মনে করিয়া, অদৃষ্ট, সেই গহ্বরের মুখে টানিয়া আনিতেছে।—এক-জনকে সে গহ্বরে আপতিত হইতেই হইবে—হয় তাঁহাকে নয় তাকে; নহিলে সে গহ্বর তৃপ্ত হইবে না। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, অদৃষ্টের গতিরোধ করিবার শক্তি যেন তাঁহার ছিল না।

কুয়াসা-জাল এতক্ষণে সহসা অপসৃত হইয়া গেল। ম্যাডেলিন মানসচক্ষে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন গ্যালিতে তাঁহার স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, ছোকরা জারভিসের উপর সে অত্যাচার যেন জীবন্ত হইয়া প্রতি-শোধ বাসনার সে শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই টানিতেছে—তাহা হইতে পরিত্রাণের আর উপায় নাই, তাঁহাকে সেখানে না লইয়া সে কিছুতেই তৃপ্ত হইবে না।—কিন্তু সে স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আর এক হতভাগ্য ত আসিয়া জুটিয়াছে। তবে, আর কেন সে শঙ্কা? বর্ত্তমান তাঁহার কে নষ্ট করিতে পারে? থাক্ না ভবিষ্যতে শাঁপম্যাথু তাঁহার নাম লইয়া গ্যালীর কারা-গারে?—কিন্তু,—নির্দ্দোষীর শিরে কলঙ্কের ছাপ একবার পড়িলে সে ত আর ঘুচিবে না! ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন। একটা আনন্দ, একটা গভীর আক্ষেপ, একটা পরিহাসের যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ-মন যুগপৎ প্রবলবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল।—ত্রস্তে তিনি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

শাকটায়ন যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পাণিনি নিজ সূত্রে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন; যথা "লঙঃ শাকটায়নস্য" (৩.৪।১১১ পাঃ ২৪৬৩ সিঃ) শাকটায়নের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শাকটায়নই যে পাণিনির আদর্শ তাহা উভয় ব্যাকরণ মিলাইলে বুঝা যায়। পাণিনি শাকটায়নের অনেক সূত্র যথাযথ লইয়াছেন, অনেক সূত্র ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্যথা—"উক্তত্ববপদাদৌ পদ্যো" "অভিনিবিশশ্চঃ" "সপ্তমী শৌণ্ডাদিভিঃ" প্রভৃতি শাকটায়ন সূত্র বিনা পরিবর্ত্তনে পাণিনি কর্ত্তৃক গৃহীত। "পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ঢণ্" "পাঘ্রাধ্মাস্থাম্নাদাণ্দৃশ্যর্ত্তি শ্রৌতিধিধ্বৃকৃণ্বশদসদঃ পিবজিঘ্রধমতিষ্ঠমনযচ্ছপশ্যর্চ্চ সৃধিকৃশীয়সীদম্" প্রভৃতি শাকটায়নের সূত্র পাণিনি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। শাকটায়ন "যুধিগবেষ্ঠিরঃ" (২।২।১৫৬) দ্বারা যুধিষ্ঠির গবিষ্ঠির শব্দ সাধিয়াছেন। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুঞ্" (৩।১।১৯৪) সূত্রে তিনি বাসুদেব এবং বাসুদেব-সখা নরঋষির অবতার উপাস্য অর্জ্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন। "দ্রোণ পর্ব্বতজীবন্তাদ্বা (২।৪ ৩৭) সূত্রে দ্রোণ এবং দ্রৌণীর; "গান্ধাধিশাল্বেয়াভ্যাম্" (২।৪।৯৯) সূত্রে গান্ধারী ও গান্ধারের, শাল্ব ও শাল্বেয়ের এবং "কুন্ত্যবন্তেঃ স্ত্রিয়াম্" (২।৪।১০৫) সূত্রে কুন্তী ও অবন্তির উল্লেখ করিয়াছেন। "গোত্রে বাহ্বাদিভ্যঃ" (২।৪।২২) সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পাণিনি বাহ্বাদিগণের সঙ্কেত শাকটায়নের নিকট পান। ঐ বাহ্বাদিগণে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, প্রদ্যুম্ন, গদ, শাম্ব প্রভৃতি যদুবীর ও কুরুবীরের নাম আছে। শাকটায়ন ব্যাসদেবের নাম "সুধাতৃব্যাসবরুটনিষাদচণ্ডালবিম্বস্যাকঙ চ" সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাসের পুত্র বৈয়াসকি বলায় শুকদেবেরও নাম ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। "শিলালিপারাশর্য্যান্নটভিক্ষু" (৩।১।১১৭) সূত্রে প্রকাশ যে পারাশর্য্য শাকটায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী। ঐ পারাশর্য্য কৌথুম পারাশর্য্যই হইবেন। তাহা হইলে ব্যাসদেব শাকটায়ন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। "পৈলাদবিপ্রাৎ (২।৪।১২৫) সূত্রে প্রকাশ যে শাকটায়ন পৈল নামে বিপ্র বা ব্রাহ্মণের বিষয় জানিতেন। ঐ পৈল ব্যাসশিষ্য পৈল কি না এই বিষয় প্রত্নকাম মহাশয়দের বিচারে দিলাম। শাকটায়নও বৈশম্পায়নের নাম করিয়াছেন। "কঠাদিভ্যশ্চ গু বেদে" এই সূত্রের কঠ বৈশম্পায়নের শিষ্য বলিয়া বোধ হয়। আর পল্লবিত করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে ব্যাসদেব ও তাঁহার বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদি শাকটায়ন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। শাকটায়নের কাল নিরাকরণ করা কঠিন। তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পারাশর্য্যাদির পরবর্ত্তী এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় অন্ততঃ ৩০০০ বৎসরের প্রাচীন।

বঙ্কিমচন্দ্র মতে মহাভারতের কাল।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে দেখাইয়াছেন যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ ছান্দোগ্যোপনিষদেও আছে; যথা—

"অসিতঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী-পুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি"।

অনুবাদ—অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। তিনি পিপাসাশূন্যও হইলেন, তিনি অন্তিম কালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবেন তুমি অক্ষত হইতেছ, তুমি অচ্যুত হইতেছ; তুমি প্রাণসংশিত হইতেছ।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক। কিন্তু ইহা হইতে কাল নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা বাহুল্যভয়ে বিচারে নিরস্ত হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলের ৮৫।৮৬।৮৭ সূক্তের ও দশম মণ্ডলের ৪২।৪৩।৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণের সহিত বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত কৃষ্ণের ঐক্যস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা প্রৌঢ়িবাদমাত্র।

মহাভারতের কাল ও ঐতিহাসিকতা লইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, মহাভারতের কাল সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টজন্মের ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে ও উত্তরায়ণের ক্রান্তিপাত গণনা দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে তিনি এইরূপ পাঠ করিয়াছেন যে—

যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥

ইহার অর্থ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন পর্য্যন্ত এক সহস্র পঞ্চদশবর্ষ জানিবে।

নন্দগণ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল পুরাণে লেখা আছে। সুতরাং বঙ্কিম বাবু গণনা করিয়াছেন যে, পরীক্ষিতের জন্মের ১১১৫ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে রাজা হন তিনি ধরিয়াছেন। অতএব যুধিষ্ঠিরকে তিনি খৃষ্টের ৩১৫ + ১১১৫ = ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বের রাজা ধরিয়াছেন। উত্তরায়ণের ক্রান্তিপাত গণনা দ্বারাও তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ৪৪ অংশে ৪ কলা হইলে খৃষ্ট জন্মের ১২৬১ বৎসর পূর্ব্বে ও ৪৮ অংশ পুরা হইলে ১৫৩০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের উত্তরায়ণ হয়। এই গণনায় তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে ভীষ্মের সময় ১লা মাঘই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ মহাভারতে নাই। সুতরাং তাঁহার গণনা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পুরাণের যে প্রমাণ তিনি দিয়াছেন তাহাও অভ্রান্ত নহে। পুরাণাদিতে ভবিষ্য মগধবংশ সবিস্তর দেওয়া আছে। ঐ বংশাবলীতে নৃপতিগণের নামের অল্পবিস্তর অনৈক্য থাকিলেও সকল পুরাণেরই মত যে বার্হদ্রথ রাজগণ ১০০০ বৎসর, প্রদ্যোতগণ ১৩৮ বৎসর ও নাগগণ ৩৬২ বৎসর মোট ১৫০০ বৎসর সোমাপি হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত লাগে। বিষ্ণুপুরাণেও এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং সেই বিষ্ণুপুরাণ আবার কখনও বলিতে পারে না যে, সোমাপি হইতে মহানন্দী

পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর যায়। সহদেব মহাভারতযুদ্ধে নিপতিত হন। পরীক্ষিৎ মহাভারতযুদ্ধকালে গর্ভস্থ। অতএব পরীক্ষিতের জন্ম ও সহদেব পুত্র সোমাপির রাজ্যাভিষেক একই বৎসর হয়। সোমাপি হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত ১৫০০ বৎসর হইলে পরীক্ষিত জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন ১৫০০ বৎসর হইবে। সুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম এবং নন্দাভিষেক এতদুভয়ের ব্যবধানে বিষ্ণুপুরাণের মতে ১৫০০ বৎসর হওয়া উচিত। এজন্য বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোক বঙ্কিমবাবু তুলিয়াছেন তাহাতে নিশ্চয়ই কোন ভ্রম আছে। একটু প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে লিপিকর মহাশয় গোল বাধাইয়াছেন। "পঞ্চশতোত্তরম্" স্থলে তিনি পঞ্চদশোত্তরম্ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুও বার্হদ্রথ-বংশ, প্রদ্যোতবংশ ও নাগবংশের জন্মকাল সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে যাহা বলা হইয়াছে তাহা গণনা না করিয়া লিপিকর মহাশয়ের অনুসরণ করায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের মতে বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকের পাঠ এইরূপ হওয়া উচিত

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্॥

তাহা হইলে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন পর্য্যন্ত ১৫০০ বৎসর এই প্রারম্ভের উক্তির শেষের গণনার সহিত সামঞ্জস্য হয়।

মৎস্যপুরাণেও অনুরূপ-সংগ্রহ-শ্লোকে লিপিকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে, উহাতে যে পঞ্চাশদুত্তরম্ আছে তাহা পঞ্চশতোত্তরম্ হইবে। তাহা না হইলে মৎস্যপুরাণে বার্হদ্রথ বংশেরও পরবর্ত্তী দুই বংশের যে ১৫০০ বৎসর কাল দেওয়া হইয়াছে তাহাও মিলিবে না। বঙ্কিমবাবু মৎস্যপুরাণের পঞ্চাশদুত্তরম্ ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশোত্তরম্ মিলাইতে না পারিয়াই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কাল দুই পুরাণে দেওয়া হইয়াছে বলিয়াছেন।

রাজপুতকাহিনীর মত।

রাজপুতানার অম্বুবংশগ্রন্থাবলীমতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল ৫২৯০ বৎসর। রাজপুতানার রাজতরঙ্গিণীতে যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্র হইতে রাজপাল পর্য্যন্ত চারিটী শাখায় ৬৬ (ষট্‌ষষ্টি) জন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হন লেখা আছে। তাহাদের নামও ধারাবাহিকক্রমে দেওয়া আছে। পরীক্ষিৎ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ পুরুষ পুরাণেরই মতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নাম সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অনৈক্য থাকিলেও মোটের উপর সামঞ্জস্য আছে। ক্ষেমকই অর্জ্জুনের বংশের শেষ নৃপতি। পরে ইন্দ্রপ্রস্থসিংহাসন বিসার্য্যের বংশে যায়। তাঁহারা ১৪ (চতুর্দ্দশ) জন। তৎপরে মহারাজের বংশ ঐ সিংহাসন পান। এই তৃতীয় বংশে ১৫ (পঞ্চদশ) জনমাত্র রাজত্ব করেন। চতুর্থ বংশের আদি পুরুষ ভুধ্‌সেন। ইহাদের ৯ (নব) জনমাত্র রাজা হন। রাজপাল ইঁহাদের শেষ রাজা। রাজতরঙ্গিণীকার পরীক্ষিৎ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ১৮৬৪ বৎসর এবং বিসার্য্য-বংশের রাজ্যকাল ৫০০ বৎসর দিয়াছেন। পরীক্ষিৎ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত পুরাণে ১৫০০ বৎসর আছে। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীকারের কাল আমরা লইতে পারি না, যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত যে ১০০ জন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের

সিংহাসনে বসিয়াছিলেন সে বিষয় চৌহান প্রভৃতি বহু রাজপুত-জাতির বংশাবলি-গ্রন্থে প্রকাশ। ঐ ১০০ জনে ৪১৪০ বৎসর গত হইয়াছিল বলিয়া রাজপুত-ইতিহাসকারগণ লিখিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের সময় সম্বন্ধে গোল নাই। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরাদি ৪১০০+ ১২৯০=৫২৯০ বৎসরের প্রাচীন। অবশ্য এই গণনার সহিত কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণীর বা পুরাণের গণনার ঐক্য নাই। তাহা পরে দেখান হইয়াছে।

Todd সাহেবের মত।

Todd সাহেবের মতে যুধিষ্ঠিরের কাল ২২৫০+১২০০=৩৪৫০ বর্ষ। Todd সাহেব বিশ্বাস করেন যে যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ১০০ জন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি রাজপুত ইতিহাসকারগণের কাল অতিরঞ্জিত বিবেচনা করেন, কারণ তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষের রাজ্যকাল ৪০ বৎসর হিসাবে হয়, তাহা একরূপ অসম্ভব। তিনি মিবারের ৩৪ জন রাজার, মাড়োয়ারের ২৮ জন রাজার, অম্বরের ২৯ জন রাজার, যশল্মীরের ২৮ জন রাজার রাজ্যকাল পর্য্যালোচনা করিয়া গড়ে প্রতি পুরুষে ২২ বর্ষ করিয়া রাজ্যকাল পাওয়ায় যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ১০০ পুরুষে ২২৫০ বৎসর গড় ধরিয়াছেন। এই গণনা কাল্পনিক তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতেও যুধিষ্ঠির ৩৪৫০ বৎসরের প্রাচীন হন।

কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণীর মত।

কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণী-মতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল ৪৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে। কহ্লন মতে যুধিষ্ঠিরাদি কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে আবির্ভূত হন। এক্ষণে কলির ৫০১৩ অব্দ চলিতেছে, সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদি কহ্লন মতে ৫০১৩−৬৫৩=৪৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মেন। কহ্লনের ঐ কালগণনা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে আছে—

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভূবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ ৫১

লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রপরিবৎসরাঃ॥ ৫২

প্রায়স্তৃতীয় গোনর্দ্দাৎ আরভ্য শরদাং তদা।
দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ম্॥ ৫৩

বর্ষাণাং দ্বাদশশতী ষষ্টিঃ ষড়্‌ভিশ্চ সংযুতা।
ভূভুজাং কালসংখ্যায়াং তদ্ দ্বাপঞ্চাশতো মতা॥

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হন। সম্প্রতি শককালের ১০৭৪ বৎসর গত হইয়াছে, তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে যে দ্বিপঞ্চাশৎ নৃপতি হইয়াছেন তাঁহাদের কাল দুই সহস্র তিনশত ত্রিংশৎ এবং দ্বাদশ শত ষট্‌ষষ্টি অর্থাৎ মোট ৩৫৯৬ বৎসর। কহ্লন নিজ বয়স যে ১০৭৪ শক দিয়াছেন তাহা সকলেই বিশ্বাস করেন। এক্ষণে ১৮৩৩ শক, সুতরাং কহ্লনের পর ১৮৩৩—১০৭৪=৭৫৯ বৎসর চলিতেছে। কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণী যখন কাশ্মীরের ইতিহাস এবং যখন কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত নিয়মিতরূপে ধারাবাহিক রূপে লিখিত হইয়াছে, তখন কাশ্মীরের রাজবংশের কাল-নির্ণয় ঐ ইতিহাসে যাহা আছে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। সুতরাং তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে কহ্লনের কাল পর্য্যন্ত যে কাশ্মীরের সিংহাসনে ৫২ জন রাজা বসিয়াছিলেন এবং

তাঁহারা যে মোট ৩৫৯৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা কথা নহে। কহ্লনের পর ১৩৮ বৎসর গত হওয়ায় তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে ৩৫৯৬+১৩৮=৪৩৩৪ বর্ষ গত হইয়াছে বলিতেই হইবে। কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণীতে দেখিতে পাই যে ঐ গোনর্দ্দের পিতা দামোদর ও পিতামহ অপর এক গোনর্দ্দ ছিলেন। সেই দ্বিতীয় গোনর্দ্দই যুধিষ্ঠিরের সমকালীন বলিয়া ঐ ইতিহাসে প্রকাশ। দ্বিতীয় গোনর্দ্দ শক নরপতির ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন ঐ ইতিহাসে বলা আছে। সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বের ২৫২৬+১৮৩৩=৪৩৫৯ বৎসর পূর্ব্বে পড়ে। ইহার সহিত তৃতীয় গোনর্দ্দের কালের কোন অনৈক্য নাই। সুতরাং প্রথম গোনর্দ্দ ৪৩৫৮ বর্ষ পূর্ব্বের লোক বলিতে পারি। যুধিষ্ঠির তাঁহার সমসাময়িক, কাশ্মীরের এই প্রবাদ সত্য হইলে যুধিষ্ঠিরও ৪৩৫৯ বৎসর পূর্ব্বের ব্যক্তি। বর্ত্তমানে কলির ৫০১২ বৎসর গত হইয়াছে বলিতেই হইবে। তাহা হইলে ৫০১২—৪৩৫৯ অর্থাৎ ৬৫৩ বৎসর কলির গত হইলে যুধিষ্ঠিরাদি হন বুঝিতে পারি। তাই কহ্লন যুধিষ্ঠিরাদি কলির ৬৫৩ বৎসর পরে হন বলিয়াছেন। এই গণনায় জ্যোতির্ব্বিদগণেরও সংবাদ আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা দেখান হইল না। মহাভারত যুধিষ্ঠিরের সময় প্রচারিত না হইলেও জনমেজয়ের সময় প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনমেজয়ের দানপত্র হইতে জানা যায় যে জনমেজয় ৮৯ যুধিষ্ঠিরাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মহাভারত-প্রচারের কাল কাশ্মীর-তরঙ্গিণী মতে ৪৩০০ বৎসর বলিতে পারি।

পুরাণমতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল।

এক্ষণে পুরাণমতে যুধিষ্ঠিরাদি কাল কত হয় দেখা যাউক। পরীক্ষিতের বংশাবলী বিষ্ণু-পুরাণে এইরূপ দেওয়া আছে।

১ম। পরীক্ষিৎ
২। জনমেজয় — শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন
৩। শতানীক
৪। অশ্বমেধদত্ত
৫। অধিসীম কৃষ্ণ
৬। নিচক্ষু
৭। উষ্ণ
৮। চিত্ররথ
৯। শুচিরথ
১০। বৃষ্ণিমান্
১১। সুষেণ
১২। সুনীথ
১৩। ঋচ
১৪। নৃচক্ষু
১৫। সুখাবল
১৬। পরিপ্লব
১৭। সুনয়
১৮। মেধাবী
১৯। নৃপঞ্জয়
২০। মৃদু
২১। তিগ্ম

২২। বৃহৎক্রম
২৩। বসুদান
২৪। শতানীক
২৫। উদয়ন
২৬। মহীনর
২৭। দণ্ডপাণি
২৮। নিরমিত্র
২৯। ক্ষেমক

বিষ্ণুপুরাণে মগধবংশ

বিষ্ণুপুরাণে মগধবংশ এইরূপ দেওয়া আছে।

১। জরাসন্ধ
২। সহদেব
৩। সোমাপি
৪। শ্রুতবান্
৫। অযুতায়ু
৬। নিরমিত্র
৭। সুক্ষত্র
৮। বৃহৎকর্ম্মা
৯। সেনাজিৎ
১০। শ্রুতঞ্জয়
১১। বিপ্র
১২। শুচি
১৩। ক্ষেম্য
১৪। সুব্রত
১৫। সুধর্ম
১৬। দৃঢ়সেন
১৭। সুমতি
১৮। সুবল
১৯। সুনীত
২০। সত্যজিৎ
২১। বিশ্বজিৎ
২২। রিপুঞ্জয়

এই বংশাবলীর নাম সম্বন্ধে পুরাণগুলির মধ্যে কিছু অনৈক্য এবং ইহাদের সংখ্যা সংগ্রহশ্লোকে ৩২ জন থাকিলেও সকল পুরাণের মত যে, সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বার্হদ্রথ নৃপগণ মোট ১০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু ও মৎস্য পুরাণে আবার উহাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল দেওয়া আছে। ঐ রাজ্যকাল ঠিক দিলে ৮৪২ বৎসর হয় বটে। কিন্তু সংগ্রহশ্লোকে ১০০০ বৎসর থাকায় নিশ্চয়ই ১২ জন রাজার নাম ও রাজ্যকাল লিপিকর-প্রমাদে বর্ত্তমান পুরাণাদির সংস্করণে লুপ্ত হইয়াছে। মোট বার্হদ্রথ নৃপগণের ১০০০ বৎসর রাজ্যকাল অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

রিপুঞ্জয়ের পর মগধ-সিংহাসন লোভী অমাত্য বা সেনাপতির ক্রীড়ার পুত্তলি হয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত যে রিপুঞ্জয়ের সুনীক নামক অমাত্য স্বামীকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোৎকে সিংহাসনে বসান। প্রদ্যোতের বংশ এইরূপ দেওয়া আছে।

২৩। প্রদ্যোৎ
২৪। পালক
২৫। বিশাখযূপ

২৬। ক্ষনক
|
২৭। নন্দীবৰ্দ্ধন

মৎসপুরাণে প্রদ্যোৎ নামের পরিবর্ত্তে পুলক এবং পালক নামের পরিবর্ত্তে বালক দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বপুরাণেরই মত যে রিপুঞ্জয়ের অমাত্যের বংশ পাঁচ পুরুষ মাত্র ও তাহা ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করে। তৎপরে মগধসিংহাসন মন্ত্রী শিশুনাগের হস্তগত হয়। তাহার বংশই নাগবংশ নামে বিখ্যাত।

নাগবংশ।

২৮। শিশুনাগ
|
২৯। কাকবর্ণ
|
৩০। ক্ষেমধর্ম্মা
|
৩১। ক্ষত্রোজা
|
৩২। বিম্বিসার
|
৩৩। অজাতশত্রু
|
৩৪। দুর্ভক
|
৩৫। উদায়াশ্ব
|
৩৬। নন্দীবৰ্দ্ধন
|
৩৭। মহানন্দী

সর্ব্বপুরাণেরই মত যে নাগবংশ ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করে। ইহাদের মধ্যে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহাদের নাম আছে, শাক্যসিংহের সহিত তাঁহাদের মিলন হয়। এই কারণ ভারতবর্ষের নব্যতম ইতিহাস লেখক Vincent Smith তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং খৃষ্টজন্মের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে বিবেচ্য যে পুরাণের ভবিষ্য মগধবংশাবলীর শেষ অংশ যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাংশ উপকথা মাত্র বলা কি সঙ্গত?

বিম্বিসারের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ জন্মান নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয় নাই, ভারতে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ছিল না; সুতরাং হিন্দুর গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন জাতির গ্রন্থে বিম্বিসারের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার উল্লেখ থাকা সম্ভব নহে। হিন্দুজাতির প্রমাণ মাত্রেই দুষ্ট ও অবিশ্বাস্য এইরূপ ধারণা লইয়া হিন্দুর ইতিহাস বিচার করা যুক্তিযুক্ত নহে। নিজের বংশাবলী নিজে যত জানিবে পরে তত জানিতে পারে না। যখন আমার বংশের সহিত অপর বংশের কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখনই সেই সম্বন্ধী মহাশয় মদীয় বংশের কতক অংশ মাত্র জানিতে পারেন। যদি তাঁহার প্রমাণ ব্যতিরেকে আমার কথার উপর নির্ভর না করিয়া আমার বংশাবলী বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে মহাশয়দের বিশ্বাস ধন্য এই কথা বলিব। অতএব প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশাবলী সংস্কৃত প্রাচীন পুরাণাদি হইতেই বিশ্বাস করা উচিত। পুরাণে দেখিতে পাই যে মহানন্দীর শূদ্রাপত্নীতে মহাপদ্মানন্দ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে, তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়ান্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনিই ইক্ষাকুবংশ, পৌরব-বংশ, হৈহয়-বংশ, পাঞ্চাল-বংশ, কাশেয় বংশ কালিঙ্গ-বংশ প্রভৃতি নিখিল ক্ষত্রিয় বংশধরগণকে পরাভূত করিয়া একচ্ছত্র রাজাধিরাজ হন। তাঁহার হস্তেই অর্জ্জুনের শেষ বংশধর ক্ষেমক নিধন প্রাপ্ত হন। মৎস্য-পুরাণে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

এতৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যন্তি যাবৎ কলিনৃপাঃপরে।
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্বেহ্যেতে মহীক্ষিতঃ॥
চতুর্ব্বিংশৎ তথৈক্ষ্বাকাঃ পাঞ্চালাঃ সপ্তবিংশতিঃ
কাশেয়াস্ত চতুস্ত্রিংশৎ অষ্টাবিংশত্তু হৈহয়াঃ॥
কালিঙ্গাশ্চৈব দ্বাত্রিংশৎ অশ্মকা পঞ্চবিংশতি।
কুরবশ্চাপি ষড় বিংশৎ অষ্টাবিংশত্তু মৈথিলাঃ।
শুরসেনাস্ত্রয়োবিংশৎ বীতহোত্রাশ্চ বিংশতি
এতে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি এককালং মহীক্ষিতঃ॥
মহানন্দীসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ।
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকে নৃপঃ
অতঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট স মহাপদ্ম একচ্ছত্রে ভবিষ্যতি।

মহানন্দী ও মহাপদ্ম ৮০ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাপদ্মের অষ্টপুত্র ১২ বৎসর রাজ্য করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যচাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত মহাপদ্মের মুরা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া তিনি মৌর্য্য। তাঁহার বংশ মৌর্য্যবংশ নামে বিদিত।

নন্দবংশ।

৩৮। মহাপদ্ম
৩৯—৪৬। সুমাত্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র।

মৌর্য্যবংশ।

৪৭। চন্দ্রগুপ্ত
৪৮। বিন্দুসার
৪৯। অশোকবর্দ্ধন
৫০। সুযশা
৫১। দশরথ
৫২। অজ্ঞাত
৫৩। শালিশুক
৫৪। সোমশর্ম্মা
৫৫। শতধন্বা
৫৬। অণুবৃহদ্রথ

মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে পুরাণ মিথ্যা লিখিয়াছেন বলিতে পারেন না। দশজন মৌর্য্য পুরাণমতে ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। গ্রীক্ ইতিহাস হইতে মৌর্য্যবংশের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। অণুবৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজমুকুট লন। ইহার বংশই পুরাণে শুঙ্গবংশ নামে বিখ্যাত।

শুঙ্গবংশ —

৫৭। পুষ্পমিত্র
৫৮। অগ্নিমিত্র
৫৯। সুজ্যেষ্ঠ
৬০। বসুমিত্র
৬১। আদ্রক
৬২। পুলিন্দক
৬৩। ক্ষেমবসু
৬৪। বজ্রমিত্র
৬৫। ভাগবত
৬৬। দেবভূতি

পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রই কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক। তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুষ্পমিত্রের মুদ্রাও আবিষ্কৃত, সুতরাং শুঙ্গবংশ সম্বন্ধে পুরাণ উপকথা লেখেন নাই। দেবভূতির অমাত্য বসুদেব নামক কণ্বংশীয় ব্রাহ্মণ স্বামীকে হত্যা করিয়া মগধসিংহাসনে অরোহণ করেন। তাঁহার বংশ

কণ্ববংশ।

৬৭। কণ্ব
৬৮। ভূমিমিত্র

৬৯। নারায়ণ

৭০। সুশর্ম্মা

এই চারিজন কাণ্বায়ন ৪৫ বৎসর মাত্র রাজ্য করেন, ইঁহাদের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। উহাদের পর ৩০ জন অন্ধ্রবংশীয় রাজা মগধ-সিংহাসনে অধিকৃত হন। তাঁহাদের রাজ্যকাল ১০৪ বৎসর। সুতরাং জরাসন্ধ হইতে ১০০ জন রাজার ইতিহাস ধারাবাহিকক্রমে পুরাণে দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৯ জন সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, গ্রীক ইতিহাস ও মুদ্রাদি-পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা ঐতিহাসিক হইয়াছেন। এক্ষণে বিবেচনা করুন যে, অবশিষ্ট ৩১ জন সম্বন্ধে পুরাণের মিথ্যা কথা লেখা সম্ভাবনা আছে কি না। উহাদের কোন পরিপোষক প্রমাণ নাই বলিয়া উহাদের অবিশ্বাস করা উচিত নহে। উহারা বিশ্বস্ত হইলে সহদেব ও জরাসন্ধ সত্য জীব হন এবং তাঁহাদের সমসাময়িক যুধিষ্ঠিরাদিও কবির কল্পনা মাত্র হন না। পুরাণমতে রাজ্যকাল গণনা করিলে সহদেব-সুত সোমাপী হইতে নন্দ পর্য্যন্ত ১৫০০ বৎসর অতীত হয়—

বার্হদ্রথ। ১০০০ বৎসর
|
প্রদ্যোৎ। ১৩৮ „
|
নাগ। ৩৬২ „
১৫০০
নবনন্দ। ১০০
১৬০০

সুতরাং সোমাপী হইতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ১৬০০ বৎসর হয়, চন্দ্রগুপ্তের কাল খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ৩২৭ বলিয়া স্থিরীকৃত, অতএব সোমাপী ১৯১২ + ৩২৭ + ১৬০০ = ৩৮৩৯ বৎসরের পূর্ব্বের রাজা হন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক, সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদি ৩৯০০ বৎসরের প্রাচীন বলিতে পারা যায়। মহাভারত জনমেজয়ের সময় প্রচারিত সুতরাং মহাভারত ৩৮০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ বটে, আমরা পুরাণের বচনই সমীচিন মনে করি, কারণ ইহাতে বংশাবলী ও সময় বিশদরূপে দেওয়া আছে। অলমতি বিস্তারেণ—

ব্যাসদেবঃ প্রসীদতু

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎপলা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রকিরণে অগ্নি

পরদিন প্রাতে প্রমীত স্ত্রীকে বলিলেন;—"আজ বড় প্রয়োজন পড়িয়াছে, পাঁচ শত মুদ্রা চাই।"

উৎপলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন;—"তোমার চক্ষু লাল, শুষ্ক মুখ—রাত্রিতে তোমার ভাল নিদ্রাও হয় নাই, সারা রাত ছট্‌ফট্ করিয়াছ, কত কি বলিয়াছ—"

"কি বলিয়াছি?"

"অর্থশূন্য হিজিবিজি !—'সভিক,' 'সুরা,' 'নারীচরিত্র'—আরও কত কি !"

"আমার ত কিছুই মনে নাই।"

"কোন অসুখ করে নাই ত ?"

"বিশেষ অসুখ কিছুই না। পথ হাঁটিয়া শরীরটা যেন কেমন হইয়াছিল, সেই জন্য রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় নাই; এখন ত ভালই আছি।"

"আজ আর বেশি হাঁটাহাঁটি করিও না। —কত চাই বলিলে ?"

"পাঁচ শত।"

উৎপলা অন্য কক্ষে গেলেন। প্রমীত গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া মুকুরে নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইলেন। রক্ত চক্ষু, শুষ্ক রুক্ষ মুখ,—কেন ? স্বপ্নে কথা! 'সুরা,' 'নারীচরিত্র,'—আর ত কিছু নয় ?

উৎপলা মুদ্রাপূর্ণ একটী থলি আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, বলিলেন ;—

"এত সকালে এমন কি প্রয়োজন ?"

প্রমীত তখন পূর্ব্ব দিন যে নিজে প্রতিভূ হইয়া সোমদত্তকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন ;—

"সভিকের নিকট এখনি পাঠাইতে হইবে।"

উৎপলা বিহ্বলের ন্যায় ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে হঠাৎ আবেগের সহিত বলিলেন ;—

"আহা ! তোমাকে ত বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ! মঞ্জুলার সঙ্গে না কি সোমদত্ত মহাশয়ের বিবাহ !"

প্রমীতের হাত হইতে মুদ্রার থলি ঝনাৎ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্যস্ত সমস্তে প্রমীত তাহা তুলিলেন, বলিলেন ;—

"কি ?"

"কাল অমন ক্লান্ত হইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়াছিলে, আমি কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মঞ্জুলার সঙ্গে না কি সোমদত্তের বিবাহ ?"

"কোথায় শুনিলে ?"

"অনেকেই না কি শুনিয়াছে মাধবী আমাকে বলিয়াছে।"

"কি বলিয়াছে ?"

"সোমদত্ত মঞ্জুলার মাতার কাছে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, মাতাও প্রায় স্বীকৃত।"

"এদিকে ঋণদায়ে সোমদত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেছিল !—সে দ্যূতকারী, মদ্যপানে সারাদিন মত্ত সর্ব্বদা কুসংসর্গে তাহার বাস !"

"বল কি ! এমন লোকের সঙ্গে মঞ্জুলার বিবাহ ! এমন বিবাহ তুমি হইতে দিবে ?"

"আমি কি করিব ? আমি বারণ করিবার কে ?"

"মঞ্জুলা আমাদের হিতকারিণী সুহৃৎ। যে দিন তাহাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই তাহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন ত সে আমাকে স্নেহপাশে বাঁধিয়াছে। সে আমার সুহৃদ, সখী, ছোট ভগ্নী !"

প্রমীত স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উৎপলা বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা শিক্ষিতা ; কিন্তু আমি দেখিয়াছি, সংসারীর অভিজ্ঞতা তাহার নাই। মাতার কথায় সে স্বীকৃত হইবে, শেষে আজীবন মনস্তাপে দগ্ধ হইবে। তুমি দেখ, তাহাকে রক্ষা কর। এমন রত্ন অমন মানুষের হাতে পড়িবে ?"

কম্পিত কণ্ঠে প্রমীত বলিলেন ;—

"আমার চেষ্টা করা কি ভাল? আমি কে? মঞ্জুলার মাতা বা মঞ্জুলা আমার কথা শুনিবে?"

"মঞ্জুলা নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখিবে।"

"তুমি কিসে বুঝিলে?"

"স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মন বুঝে। মঞ্জুলা তোমার কথা শুনিবে, তোমার কথায় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস। একবার দেখ।"

"তুমি বলিতেছ, দেখিব।"

স্ত্রীর নিকট বিদায় হইয়া প্রমীত বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন; বাদলকে দিয়া টাকার থলি সভিকের নিকট পাঠাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

উৎপলা আশ্বস্ত হইয়া গৃহকার্য্যে মন দিলেন।

মানুষ নিজ হাতে নিজের পায়ের বেড়ি গড়িয়া পিটিয়া প্রস্তুত করে, দোষ দেয় পরের —বিধাতার! বন-জঙ্গল হইতে মালাভ্রমে সুন্দর সর্পশিশু আঁচলে করিয়া ঘরে আনে, শেষে তাহার বিষের জ্বালায় পুড়িয়া মরে! বিধাতা মানুষকে ভবিষ্যৎ জ্ঞান দেন নাই, তাই মানুষ সুখী।

এদিকে প্রমীত সেন ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মঞ্জুলাকে বাঁচাইতে হইবে? আমাকেই চেষ্টা করিতে হইবে! মঞ্জুলা আমার কথা শুনিবে?—উৎপলা বলিলেন, নিশ্চয় শুনিবে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মন বুঝে! উৎপলা কি বুঝিয়াছেন? মঞ্জুলাকে বাচাইতে যাইয়া নিজে মরিব, উৎপলাকে মারিব? মানুষ বিপদ দেখিলে সতর্ক হয়, সরিয়া পড়ে; আমি জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হইব? পতঙ্গ ত উড়িয়া গিয়া আগুনে পড়ে! উৎপল! উৎপল!—

প্রমীত অন্যমনস্কে চলিতেছিলেন, পথের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। অনেক দূর হাঁটিয়া দেখিতে পাইলেন, কমলপুর আসিয়াছেন, নিকটেই মঞ্জুলার গৃহ। প্রমীত থামিলেন। যাইব? মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিব? তাহাকে কি বলিব?—সোমদত্ত ভাল লোক নহে, সে সুরাপায়ী ঋণগ্রস্ত স্বার্থপর? মঞ্জুলা যদি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে? নারীচরিত্র ত চিরকাল দুজ্ঞেয়! প্রমীতের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাই কি? তবে আমার প্রতিবাদে মঞ্জুলা বিরক্ত হইবে না? আর সোমদত্তের কথা যদি তাহার মনেই স্থান না পাইয়া থাকে, তবে আমি আগে থাকিতেই বিনা কারণে কেন তাহার নিন্দা-চর্চ্চা করিতে যাই? মঞ্জুলা কি মনে করিবে? আমার কেন এ অযাচিত অনধিকার-চর্চ্চা? মঞ্জুলা ত আমার কেহ নহে!—কেহ নহে!

প্রমীত চলিতে চলিতে মঞ্জুলার বহির্দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুরীর মধ্য হইতে মঞ্জুলার দাসী চঞ্চলা বাহিরে আসিতেছিল, প্রমীত সেনকে দেখিয়া বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল ;—

"ভিতরে আসিবেন কি?"

প্রমীত চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন ;—

"না; অনেক দূর যাইতেছি, আর একদিন আসিব।"

প্রমীত অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলিলেন। চঞ্চলা কিছু বিস্মিত হইল। এরূপ কেন? হঠাৎ চমকিয়া উঠা কেন?

চঞ্চলা আর একবার গমনশীল প্রমীতের দিকে চাহিল; দেখিল, প্রমীত সেন থামিলেন, মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকেই চাহিলেন, থতমত খাইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে চলিলেন। চঞ্চলা হাসিল, ভাবিল—মল্লিকা মালতী কি ইঁহার অঙ্গও দগ্ধ করে!

চঞ্চলা তখন বাহিরে যাওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিয়া মঞ্জুলাকে বলিল ;—

"ওগো, প্রমীত সেন মহাশয় বোধ হয় আমাদের এখানেই আসিতেছিলেন——'

"কৈ তিনি ?" মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"—আসিতেছিলেন। আমি বাহিরে যাইতেছিলাম, দ্বারের সম্মুখেই দেখা হইল। বলিলাম, 'আসুন'! তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'অনেক দূর যাইতে হইবে, আর একদিন আসিব' বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

"দূর অভাগা! তোর কথায় আমিও চমকিয়া উঠিয়াছি!"

চঞ্চলা ভাবিল, চাঁদের কিরণ চারিদিকেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পৌত্তলিক মহোৎসব

তখন বেলা মধ্যাহ্ন। প্রমীত অসঙ্গ সেনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অসঙ্গ আহারে যাইবেন, এমন সময় শুষ্কমুখ রুক্ষকেশ অস্নাত শ্রান্ত প্রমীতকে দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইলেন, বলিলেন ;—

"এস, এস; এমন অসময়ে কেন ?"

প্রমীত কোন উত্তর না দিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। অসঙ্গ বলিলেন ;—

"কি হইয়াছে? উৎপলা ভাল আছেন ত ?"

"ভালই আছেন।"

"তোমার কি হইয়াছে ?"

"কিছুই না।"

"তবে তোমার এমন ভাব কেন ? সমস্ত শরীরে ধূলা, স্নান কর নাই। কোথায় গিয়াছিলে ?"

"তোমার এখানেই ত আসিলাম।"

অসঙ্গ ভৃত্যকে ডাকিলেন, প্রমীতের স্নানের উদ্যোগ করিতে হইবে। বলিলেন ;—

"ব্যাপারটা কি ?"

প্রমীত ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;

"তুমি কি মঞ্জুলার কাছে যাইবে ?"

"সে কথা ভুলিতে পার নাই ? একেবারে অধীর হইলে যে!"

"দেখ, কাল তোমাতে আমাতে সোমদত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি নাই।"

"কি কথা ?"

"তাহার যে বহু ঋণ, তাহার এক প্রমাণ আমি গত কল্যই পাইয়াছিলাম।"

"কি প্রকার ?"

পাটলীর পথে যে ভাবে সোমদত্তের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, সভিকের হাত হইতে যেরূপে তিনি তাহাকে মুক্ত করেন, প্রমীত তাহা অসঙ্গকে বলিলেন। অসঙ্গ বলিলেন ;—

"এ ত তার পণের ঋণ, এ ছাড়া তার আরও ঋণ আছে।"

"সভিকের নিকট সেই টাকা পাঠাইতে হইবে বলিয়া উৎপলার কাছে আজ প্রাতে

টাকা চাহিলাম, হেতুও বলিলাম। উৎপলা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।"

"কি বলিলেন ?"

"দেখ, জনরব মিথ্যা নয়। সোমদত্ত যে মঞ্জুলাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, উৎপলাও তাহা শুনিয়াছেন।"

"বটে ?"

"উৎপলা মাধবীর নিকট শুনিয়াছেন।"

"তোমাকে কি বলিলেন ?"

"বলিলেন, মঞ্জুলা এমন অপাত্রের হাতে পড়িবে ? উৎপলার ইচ্ছা, এ বিবাহ যেন কোন মতে না হয়——আমি যাইয়া মঞ্জুলাকে বারণ করি !"

"তাই কি তুমি কমলপুর গিয়াছিলে ?"

"আমি !—তোমাকে যাইতে হইবে। আমি ত কালই তোমাকে বলিয়াছি।"

"তুমি গেলেই ত ভাল হয়। উপকারী সুহৃদের নিঃস্বার্থ সৎপরামর্শ, মঞ্জুলা তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে।"

অসঙ্গের সন্দেহ যায় নাই, তাই তিনি পুনরায় এ ঢিল ছুড়িলেন। প্রমীত বলিলেন ;

"উৎপলাও তাহাই বলিয়াছেন, আমার কথা মঞ্জুলা রাখিবে ; স্ত্রীলোকেই না কি স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে পারে।"

"তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। মঞ্জুলা তোমাকে অকপট সুহৃদ বলিয়া জানে, তোমাকে শ্রদ্ধা করে ; তোমার কথা অবশ্যই রাখিবে।"

"দেখ, আমি কমলপুরে গিয়াছিলাম।"

"মঞ্জুলার দেখা পাও নাই ?"

"তাহার গৃহে যাই নাই।"

"কমলপুরে গেলে, মঞ্জুলার গৃহে যাও নাই ! কেন ?"

"কেন যে যাই নাই, একদিন বলিব।"

অসঙ্গের বিস্ময় বৃদ্ধি হইল। ব্যাপারটা কি ? মঞ্জুলার গৃহে যাইতে ইচ্ছা নাই ! কেন ?—কোন অনুদার সন্দেহ উৎপলার মনে স্থান পাইয়াছে ?—না। উৎপলা নিজেই ত প্রমীতকে মঞ্জুলার নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন ! আত্মচিত্তে প্রমীতের বিশ্বাস হীনবল হইয়াছে ? তবে দূরে দূরে থাকাই ত ভাল। সোমদত্ত যদি মঞ্জুলাকে বিবাহ করে, তবে সকল আশঙ্কা দূর হয়। কিন্তু অমন রত্ন সোমদত্তের হাতে পড়িবে ?

প্রমীত বলিলেন ;—

"কি ভাবিতেছ—কেন ইতস্ততঃ করিতেছ ?"

"কেন ইতস্ততঃ করিতেছি, এক দিন বলিব।"

দুই বন্ধুই বুঝিতে পারিলেন, পরস্পর পরস্পরের নিকট মনের ভাব গোপন করিতেছেন। কেহই মুখ ফুটিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলেন না। সাহসী অন্তঃকরণও অবস্থা-বিশেষে ভীরু হইয়া পড়ে। প্রমীত ভাবিলেন, আত্মরক্ষা করিতে পারিব, কেন আর অসঙ্গের নিকট এই ক্ষণিক চাঞ্চল্যের পরিচয় দিব ? অসঙ্গ ভাবিলেন, শুধু সন্দেহ করিয়া কেন প্রমীতকে লজ্জিত করিব ? ক্ষণকাল দুই জনেই নীরব রহিলেন। শেষে অসঙ্গ বলিলেন ;—

"দেখ, তাড়াতাড়ি কিছু করিয়া কাজ নাই। সোমদত্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে কি না ঠিক জানি না। মঞ্জুলার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, মঞ্জুলা কখনো সোমদত্তের প্রস্তাবে স্বীকৃত

হইবে না। কন্যার অমতে অলোকা ঠাকুরাণী তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে সাহস করিবেন না। বিশেষতঃ রাজ্ঞী কারুবকীর অনুমতি না পাইলে তিনি কখনো এ সম্বন্ধে অগ্রসর হইবেন না। রাজাধিরাজ অতি শীঘ্রই যুদ্ধযাত্রা করিবেন; নগরে রাজ্যে প্রতিগৃহে বিপুল উৎসাহ উদ্যোগ, বিষম উদ্বেগ চিন্তা; এ সময় এ কথা লইয়া আন্দোলন না করাই ভাল। রাজাধিরাজ চলিয়া গেলে এক দিন অলোকা ঠাকুরাণীকে অবস্থা জানাইব।"

"বিলম্বে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না ?"

"না।"

"তবে এ কয় দিন থাক্।"

"হাঁ তাহাই ভাল।—এখন স্নান কর।"

"না, আমি এখনি যাইব।"

"পাগল তুমি। এত বেলায় অস্নাত অভুক্ত তুমি চলিয়া যাইবে ? বধূ কি মনে করিবেন ? সেবারও তুমি তাঁহাকে নিরাশ করিয়া গিয়াছিলে!"

অগত্যা প্রমীতকে স্বীকার করিতে হইল। স্নানাহার শেষে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বেলা অপরাহ্নে প্রমীত স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন ;—

"দেখিও, বেশী বিলম্ব করিও না।"

অসঙ্গ হাসিলেন, বলিলেন ;—

"তুমি চিন্তা করিও না। অনেক দিন হইল মঞ্জুলার গীত শুনি নাই, দু'জনেই এক দিন যাইব।"

"আমি আর কেন ?"

"আমি বলিব, তুমি সাক্ষ্য দিবে!"

প্রমীত চলিয়া গেলে অসঙ্গ অন্তঃপুরে যাইয়া পত্নী সংযুক্তাকে বলিলেন ;—

"ওগো, সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়!"

সংযুক্তা পান সাজিয়া বাটায় পুরিতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন ;—

"ব্যাপারটা কি ? আমার সাত রাজার ধন, সঙ্গীহীন মাণিকের প্রতি কি প্রেত-পিশাচীর দৃষ্টি পড়িয়াছে ?"

"সঙ্গীহীন নই, তুমি নিত্য সংযুক্তা!—দেবী দানবী, গন্ধর্ব্বী পিশাচী কেহ এ মণি স্পর্শও করিতে পারিবে না। শুধু দূর হইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে।"

সংযুক্তা হর্ষকুঞ্চিত নেত্রে শুভ্র দশনপ্রান্তে রক্তাধর ঈষৎ পীড়িত করিয়া একটি সজ্জিত পান স্বামীর মুখে দিলেন, বলিলেন ;—

"তবে সংসার নিপাত যাক্।—কি হইয়াছে ?

"তোমার দিদির অতি যত্নের পোষাপাখী উড়ু উড়ু হইয়াছে।"

"দিদি—উৎপলার ?"

"হাঁ।"

"তাঁহার অতি যত্নের পোষাপাখী ত প্রমীত সেন মহাশয়! তুমি কি বলিতেছ ?"

অসঙ্গ তখন পালঙ্কে বসিয়া পড়িলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সংযুক্তার হস্ত ধারণ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

"আমার সন্দেহ হইতেছে, প্রমীত সেন মজিয়াছে।"

"তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু দিদি যে তাঁহার চোখের মণি! দিদির অপেক্ষা—দিদির মত রূপবতী যে সংসারে আর কেহ নাই!"

"এই গর্ব্বই ত প্রমীতসেনের কাল হইয়াছে, তুমি মঞ্জুলাকে দেখিয়াছ, কেমন রূপবতী ?"

"মঞ্জুলাও পরম রূপবতী।"

"প্রমীতসেনের চক্ষে বোধ হয় সে-ই অধিক রূপবতী।"

"তোমার চোখে ?"

"আমার চোখে ? আমার চোখ ত মন্ত্রবশ। আমার গৃহের বাহিরে যে কেহ—স্বর্গের অপ্সরাও যে আমার চোখে কালো কুৎসিত।"

সংযুক্তা স্বামীর বাহুমূল নখাঘাতে পীড়িত করিয়া স্মিত প্রভাসিত মুখে বলিলেন ;—

"চাটুবাক্যে তোমরা চির বিশারদ, আমরা অবোধ, তাই মুগ্ধ হইয়া থাকি।"

"নিজের প্রাপ্য কড়াক্রান্তির গণনায় কোন স্ত্রীলোক ভুল করে না।"

সংযুক্তা হাসিয়া স্বামীর পার্শ্বে পালঙ্কে বসিলেন, বলিলেন,—

"প্রমীতসেন মহাশয়কে তোমরাই এতকাল স্ত্রীর অতি বশীভূত—স্ত্রৈণ বলিয়া আসিয়াছ, এখন এ বিরূপ ?"

"বন্ধনের অতি কসাকসিতে দড়ি ছিঁড়িয়া যায়।"

"এও কি তাই হইয়াছে ?"

"হইয়াছে, ঠিক বলিতে পারি না ; তবে অতি সন্দেহের বিষয় বটে।"

"তোমার ভুল। প্রমীতসেন মহাশয় অমন ভাল লোক, আর উৎপলা ত দেবী ! যাহাতে এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, মঞ্জুলা এমন অপাত্রে না পড়ে, তাহার জন্য দিদিরই ত এত আগ্রহ। আর, প্রমীতসেন মহাশয় অতি স্নেহ-বশতঃই মঞ্জুলাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু স্নেহ শেষে লোভে, প্রণয়ে না গড়ায়।"

"তুমি—"

সংযুক্তা যেন কি বলিতেছিলেন, এমন সময় দাসী একবৎসরের শিশুপুত্র বিজয়কে কোলে করিয়া সে ঘরে আনিল। সংযুক্তার মাতৃহৃদয় উথলিয়া উঠিল, হাসিময় কচিমুখ দেখিয়া সংযুক্তা সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। তখন কোথায় বা উৎপলা, প্রমীতসেন—কোথায় বা মঞ্জুলা ! সর্ব্বচিন্তাপহারী, চির আনন্দের উৎস সেই সোণার পুতুল লইয়া স্বামীস্ত্রী মহোৎসব-ঘটায় হৃদয় ঢালিয়া দিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(পৌষের বঙ্গদর্শনের ৬৮৭ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—শাস্ত্রপ্রামাণ্য

প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ বা আগম—হিন্দুর ন্যায় বা প্রমাণ শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রামাণ্যের উপরেই মানবের যাবতীয় জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অর্থে এখানে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বোঝায়। আর আমাদের যাবতীয় অনুমান-উপমানাদি এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা আপাততঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অথচ অবস্থান্তর ঘটিলে ইন্দ্রিয়ের

দ্বারাই যার জ্ঞানলাভ হইতে পারে, কেবল তাহাই অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে যাহা বর্ত্তমানে উপস্থিত নাই, অথচ যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অনুমান কেবল এমন বিষয়েরই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে; যাহা আদৌ ইন্দ্রিয়াতীত, অনুমান বা উপমান তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ-ত্রয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়েই, যাব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইয়াছে কিংবা হওয়া সম্ভব বলিয়া নিজের পূর্ব্বতন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা অপরের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতে জানি, কেবল তাহারই জ্ঞান দান করিতে পারে। যাহা একান্ত ইন্দ্রিয়াতীত, তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয় দিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কিম্বা অনুমান উপমান প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এইজন্যই শব্দ বা আগমের প্রয়োজন। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষে তো নাই; প্রত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠিত অনুমান-উপমানেতেও নাই। তার একমাত্র প্রামাণ্য আগম বা শব্দ। অতীন্দ্রিয় কোনও কিছু আছে, ইহা স্বীকার করিলেই শব্দ-প্রমাণও মানিয়া লইতে হয়।

কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া, পাশ্চাত্য যুক্তি-বাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া, আমরা একদিন এই শব্দ-প্রমাণবস্তুটা যে কি, ইহা ধরিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া, শাস্ত্রপ্রামাণ্য একান্ত ভাবেই বর্জ্জন করিয়াছিলাম। দোষ যে কেবল নূতন শিক্ষারই ছিল, তাহাও নহে। প্রাচীন পন্থাবলম্বীদিগের নিকটও তখন আমরা এই শব্দ-প্রামাণ্যের কোনও সদর্থ প্রাপ্ত হই নাই। শব্দ বলিতে আমরা তখন বেদাদি গ্রন্থই বুঝিতাম। এই বেদ যে সেই বেদ নহে, এই শব্দ যে সেই শব্দ নহে, গতানুগতিক ধর্ম্মে সে জ্ঞান তখন একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। বেদ বলিতে ঋগ্বেদাদি শ্রুতি-চতুষ্টয়কেই লোকে বুঝিত। আর এই বেদ যে স্বতঃপ্রামাণ্য নহে, এগুলি যে বেদাঃ—বহুবচন, বেদঃ—একবচন নহে, এ কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। দেশে ক্রিয়া ছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল না; আচার ছিল, কিন্তু সাধন ছিল না; কিম্বদন্তী ছিল, কিন্তু অনুভূতি ছিল না; গতানুগতিক ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছিল না। ঋগ্বেদাদি যে প্রকৃত পক্ষে শব্দ নহে, বেদ স্বয়ংই এগুলিকে অপরা বিদ্যা বলিয়াছেন; যুগে যুগে লোকে ঋগ্বেদাদির প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াও প্রকৃত শব্দ বা সত্য বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে নাই; পুরাণাদিতে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এ সকল দৃষ্টান্ত লোকে জানিত, কিন্তু তার মর্ম্মগ্রহণে কেহ চেষ্টাও করিত না, সমর্থও ছিল না। কিম্বদন্তী শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদার দাবী করিতেছিল। কাজেই অভিনব শিক্ষার প্রবল যুক্তিবাদের মুখে শাস্ত্রের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া গেল।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ এই জন্যই এতটা সহজে ও সরাসরিভাবে শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বেদচতুষ্টয়ের আলোচনা ও বিচার করিয়াই, তাহাকে বর্জ্জন করেন; প্রাচীন মীমাংসা-দর্শনে বেদের প্রামাণ্যের কি ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার সন্ধান লয়েন নাই। সমগ্র বেদকে কোনও হিন্দুসিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কর্ম্মকাণ্ডের

পক্ষপাতী ঋষিগণ বেদ বলিতে কেবল কর্ম্মের প্রেরণা যাহাতে আছে, তাহাই বুঝিতেন। ঋগ্বেদাদিতে যেখানে বিহিত কর্ম্মের উপদেশ আছে, তাহাই মুখ্য বেদ; যাহাতে তাহা নাই তাহা স্বতঃ-প্রামাণ্য নহে, তাহা অর্থবাদ মাত্র। জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ বৈদিক দেববাদকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। দেবতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁরা স্বীকার করেন নাই। অন্যদিকে জ্ঞানপন্থিগণ বেদের যে সকল স্থলে মোক্ষপ্রতিপাদন করিয়াছে, কেবল তাহাকেই প্রামাণ্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁদের মত—মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং—যাহাতে মোক্ষোপদেশ দান করে, ও মোক্ষতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাই কেবল বেদ বা শাস্ত্র-নামের ও প্রামাণ্য মর্য্যাদার অধিকারী। তদেতর যাহা কিছু তৎসমুদয়ই অর্থবাদ মাত্র। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সহজেই বেদকে একান্তভাবে ও সরাসরি প্রণালীতে বর্জ্জন না করিয়াও আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি উপনিষদাদি হইতে যে সকল শ্রুতি সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মোপনিষৎ রচনা করেন, তৎসমুদয়ই মোক্ষপ্রতিপাদক; সুতরাং প্রাচীন মীমাংসার মতে, শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যেমন পূর্ব্ব-মীমাংসায় কর্ম্মপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, বৈদিক দেববাদ অস্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ উত্তর-মীমাংসাতেও, জ্ঞানের ঐকান্তিক প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াও, ঈশ্বরত্ব বা নিঃশেষ ব্রহ্মত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। "শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা তূপদেশ বাম দেববৎ" এই সূত্র তাহার প্রমাণ। রাজা রামমোহন এ সকল কথা জানিতেন। মীমাংসা দর্শনে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। সুতরাং প্রাচীন ঋষি পন্থা অনুসরণ করিয়াই তিনি বেদের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার শিক্ষাও অল্পকাল মধ্যেই লোপ প্রাপ্ত হয়। তাঁর সমসাময়িক লোকে এ শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হওয়াতেই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্কারের প্রয়োজনের সৃষ্টি ও তাহার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল।

অতি পুরাতন কাল হইতেই আমাদিগের দেশে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন;—সত্য-লাভের এই ত্রিবিধ ক্রম প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রবণ। যাহা জানি নাই, যাহা পাই নাই, গুরুশাস্ত্রমুখে তার উপদেশ লাভ করার নাম শ্রবণ। শ্রবণ জ্ঞানের প্রথম সোপান। এই শ্রবণের যোগ্যতালাভের পক্ষে কেবল শ্রদ্ধাই আবশ্যক। গুরুশাস্ত্রবাক্যে আস্তিক্য-বুদ্ধিকে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বলে। গুরু যাহা বলিতেছেন, শাস্ত্রে যাহা উপদেশ দিয়াছে, তাহা আছে, অর্থাৎ তাহা সত্য,—এই যে স্থির ধারণা, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যার নাই, সে গুরুর কথা বা শাস্ত্রের কথা শুনিবে কেন? এই শ্রদ্ধা থাকিলে পরে শ্রবণের অধিকার জন্মে। কিন্তু শ্রবণের বিষয় শব্দ। আর শব্দ এবং বস্তু এক নহে। কেবল শব্দের দ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান মাত্রেই বস্তুতন্ত্র; বস্তুর অধীন; বস্তুসাক্ষাৎকারেই তার উৎপত্তি হয়। বস্তুসাক্ষাৎকার লাভ যতক্ষণ না হইয়াছে, ততক্ষণ শুদ্ধ শব্দের দ্বারা কদাপি তার জ্ঞানলাভ হয় না। শব্দের দ্বারা যেমন বস্তুজ্ঞান জন্মে না, প্রতিশব্দের দ্বারাও

সেইরূপ বস্তু-জ্ঞান জন্মে না। অভিধান প্রতি-শব্দই প্রকাশ করে। কোন বস্তুকে কত ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতে পারা যায়, অভিধান কেবল সেই কথাই ব্যক্ত করে; কিন্তু সে বস্তুকে তার যথাযোগ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমক্ষে ধারণ করিতে পারে কি? যেমন অভিধানের দ্বারা বস্তুজ্ঞান লাভ হয় না, সেই রূপ ব্যাকরণের দ্বারাও পদের যত বিশদ অন্বয়াদি কর না কেন, সেই পদোক্ত বস্তু যদি আমার পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বা অধুনা-প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে, এই সকল অন্বয়াদির দ্বারাও কোনও বাক্যের বা পদের প্রকৃত মর্ম্ম কদাপি আমার হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কেবল শ্রবণের দ্বারা বস্তুজ্ঞানলাভ হয় না। শ্রবণের পরে মনন। বিচারপূর্ব্বক শ্রুত বিষয়ের অর্থধারণাকেই মনন বলে। শ্রবণের সার্থকতার জন্য যেমন শ্রদ্ধার আবশ্যক, মননের সার্থকতার জন্য সেইরূপ বিচার আবশ্যক। এই বিচার যুক্তিমুখী, যুক্তির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু যুক্তি-প্রয়োগে কোনও বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সে বিষয়ের প্রচলিত এবং মামুলি মত, বিশ্বাস, অর্থ বা সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। সন্দেহেই বিচারের প্রয়োজন। সন্দেহ নিরসন করিবার জন্যই বিচারের আবশ্যক। কিন্তু গতানুগতিক, সংস্কারবদ্ধ ধর্ম্মে সন্দেহেরই বা অবসর কোথায়? যন্ত্রারূঢ়ের মতন লোকে অবশে বা শুদ্ধ সংস্কারবশে যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিয়া চলিতেছিল। অর্থহীন কর্ম্ম, প্রাণহীন ধর্ম্ম,—কেবল লোকাচারের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, ঘোরতর তামসিক জনগণের উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। দেশে জিজ্ঞাসার লোপ হইয়াছিল। স্মৃতির অর্থ লইয়াই যাহা কিছু সন্দেহ ও বিচার-আলোচনা হইত, শ্রুতির মীমাংসার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় নাই, সে শিক্ষাও পণ্ডিতসমাজে পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ন্যায়ের সূত্র সকল, সত্য প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত না হইয়া, স্মৃতির অর্থনির্ণয়েই আপনাদের শক্তিক্ষয় করিতেছিল। মুমুক্ষু লোকেরাও শাক্ত বৈষ্ণবাদি তন্ত্রের সদ্গুরুর পদাশ্রয় পাইয়া, মোক্ষসাধনে তৎপর ছিলেন;—শাস্ত্রযুক্তির ধার তাঁহারাও বড় ধারিতেন না। গুরুমুখী পন্থাও গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য মুমুক্ষুসাধক-সম্প্রদায়মধ্যেও জ্ঞানপিপাসা অপেক্ষা সাধন-নিষ্ঠাই বেশী দেখা যাইত। আর কেহ কেহ এই সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত বস্তু-সাক্ষাৎকারলাভে পরমজ্ঞানের অধিকারী হইলেও, সে জ্ঞান তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সীমাতেই প্রায় আবদ্ধ থাকিত; আর ক্বচিৎ সঙ্গীতে বা কাব্যে স্ফুরিত হইলেও, লোকে তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারিতও না, বুঝিবার জন্য লালায়িতও হইত না। দেশের যখন এই অবস্থা, তখন নূতন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব আমাদিগকে আসিয়া একান্তভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে; সুতরাং সে সময়ে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা ছিল না।

শাস্ত্র-প্রামাণ্য যে কি, ইহা জানি নাই ও বুঝি নাই বলিয়াই একদিন শাস্ত্রকে একান্ত ভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলাম। আর এই শাস্ত্র প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়া যে সত্য লাভ করিলাম, তাহারই বা প্রকৃতি ও মূল্য কি,

এ প্রশ্নের আলোচনায় যতদিন প্রবৃত্ত হই নাই, তত দিনই কেবল শব্দ বলিয়া যে একটা তৃতীয় প্রমাণ আছে, তাহা বুঝি নাই, ও তার মর্ম্ম ধরিতে পারি নাই। কিন্তু যখনই এই তথাকথিত আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইষণ লব্ধ তত্ত্বের প্রকৃত পরিচয় পাইতে লাগিলাম, তখন হইতেই শব্দ-প্রমাণেরও প্রয়োজন উপস্থিত হইল। প্রত্যক্ষ রূপরসাদিরই প্রমাণ প্রদান করে, অরূপ-অরস, অতীন্দ্রিয় যাহা, তার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ কথা কহিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলেই একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সংবাদ সতত বহন করিতেছে, সত্য। এই যে সান্ত ও সসীম জগৎ, তাহাই অনন্ত ও অসীমের ভাব নিয়ত আমাদিগের চিত্তেতে জাগাইয়া তোলে। এই মানব-বুদ্ধিই, আপনার অতীত একটা অনাদ্যনন্ত জ্ঞানরাজ্যের আভা ফুটাইয়া তোলে। পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র বিষয়-সাক্ষাৎকারই বিরাট ও ভূমা আনন্দের সুর বহন করিয়া থাকে। এ সকলই সত্য; এ সকলই প্রত্যক্ষ কথা। ভাবুক জন মাত্রেরই এ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি স্বল্প-বিস্তর আছে বা হইয়াছে। লৌকিক বিচারেও এই সান্তের মধ্যেই অনন্তকে অনুভব করা যায়। আমি আমার সম্মুখে যে দেশখণ্ডকে দেখিতেছি—তাহা সসীম, তার বিশিষ্ট একটা পরিমাণ আছে। কিন্তু এই পরিমিত দেশভাগকে প্রত্যক্ষ করিতে যাইয়াই, তার অগ্রে ও পশ্চাতে যে একটা অনির্দ্দিষ্ট অসীম দেশ আছে, ইহা বুদ্ধিগম্য করিয়া লই। এই অনির্দ্দিষ্ট ও অপরিচ্ছিন্ন দেশেতেই আমার খণ্ডীকৃত দেশের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেইরূপ আমি যে কালটুকুকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ক্ষুদ্র, তার সীমা আছে, সত্য। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্ন কালভাগকে জানিতে গিয়াই তার পূর্ব্বে ও পরে যে একটা অপরিজ্ঞাত ও অসীম কাল পড়িয়া আছে, ইহা বুঝি ও জানি। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই অতীন্দ্রিয়ের, সীমার মধ্যেই অসীমের সংকেত আমরা নিয়তই প্রাপ্ত হইতেছি। এই অতীন্দ্রিয় ও অসীমকে ছাড়িয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও সসীম বস্তুর জ্ঞানই একান্ত অসম্ভব হয়। মানববুদ্ধি, আপনার আত্মপ্রত্যয় বা necessity of thoughtএর দ্বারাই এই অতীন্দ্রিয় ও অসীম বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। ইহার জন্য শব্দ-প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই পথে যে তত্ত্ববস্তু লাভ করি, তার মূল্য কতটুকু, প্রকৃতিই বা কি? এ তো অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ঈশ্বর-তত্ত্ব। সীমার মধ্যে যে অসীমের সন্ধান পাই, তার সম্বন্ধে, "আছে"—কেবল এই মাত্রই বলিতে পারি; —"অস্তীতি ব্রুবতি, কথং তদুপলভ্যতে?" শ্রুতি এই ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন :—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে।

যে স্থানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না; আমরা সে বস্তু কি ইহা জানি না। কি করিয়া তাহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন ও সমুদায় বস্তুকে অতিক্রম করিয়া আছেন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদিগের নিকটে এই তত্ত্বের

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে এই কথাই শুনিয়াছি। এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান পৌঁছিতে পারে। আধুনিক দর্শনও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে এই অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার জড় ও জীব বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া, প্রত্যক্ষ ও অনুমান-বলে, এই অজ্ঞাত—unknown, এবং অজ্ঞেয়—unknowable, সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, প্রকৃতপক্ষে এর উপরে যাইতে পারে না। এই সীমার মধ্যে যে অসীমকে দেখা যায়, কল্পনা তাহাকে নানা ভাবে সাজাইয়া তুলিতে পারে। এই নিরাকার ও নির্বিশেষ, এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তুকেই জগতের রূপরসের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এই চাক্ষুষ বিষয়ের মাধুর্য্যকে ও রসকে, ভাবাবেশে সম্ভোগও করিতে পারে। কিন্তু এ সকল স্তবস্তুতি, পূজা-অর্চ্চনা, ধ্যান-ধারণা যতই কেন তৃপ্তিপ্রদ কিম্বা চিত্তোন্মাদ-কর হউক না,—তাহা যে কল্পিত, বস্তুতন্ত্র নয়, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পরমতত্ত্বকেই ভাবাঙ্গের সাহায্যে অন্তরে ফুটাইয়া তুলিয়া, আপনার মানস-প্রতিমাতে ঈশ্বরবুদ্ধি আরোপ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুনীল আকাশে, অসীম সাগরে, পুষ্পিত বনে, সুগঠিত জীবদেহে, অথবা নরনারীর স্নিগ্ধ সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া তাহার ধ্যান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া, একটা অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করাতেও এই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত তত্ত্বকে অতিক্রম করা হয় না। এই যে মানস-ঈশ্বর, ইহাও প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ তত্ত্বকেও প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বলা যায় না। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব অসাধারণ; সাধারণ ঈশ্বরতত্ত্ব এক অর্থে ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং উপমান—এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারাই তাহার সম্যক প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এই ঈশ্বরতত্ত্বও উপেক্ষার বস্তু নহে। এই প্রাকৃত তত্ত্ব অবলম্বনেই শ্রুতি অপ্রাকৃত ও সত্য যে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তার উপদেশ দিয়াছেন। ভৃগুবারুণী সংবাদ তার সাক্ষী। বরুণ ভৃগুকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে যাইয়া, এই সাধারণ, এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানগ্রাহ্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রথমে তারই কথা বলেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"--ইত্যাদি শ্রুতি এই সাধারণ তত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। "যাহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা কর্তৃক এই ভূতসকল স্থিতি করে; যাহার প্রতি এই ভূতসকল গমন করে, ও যাহাতে অন্তিমে প্রবেশ করে"—তাহাই ব্রহ্ম। এখানে দৃষ্টের বা প্রত্যক্ষের উপরেই অদৃষ্টের বা অপ্রত্যক্ষের উপদেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা অপরিহার্য্য। জ্ঞাতের ভিতর দিয়াই, জ্ঞাতের উপমার বা জ্ঞাতের সম্বন্ধের দ্বারাই অজ্ঞাতের উপদেশ দেওয়া সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আপনার পুত্র ভৃগুকে বরুণ জগতের সর্ব্বজনবিদিত, জন্মাদি ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া,—এ সকলের কারণরূপেই সেই তত্ত্বের উপদেশ দান করিয়াছেন। ভৃগু ব্রহ্ম শব্দমাত্র শুনিয়াছিলেন। বস্তুসাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। এই শব্দ কোন্ বস্তুকে

নির্দ্দেশ করে, এই বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্যই পিতৃসমীপে উপনীত হইয়া—"অধীহি ভাবো ব্রহ্মেতি" বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করেন। ভৃগুর নিকটে তখন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমান, এই প্রমাণত্রয়ের পথই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তিনি যাবতীয় লৌকিক বিদ্যাই কেবল লাভ করিয়াছিলেন; প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনধিগম্য, শুদ্ধ শব্দ প্রমাণপ্রতিষ্ঠিত যে পরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, তাহা তখনও লাভ করেন নাই। অতএব তিনি যাহা জানিতেছেন, তাহারই উপরে বরুণকে তাঁর অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু "যতো বা ইমানি ভূতানি"—ইত্যাদি উপদেশ দিয়াই বরুণ ক্ষান্ত হন নাই। এই সাধারণ, প্রত্যক্ষ অনুমান-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের কথা বলিয়া, তিনি বলিলেন,—"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"—তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর। এই বিশেষরূপে জানিতে গেলেই শব্দপ্রমাণের আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক। "যতো বা ইমানি ভূতানি"—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র নির্দ্দেশ করে কিন্তু তটস্থ লক্ষণ আর স্বরূপ লক্ষণ এক নহে। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বস্তুর একটা বাহিরের জ্ঞানমাত্র লাভ সম্ভব, তার অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় এ পথে পাওয়া যায় না। বাহিরের জ্ঞান আকস্মিক, নিত্য নাও বা হইতে পারে। জগতের জন্মস্থিতিলয়-কারণরূপে ব্রহ্মকে জগতের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ, তারই মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু এ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন, কি ছিলেন না? জগতের বিলোপে ব্রহ্ম থাকিবেন, কি থাকিবেন না? যদি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন না বল, তাহা হইলে তাঁহাকে জগতের জন্মের কারণ বলিতে পার না। কারণ, কারণমাত্রেই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে, কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের স্থিতি না হইলে, তার কারণতত্ত্বই বিলোপ পাইয়া যায়। আর জগতের লয়ের হেতুও যদি এই ব্রহ্ম, এ কথা যদি বল;—শ্রুতি এখানে ইহাই বলিতেছেন,—তাহা হইলে জগতের বিলয়েও ব্রহ্মের সত্তা যেমন পূর্ব্বে, সেইরূপই থাকে, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব জগৎরূপ কার্য্যের মধ্যে, এই জগতের জন্মস্থিতিলয়হেতুরূপে, ব্রহ্মের যে প্রকাশ, তাহা আকস্মিক মাত্র। এই লক্ষণার দ্বারা তার নিত্যস্বরূপ কোনও মতেই সূচিত বা প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ এই তটস্থলক্ষণকে অবলম্বন করিয়া, আমাদের বুদ্ধি ব্রহ্মসত্তা সম্বন্ধে যে কোনও কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হউক না কেন, তাহা কদাপি বস্তুতন্ত্র হইতেই পারে না। জগৎকারণরূপে আমরা ব্রহ্মের যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা অনুমানসিদ্ধ। এই অনুমান, আবার, আমাদের এই দৃশ্যমান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য যতটুকু, এই অনুমানেরও প্রামাণ্য ততটুকুই হইবে। এই প্রমাণের দ্বারা অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির-অতীত, পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হয় না। আর এই ভাবে, জগতের উৎপত্তিস্থিতি-লয়-কারণরূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা তাঁর স্বরূপ জ্ঞান নয় বলিয়াই, বরুণ আপনার ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্রকে এই তটস্থ লক্ষণা দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ বলিয়া বলিলেন—"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।" বিশেষভাবে

তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, বা চেষ্টা কর। "যতো বা ইমানি ভূতানি"—বলিয়া যে বুদ্ধি-গ্রাহ্য তত্ত্বের কথা কহিলাম, তাহা ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ-কথা নহে। সে তত্ত্বের স্বরূপের সাক্ষাৎকারের জন্য সাধন অবলম্বন কর। এই স্বরূপ-বস্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আমাদের যে মন, অন্তরালে থাকিয়া, চক্ষুরাদির দ্বারা রূপরসাদির জ্ঞানলাভ সম্ভব করিতেছে, এই স্বরূপবস্তু সেই মনেরও বিষয় হয় না। মনের অন্তরালে যে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকিয়া, এই মানসিক জ্ঞান সম্ভব করিতেছে, সে স্বরূপবস্তু সে বুদ্ধিরও গ্রাহ্য নহে। আর প্রমাণত্রয়ের মধ্যে, প্রথম প্রমাণদ্বয় প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমান, এই বুদ্ধির অধিকারের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তার উপরে যাইবার ইহাদের অধিকার নাই। কেবল শব্দ বা আগমের দ্বারাই পরমতত্ত্বের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ সম্ভব। সে রাজ্যে শব্দ বা আগমই একমাত্র প্রমাণ।

ফলতঃ আমরা সচরাচর যে ঈশ্বর-জ্ঞানের বা ঈশ্বরোপাসনার অভিমান করিয়া থাকি, তাহা স্বরূপ-জ্ঞানও নহে, স্বরূপ-উপাসনাও নহে। জগতের অধিকাংশ লোকেই হয় কেবল মাত্র কিম্বদন্তীর, কিম্বা তটস্থলক্ষণা সিদ্ধ ঈশ্বরের ভজনা করিয়া থাকেন। হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান—ইঁহারা সকলেই শোনা বা মনগড়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সত্য ঈশ্বর-জ্ঞান ও সত্য ঈশ্বরের ভজনা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন, আর যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, এ ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। উভয়েই তটস্থ লক্ষণার দ্বারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভাবযোগে এই অনুমানসিদ্ধ দেবতারই ভজনা করেন। কারণ, শাস্ত্র মানিলেই যে সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট বস্তুর সত্যজ্ঞানলাভ হয়, এমন নহে। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেই, জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ-গোচর বস্তুর সাক্ষাৎকার কেহ লাভ করে, এমন কখনই কেহ কল্পনা করে না। মানাটা মনের কথা। দেখাটা বস্তুসাক্ষাৎকারের উপরে নির্ভর করে। মানা আর দেখা এক কথা নহে। এই ভারতরাষ্ট্রের একজন সম্রাট আছেন, এ কথা জানে ও মানে অনেকেই। কিন্তু তাই বলিয়া তারা সকলেই যে এই সম্রাটকে দেখিয়াছে, এমন নয়। সেইরূপ পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না শব্দ বা আগমই তার একমাত্র প্রামাণ্য, এ কথা মানিলেই যে সকলের সেই পরমতত্ত্বের বা ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার-লাভ হয় বা হওয়া সম্ভব, এমন কেহই বলে না। অন্যদিকে সম্রাট একজন আছেন, ইহা পূর্ব্ব হইতে না জানিয়াও, কিম্বা শুনিয়া থাকিলেও, সে শোনা কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়াও, কেহ যদি হঠাৎ লণ্ডনে যাইয়া কোনও দিন উপস্থিত হয়, তবে সে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। সেইরূপ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপরে শব্দ বলিয়া যে আর একটা প্রামাণ্য আছে, সেই প্রামাণ্যের দ্বারাই কেবল পরমতত্ত্বের বা ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, আর প্রমাণের দ্বারা হয় না,—এ কথা না মানিয়াও, কাহারো ভাগ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ ঘটিতেও বা পারে। তখন সে ভাগ্যবান ব্যক্তি দেখিয়া জানিবেন যে সে বস্তুর স্বরূপ কি। আর সেই দেখার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ বস্তুও যে কি, শব্দ-প্রমাণ যে কাহাকে বলে, তখন তিনি আপনিই

তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন। যতক্ষণ না এরূপ দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, ততক্ষণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা যে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, ও হইতে পারে না, আমরা দৃঢ় ভাবে কেবল এই কথাই বলিতে পারি। আর ঈশ্বর বস্তু বা ব্রহ্মবস্তু আছেন, তটস্থলক্ষণার দ্বারা যখন অবিসংবাদিতভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান-লাভেরও যে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং এই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অনুমান-উপমানাদির অতিরিক্ত ও এ সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কোনও না কোনও একটা পন্থা ও প্রামাণ্য আছে, এই সিদ্ধান্তমাত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। এই ভাবে ও এই অর্থে ঈশ্বর বিশ্বাসী মাত্রকেই শব্দপ্রামাণ্য স্বীকার ও গ্রহণ করিতে হয়। না করিলে, তাঁদের ঈশ্বর তত্ত্ব হয় একদিকে অতিসূক্ষ্ম জড়তত্ত্বের, নতুবা অতি বিরাট অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ব্রহ্ম তত্ত্বের নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। ফলতঃ শব্দ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া, যাঁরাই কোনও প্রকারের ঈশ্বর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগের ঈশ্বর হয় সূক্ষ্মতম জড় শক্তি, না হয় এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু হইবেনই হইবেন। এ ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় সিদ্ধান্তের কিছুমাত্রও অবসর নাই।

প্রমাণ মধ্যে শব্দপ্রমাণ বা আগমকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিলেই, সচরাচর আমাদিগের দেশে যে ভাবে এই শব্দের বা আগমের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহাকেও সত্য ও প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অধিকাংশ লোকে, নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে, একটা অতিশয় অপ্রাকৃত অর্থে, এই শাব্দ প্রমাণ বা বেদকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহার মধ্যে অযৌক্তিক বা অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই। প্রথমতঃ শাব্দপ্রমাণ, প্রত্যক্ষেরই মত স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ যেমন আপনি আপনার প্রমাণ, প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য অন্য কোনও প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, ও হইতে পারে না,— আমার বিষয়জগতের যাবতীয় জ্ঞানের প্রমাণ যেমন আমার চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—শব্দের প্রমাণ যেমন আমার কর্ণ, স্পর্শের প্রমাণ যেমন আমার ত্বক, রূপের প্রমাণ যেমন আমার চক্ষু, রসের প্রমাণ যেমন আমার রসনা, এবং গন্ধের প্রমাণ যেমন আমার নাসিকা; শব্দস্পর্শাদির প্রমাণ যেমন আমার এই সকল ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারের উপরে একান্ত ও অনন্যভাবে নির্ভর করে, এ সকলের প্রমাণ যেমন আর কোনও উপায়ে হয় না; আর আমার চক্ষুরাদির প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যও যেমন অন্য কোনও প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে না,— সেইরূপ শব্দও, অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে, আপনি আপনার প্রমাণ, প্রমাণান্তরের দ্বারা তাহা সমর্থিত বা নিরস্ত হয় না ও হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ এবং শব্দ বা আগম, উভয়ই একজাতীয় প্রমাণ। প্রত্যক্ষজ্ঞানে ও শব্দজ্ঞানে, বিষয়ের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু ক্রিয়ার পার্থক্য নাই। প্রত্যক্ষজ্ঞান, যেমন বস্তুতন্ত্র, বস্তুসাক্ষাৎকার ব্যতীত এ জ্ঞান ফোটে না; শব্দজ্ঞানও সেইরূপ বস্তুতন্ত্র, বস্তু-সাক্ষাৎকার ব্যতীত জন্মে না। প্রত্যক্ষ শব্দস্পর্শরূপরসাদির সাক্ষাৎকার হইতে উৎপন্ন হয়; শব্দ সেইরূপ অন্তর-অন্তর্নিরূপ-

অরস-অগন্ধ যে বস্তু তাহার সাক্ষাৎকার হইতে উৎপন্ন হয়। বস্তু মাত্রেই জ্ঞানগম্য। যাহা জানি না, জানা যায় না, জানা যাইতে পারে না,—তাহাকে বস্তু বলে না; তাহা অবস্তু, অসৎ, মিথ্যা। অশব্দ অস্পর্শ-অরূপ-অরস-অগন্ধ যাকে বলি, যার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, আকার নাই, অংশ নাই,—এমন যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অবশ্যই জ্ঞানগম্য, তাহা কোনও না কোনও উপায়ে, কেহ না কেহ জানিয়াছে, জানিতেছে, বা জানিতে পারে,—ইহা স্থির নিশ্চিত। আর এই যে অশব্দ-অস্পর্শ অরূপ অব্যয় বস্তু ইহা যদি জ্ঞানগম্য, জ্ঞানগ্রাহ্য হয়, তবে সে জ্ঞানেরও কোন না কোন একটা পন্থা বা যন্ত্র, বা বৃত্তি জ্ঞাতার থাকিবেই থাকিবে। যাহা জ্ঞানগম্য, তার জ্ঞাতা অবশ্যই আছে। যে জ্ঞাতা, তার জ্ঞানের উপকরণ বা করণও থাকিবেই থাকিবে। জ্ঞেয় অথচ জ্ঞাতা নাই, জ্ঞাতা অথচ তাঁর জ্ঞানের করণ বা যন্ত্র নাই, ইহা অসম্ভব। জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, করণ বা জ্ঞানলাভের উপযুক্ত ও উপযোগী সহায়, ইহারা পরস্পরের অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তু যদি জ্ঞানগম্য হন, তাহা হইলে তাঁর জ্ঞাতা অবশ্যই থাকিবে; আর জ্ঞাতা থাকিলেই, সেই জ্ঞাতার এমন কোনও বৃত্তি বা শক্তি বা করণ বা যন্ত্র থাকিবেই থাকিবে, যাহার দ্বারা তিনি এই জ্ঞানগম্য ব্রহ্মবস্তু বা তত্ত্ববস্তুকে জানিতে পারেন। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় কিম্বা মন-বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃবৃত্তির দ্বারা এই অতীন্দ্রিয় ও অবাঙ্‌মনসোগোচর বস্তুকে কখনই জানা যায় না, জানা সম্ভব নহে। সুতরাং এ সকলের অতীত, অতীন্দ্রিয়, এমন কোনও বৃত্তি, শক্তি, বা করণ, আমাদের অবশ্যই আছে, যাহার দ্বারা এই পরমবস্তু বা পরমতত্ত্বকে জানিতে পারা যায়। চক্ষু যেমন রূপ জানে, প্রত্যক্ষভাবে জানে; কর্ণ যেমন শব্দ শোনে; ইন্দ্রিয় সকল যেমন সাক্ষাৎভাবে আপন আপন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে এই ব্রহ্মবস্তুর বা এই পরমতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিবার শক্তি মানুষের আছে। না থাকিলে, তার ঈশ্বরবুদ্ধি, ঈশ্বরারাধনা, ঈশ্বর-জ্ঞান, ঈশ্বর-ভক্তি প্রভৃতি সকলই কল্পিত, মিথ্যা হইয়া যায়।

অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেই, মানুষের ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভের শক্তি আছে, ইহা মানিতেই হইবে। এই শক্তির নামই প্রকৃতপক্ষে শাব্দ। শাব্দ প্রমাণ এই শক্তিকেই নির্দ্দেশ করে। এই শাব্দপ্রমাণ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রাণস্বরূপ। কেন?—বারান্তরে তাহার বিশেষ আলোচনা করিব। *

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

* পৌষের বঙ্গদর্শনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার শিরোনামা—"ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—অবতারবাদ" না হইয়া—"ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—শাস্ত্রপ্রামাণ্য," হওয়া উচিত ছিল। মুদ্রাকরের অনুগ্রহে প্রবন্ধের শিরোনামার সঙ্গে তার বিষয়ের কোনই সম্বন্ধ বোঝা যায় নাই।—লেখক।

৺জগদীশনাথ রায়

কুমিল্লা হইতে জগদীশবাবু দুই বৎসরের ফারলো ছুটী লইয়া কলিকাতায় নিজ বসতবাটীতে আসিয়া বসিলেন, এই সময় গবর্ণমেণ্ট ইহাকে অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং পুলিশের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার একেবারে রহিত হইল না। সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল ইঁহাকে বড়ই মান্য করিতেন, পাল মহাশয় ইঁহাকে তজ্জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ম্যানেজিং কমিটিভুক্ত করিলেন, পুলিশ-সংক্রান্ত এবং অপরাপর বিষয়ের মন্তব্য যাহা জগদীশ বাবু লিখিতেন তাহা গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইত।

জগদীশবাবু উচ্চদরের সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা যেমন উন্নত ছিল, কণ্ঠও তেমনি সুমধুর ছিল; তিনি সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ..ত পারিতেন। তাঁহার গানের মূর্চ্ছনা, ..য়দা, আলাপ শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইত; রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী কমিটীর সদস্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার গান শুনিয়াছেন এমন অনেকে এখন জীবিত আছেন, তাঁহারা বলেন এমন মনোমুগ্ধকর, সুললিত কণ্ঠ তাঁহারা কখন শ্রবণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে দুই একটা গল্প বলি,—মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত "মকরত কুঞ্জ" উদ্যানে প্রথম কলেজ রিউনিয়ান হয়। মহারাজার সঙ্গীতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞতা ছিল এবং বিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রবিদ্‌গণকে বাগানে আহ্বান করিয়াছিলেন, প্রায় সকল ঘরেই সঙ্গীত চলিতেছিল, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং বাবু শ্যামাচরণ লাহা, জগদীশবাবুকে একটি গান গাহিতে বিশেষ অনুরোধ করেন, জগদীশবাবু তাঁহাদের কথামত, বিনাযন্ত্রের সাহায্যে একটি গান গাহিলেন, বলা বাহুল্য যাঁহারা অপরাপর ঘরে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র শুনিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে এবং অপরাপর বহুলোক জগদীশবাবু যে ঘরে গান গাহিতেছিলেন সেইখানে আসিয়া সমবেত হইলেন এবং একবাক্যে তাঁহার সুললিত মধুর কণ্ঠের এবং কায়দার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একবার সুপরিচিত ধরণী কথক মহাশয় জগদীশবাবুর সিমুলিয়ার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন; বৈকালে সঙ্গীত আরম্ভ হইল, একটি করিয়া গান জগদীশবাবু গাহিতে লাগিলেন, আর একটি করিয়া কথক মহাশয় গাহিতে লাগিলেন, জগদীশবাবু এত উচ্চ সুরে গান ধরিলেন যে, ধরণীবাবু আর গাহিতে সাহসী হইলেন না, বলিলেন এ উচ্চ সুরের পর তাঁহার গান একেবারে ভাল লাগিবে না।

প্রাতঃকালে প্রত্যহ জগদীশবাবু বেড়াইতে বাহির হইতেন, হেদুয়ার মোড়ে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন; শ্যামবাজারের দিকে প্রায় যাওয়া হইত, কতক পথ অতিক্রম করিলে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন আসিয়া মিলিত হইতেন, ক্রমে বহু গণ্য মান্য লোক এই দলভুক্ত হইয়া সরকারী পথে বিচরণ করিতেন। উচ্চদরের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট

কর্ম্মচারীরা অনেক বিষয়ে জগদীশবাবুর পরামর্শ লইতেন এবং তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ে মন্তব্য পাঠাইয়া দিতেন। জগদীশবাবুর বাটীতে, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু বাবু, হেম বাবু, তারাপ্রসাদ বাবু প্রভৃতি অনেক মহাত্মা আসিয়া উপস্থিত হইতেন। একদিন কেশববাবুকে লক্ষ্য করিয়া, জগদীশবাবু বলিলেন "দেখ, টাউনহল ব্যতীত প্রকাশ্য সভা করিবার আমাদের কোন স্থান নাই। টাউনহল না পাইলে আমাদের গত্যন্তর নাই, অতএব এমন কি একটা স্থানের আবশ্যকতা নাই, যেখানে ইচ্ছামত আমরা সভা-সমিতি করিতে পারি?" কেশব বাবু উত্তরে বলিলেন "এ কথা আমার মনে থাকিবে।" কিছুদিন পরে যখন আলবার্ট হল হইল, তখন কেশববাবু জগদীশবাবুকে বলিলেন "আপনার ইচ্ছা আমি কার্য্যে পরিণত করিয়াছি।" জগদীশবাবু "কলেজ রিউনিয়ানের" প্রতিষ্ঠাতা; শিক্ষিত-সম্প্রদায় বৎসরের মধ্যে একদিন সমবেত হইয়া আনন্দোৎসব করেন, ইহাই রিউনিয়ানের মুখ্য উদ্দেশ্য; সভায়, যে কেহ ইচ্ছা করেন, প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারিতেন এবং আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট আয়োজন হইত, জলখাবারেরও বিশেষ বন্দোবস্ত হইত। প্রথম রিউনিয়ান মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত "এমারেল্ড বাউয়ার"এ হইয়াছিল এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বালক ছিলেন, তাঁহার একটি কবিতা তাঁহার পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব শর্ম্মার দ্বারা পঠিত হয়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতা পাঠ করেন। দ্বিতীয় বৎসর রিউনিয়ান মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার উদ্যানে হইয়াছিল, স্যার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অবৈতনিক সম্পাদক এবং বাবু খগেন্দ্রনাথ রায় অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সময় মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে একটি কমিশন গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন; স্যার হেনরি কটন কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং জজ বিভারলি ডাক্তার নিভারডেল সদস্য ছিলেন। এই তিনজন একদিন জগদীশ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থান দেখিয়া আসেন, জগদীশ বাবুর মন্তব্য, কমিশনের বিবরণে ছাপা আছে। জগদীশ বাবু সকল খেলাতেই দক্ষ ছিলেন, স্যার হেনরি হ্যারিসন এবং স্যার হেনরি কটন একজোট হইয়া ইঁহার সঙ্গে দাবা খেলিতেন, বলা বাহুল্য প্রায় সকল বাজিতে জগদীশবাবু জয়লাভ করিতেন।

জগদীশবাবুর দৃষ্টি সকল বিষয়ে ছিল, একবার তিনি কলিকাতা হইতে স্থলপথে বালেশ্বর যাইতেছিলেন। যখন মেদিনীপুর গিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানকার কালেক্টার সাহেব এবং পুলিশ সাহেব, ডাক বাঙ্গালায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; নানা কথার পর, পুলিশ সাহেব বলিলেন "দেখুন এখানে একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, মাল কিম্বা ডাকাতদের কোন অনুসন্ধানই করিতে পারিতেছি না, আপনি আমাদের সহায়তা করুন, আপনার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পূর্ণমাত্রায় আছে। অকুস্থল নিকটেই, বলেন ত, আপনাকে আমরা সেই স্থানে সঙ্গে করিয়া

লইয়া যাই।" জগদীশবাবু যাইতে স্বীকৃত হইলে তাঁহারা তিনজনে গাড়িতে গেলেন, ঘটনা স্থলে পৌঁছিয়া, জগদীশবাবু বাটীটির চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পুলিশ সাহেব বলিলেন—"দেখুন, স্থানীয় সকল বদমাইসকে ধরিয়া চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিলাম না।" ঐ স্থানে একটি তামাকু খাইবার কলিকা জগদীশবাবু কুড়াইয়া লইলেন এবং অদূরে একটা নূতন বাঁশের লাঠি পড়িয়াছিল, তাহাও সংগ্রহ করিলেন, দুইটি দ্রব্য সাহেবদের দেখাইয়া বলিলেন 'এই দুইটি জিনিসই বাঁকুড়ার, মেদিনীপুরে এমত কলকে তৈয়ারি হয় না, ছড়িটির গঠনও স্বতন্ত্র, এরকম লাঠি বাঁকুড়া অঞ্চলে তৈয়ারি হয়, সুতরাং এখানকার স্থানীয় লোক আটকাইয়া রাখা বিড়ম্বনা মাত্র, সম্ভবতঃ বাঁকুড়ার লোকে এ ডাকাতি করিয়াছে, আপনারা বাঁকুড়ায় গিয়া তদারক করুন, মোকদ্দমার কিনারা হইবে।" সাহেবেরা জগদীশবাবুর কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া বাঁকুড়ায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন; তখন তিনি উঁহাদের বলিলেন "আর একটা কথা আছে, আপনারা কি জানেন বাঁকুড়ায় কেমন করিয়া বদমাইসদের লুকাইয়া রাখে?" সাহেবেরা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলায়,—জগদীশবাবু বলিলেন "ঘরের মেজে খুঁড়িয়া, বেশ পরিষ্কার করিয়া, তার ভিতর তারা মানুষ গোপন রাখে, গর্ত্তটা এমন করিয়া আচ্ছাদন করে যে তাহার অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধি হয় না এবং এমন কৌশলে বায়ু প্রবেশের ছিদ্র রাখে যে সহসা কেহ কিছু অনুভব করিতে পারে না।" সাহেবেরা জগদীশবাবুর পরামর্শমত কার্য্য করিয়া সফলকাম হন; দুইজন প্রধান ডাকাত মাটির নিম্নদেশ হইতে গ্রেপ্তার হয়।

(ক্রমশ)

রসের রূপ—পূর্ব্বরাগ

(ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনের ৭৮৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

পুরাতন তন্ত্রের মায়াবাদী বা নূতন তন্ত্রের নীতিবাদী রূপ-লালসাকে যত হীন বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তাহা তত হীন নহে। রূপটাকে তাঁরা একটা শারীরিক বস্তু বলিয়া মনে করেন। রূপ চক্ষুগ্রাহ্য, রূপের টানে আমাদিগকে এই বিষয়রাজ্যে বাঁধিয়া রাখে। লোকে রূপোন্মত্ত হইয়া সমাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। এই সকল সত্য বটে। আর এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বিজ্ঞলোকে রূপ-লালসাকে হীন ও বর্জ্জনীয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও, রূপ-লালসা যে প্রকৃতপক্ষে আত্মরতিরই রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র, ইহা অস্বীকার করা যায় না। চক্ষে যাহা নিঃশেষ দেখিতে

পাওয়া যায়, তার একটা সার্ব্বজনীন লক্ষণের বা মাপকাঠির প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। জড়ধর্ম্মী মাত্রেরই এরূপ লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু রূপবস্তুর তো আজি পর্য্যন্ত এরূপ কোনও সার্ব্বজনীন লক্ষণ নির্ণীত হয় নাই। একের চক্ষে যাহা কাল, আর দশজনের চক্ষেও তাহা কালই হয়, সাদা হয় না। কিন্তু একের চক্ষে যাহা অতিশয় সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, অপরের চক্ষে সে সকল সময়, তাহা সুন্দর বোধ হয় না। অথচ রূপ যদি নিতান্তই কেবল চক্ষুর্গ্রাহ্য বস্তু হইত, তাহা হইলে, এরূপ মতভেদের একটা অবসর কথনই থাকিত না। আমাদের স্বরূপ বস্তু যেমন ইন্দ্রিয়াতীত, শুদ্ধ অনুভূতিগ্রাহ্য মাত্র, এই রূপ-বস্তুও প্রকৃতপক্ষে তাহাই। রূপ বাহিরে ফোটে, স্বরূপ অন্তরে জাগিয়া থাকে। কিন্তু এই স্বরূপই আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতে যাইয়া বাহিরে এই রূপের প্রকাশ করে। রূপ দৃষ্ট বস্তুর ধর্ম্ম নহে, দ্রষ্টা আত্মারই ধর্ম্ম। এই আত্ম-বস্তু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি,
ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি,
নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আমি অর্থাৎ এই অহং-প্রত্যয়বাচক বস্তু যে আমার মধ্যে দ্রষ্টা-শ্রোতা-জ্ঞাতা-ভোক্তা-কর্ত্তা রূপে রহিয়াছে, তাহা দেবতা অথবা জ্যোতিঃস্বরূপ; অন্য কিছু নহে। এই বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ—শোকমোহাদির অধীন নহে। এই আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিত্যমুক্তস্বভাবসম্পন্ন, এ বদ্ধ বস্তু নহে।” এই আত্মবস্তুর তিন ধর্ম্ম—সৎ, চিৎ, আর আনন্দ। সৎরূপে এই আত্মাই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। চিৎরূপে এই আত্মাই বিশ্বের জ্ঞাতা। আনন্দরূপে এই আত্মাই বিশ্বের ভোক্তা। শব্দস্পর্শরূপরসাদি ধর্ম্ম লইয়াই তো বিশ্বের স্থিতি। আর শব্দস্পর্শাদি ধর্ম্ম শ্রোতা ও স্প্রষ্টা, দ্রষ্টা ও আঘ্রাতা যে আত্মা তারই অধীন হইয়া আছে। শব্দের প্রমাণ শ্রোতা, স্পর্শের প্রমাণ স্প্রষ্টা, দৃষ্টির প্রমাণ দ্রষ্টা, ঘ্রাণের প্রমাণ আঘ্রাতা। এই জন্যই দ্রষ্টৃস্বরূপ যে আত্মা, এই বিশ্ব তাহারই উপরে স্থিতি করিতেছে। এই আত্মা অদৃশ্য হইলে, এই আত্মা যখন এই বিশ্ব হইতে আপনাকে টানিয়া লয়েন তখন বিশ্ব বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তাহারই নাম মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে আত্মা আপনাতে আপনাকে সংহৃত করেন। আত্মার সে মহা-সমাধির অবস্থা। দ্রষ্টা যখন আপনার স্বরূপে, সর্ব্বভেদাভেদ-বিবর্জ্জিত হইয়া স্থিতি করেন, তখনই বিশ্ব প্রলয়পয়োধি-জলে অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার যখন দ্রষ্টা বা আত্মা আপনাকে আপনার বিষয়রূপে প্রকাশিত করেন, আপনি বিষয় সাজিয়া, [illegible] হইয়া, আপনি ভোক্তা সাজিয়া আপনি ভোক্তা হইয়া, অপূর্ব্ব ভেদাভেদের সৃষ্টি করেন, যখন অচিন্ত্য অভেদের মধ্যে অচিন্ত্যভেদ জাগিয়া উঠে, এই অচিন্ত্য ভেদের মধ্যেই অচিন্ত্য-অভেদ লুকাইয়া থাকে,—তখনই এই লীলাপ্রয়োজনে বিশ্ব প্রকাশিত হয়। বিষয়ী আপনাকেই আপনার বিষয়রূপে নিয়ত প্রকট করিতেছেন বলিয়া এই বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মজ্ঞান এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান ব্যতীত বিষয়জ্ঞান সম্ভব হয় না।

বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া, আমরা বস্তুতঃ অজ্ঞাতসারে আত্মাকেই অন্বেষণ করিয়া বেড়াই, আর জীবের এই আত্মবস্তু অনন্ত বলিয়া, বিষয়জ্ঞানেরও নিঃশেষ হয় না, জীবের জ্ঞানপিপাসারও নিবৃত্তি হয় না। যত জানি ততই আরো জানিবার বাকি থাকে, যত আয়ত্ত করি, ততই আরো বেশী আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠে। যেমন বিষয় আপনারেই আপনার বিষয়রূপে প্রকাশিত করিয়া, জীবের এই অনন্ত জ্ঞানপিপাসার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ ভোক্তা যে আত্মা, তাহাই আপনাকে আপনার ভোগ্যরূপে প্রকাশিত করিয়া জীবের এই অনন্ত রূপলালসার সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল জ্ঞানেই মূলে আত্মজ্ঞান বলিয়া, মানুষের জ্ঞানান্বেষণের শেষ হয় না। সেইরূপ সকল রূপই আত্মানন্দ-স্বরূপ বলিয়া, জীবের রূপতৃষ্ণারও নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়েই যেমন কেবলই বাড়িয়া যায়; সম্ভোগের গভীরতা ও ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গেও সেইরূপ, ভোক্তার পিপাসা, [illegible]র মাধুর্য্য কেবল বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] মাত্রেই যেমন [illegible], রূপ-লালসা মাত্রেই সেইরূপ আত্মরতি—উভয়েই অশেষ ও অনন্ত।

ফলতঃ রূপ কেবল চক্ষে দেখা যায়, যে বলে, সে রূপ কি তাহা জানে না। রূপ চক্ষু ছাড়া যে জানা যায় তাহাও নহে। শব্দ যেমন শ্রুতির বিষয়, রূপ তেমনি চক্ষুর বিষয়। এজন্য রূপ চক্ষুগ্রাহ্য বটে, কিন্তু অন্যদিকে রূপ চক্ষুর অতীতও বটে। চক্ষে যাহা দেখি তাহা যদি চক্ষে যাহা দেখা যায় না, এমন কোনও কিছুর সঙ্কেত না দেয়, তবে সে দৃশ্য বা রূপ আমাদের লালসাকে জাগাইয়া চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না। যে রূপে এই অজ্ঞাত জগতের সঙ্কেতটী যত বেশী থাকে, তাহাই আমাদের চিত্তকে তত লুব্ধ করে। দেখিতেছি অথচ দেখিতে পাই না,—ধরি ধরি মনে করি, কিন্তু ধরিতে পারি না,—এই যে দেখা ও না দেখার, পাওয়া ও না পাওয়ার অপূর্ব্ব মাখামাখি, তাহাই প্রকৃত রূপের লক্ষণ। এই আলো-আঁধারের অদ্ভুত মেশামিশি হইতেই আমাদের সকল প্রকারের রূপানুভূতির জন্ম হয়।

এই জন্য বস্তুর উপরে কল্পনার রশান চড়াইয়াই আমরা রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এ কল্পনা সত্য, মিথ্যা নহে। বস্তুকে ধরিয়া যে কল্পনা জাগে তাহা বস্তুতন্ত্র সত্য; ইংরাজীতে তাহাকে ইমাজিনেসন (imagination) বলে; ফ্যান্সী (fancy) নহে। ফ্যান্সী হাওয়ার উপরে গড়ে, ইমাজিনেসন সত্যের বা বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলতঃ আত্মবস্তু বা দ্রষ্টা যখন অনাত্মবস্তুর বা দৃষ্টের বা দৃশ্যের উপরে আপনার রং প্রতিফলিত করে, তখনই প্রকৃত ইমাজিনেসনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অনাত্মকে আত্মার দ্বারা অভিভূত করা, যাহা দেখা যায় তার উপরে যাহা দেখা যায় না তার আভা ফুটাইয়া, দৃষ্টের মধ্যেই অদৃষ্টকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েতে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে, প্রত্যক্ষ ও সম্ভোগ করাই এই সত্যকল্পনায় বা ইমাজিনেসনের ধর্ম্ম। বস্তুর উপরে যতক্ষণ এই ইমাজিনেসনের বা কল্পনার আভা না পড়িয়াছে, অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর উপরে যতক্ষণ আত্মজ্যোতিঃ না ফুটিয়াছে, ততক্ষণ রূপের জন্ম হয় না।

রূপ-লালসা শরীরের নহে, কিন্তু আত্মারই সৃষ্টি। বস্তু ও কল্পনার অপূর্ব্ব মাখামাখি হইতেই এই রূপ-লালসার উৎপত্তি হয়। বস্তু রূপ-লালসার জননীস্বরূপ, কল্পনা তার জনক। বস্তুর মধ্যে যখন আত্মা আপনাকে অবহিত করে, তখনই এই কল্পনা জাগিয়া উঠিয়া, রূপ-লালসাকে উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্য, প্রায়ই দেখিতে পাই যে এই কল্পনার আভা নিভিয়া গেলে, রূপ-লালসাও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কল্পনা বস্তুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এক বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বস্তুকে যাইয়া ক্রমে অধিকার করে। যতক্ষণ বস্তুবিশেষের মধ্যে একটা অজ্ঞাত রাজ্য পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ কল্পনা তাহাকে পরিত্যাগও করে না। যাহা নিঃশেষ জানা হইয়া গেল, বা জানা হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিল, তাহার উপরে কল্পনার খেলার আর অবসর থাকে না। সুতরাং কল্পনা যেমন সেই আধার [illegible]

যে অজ্ঞাতের আকর্ষণ ইহাই পূর্ব্বরাগের মূলশক্তি। অজ্ঞাতের উপরেই আমাদের কল্পনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলবতী হয়। এই অজ্ঞাত একান্ত অজ্ঞাত নহে। আংশিকভাবে তাহাকে জানা হইয়াছে, পূর্ণভাবে জানা হয় নাই। দূর হইতে তার রূপ দেখা গিয়াছে, ঘনিষ্ঠভাবে, কাছে যাইয়া, তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা হয় নাই। লোকমুখে তার নামগুণ শোনা হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্য কি মিথ্যা, অতিরঞ্জিত বা অনুরঞ্জিত, ইহার পরীক্ষা হয় নাই। এই যে জানা অথচ অজানা ভাব, ইহাই কল্পনার শ্রেষ্ঠতম লীলাভূমি। এই জানা ও অজানাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্বরাগের কল্পনা নায়ক-নায়িকার অন্তরে, পরস্পরের মানসীমূর্ত্তি রচনা করিয়া, ঐ মূর্ত্তিকে তাঁহাদের ধ্যানের ও সম্ভোগের বিষয় করিয়া তোলে।

রুশিয়ার বালিকা-কবি মেরী বাস্কার্টসেফ্ (Mary Baskkertseff) মায়ের সঙ্গে নেপল্‌সে যাইয়া, প্রত্যুষে আপনার শয়ন- [illegible]

স্বরূপ বলেন — আমি যাহা দেখিলাম তাহা তো কেবল বাহিরের বস্তু নয়। যার চক্ষু আছে সেই কানুর দেহের দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি দেখিতে পারে, সেই কানুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, তার বর্ণ ও ভঙ্গী এ সকল দেখিতে পারে। ব্রজমণ্ডলে সবাই তো তাহা দেখিয়াছে, দেখিতেছে। কিন্তু আমি যাহা দেখিলাম সে তো কেবল চক্ষে দেখা যায় না। সে যে চক্ষুর অতীত বস্তু, এই জন্যই সে রূপ স্বপন-স্বরূপ। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যে স্বপ্ন দেখে সেই কেবল দেখে, অপরের তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। কানুর যে রূপ শ্রীরাধিকা দেখিলেন, আর কেউ তাহা দেখে নাই। দেখে নাই যে তার প্রমাণ, এখনও গোকুল নগরমাঝে তারা যুবতী-ধরম রক্ষা করিয়া চলিতেছে। কানুর রূপ শ্রীরাধার মানস-বস্তু — বাহিরে যাহা দশজনে দেখে তাহা সে রূপের বর্ণনার বর্ণমাত্রও প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাহিরের চাক্ষু প্রত্যক্ষ, পরিচিত দেহ গঠনকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীরাধার অন্তরে এই রসমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, [illegible]। কিন্তু তাহা এই বাহ্য, চাক্ষুষ রূপ [illegible] শতগুণে, সহস্রগুণে [illegible], অনন্তগুণে আরো উজ্জ্বল আরো মধুর। সে রূপ অনন্ত। যেমন বাসকাটিসেফ নৈশ [illegible] সাগর-বক্ষে যে রূপ দেখিয়া, তাহাকে এক [illegible] জানিবার জন্য লালায়িত হইয়া- [illegible] জানার মধ্যেই অজানা, [illegible], জড়ের মধ্যেই [illegible] মূর্ত্তের মধ্যেই [illegible], [illegible] রূপ [illegible]

অমিয়া মধুর বোল, সুধাখনি খালি গো,
হাতের উপরে লাগি পাউ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙিয়া ভাঙিয়া মুই খাউ॥

কৃষ্ণরূপ রাধার মনের বস্তু। এক দিকে এ বস্তু সত্য, আর এক দিকে কল্পিত। যেখানেই আমাদের জ্ঞানেতে সত্য ও কল্পনা এমনিভাবে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে বিশেষ রূপে মিলাইয়া মিশাইয়া দেয়, সেখানেই আমাদের চিত্তে, এই অদ্ভুত বস্তুর প্রেরণায়, যুগপৎ বিবিধ বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। এই জন্য পূর্ব্বরাগে সর্ব্বদাই এ সকল পরস্পর-বিরোধী ভাবের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। লালসা ও আশঙ্কা, বিশ্বাস ও সন্দেহ, আশা ও নিরাশা—যুগপৎ এ সকলই পূর্ব্বরাগেতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ মাধুর্য্যের কোনও অবস্থাতেই এ সকল ভাব একেবারে তিরোহিত হয় না। শান্ত, দাস্য সখ্যাদি রস-পঞ্চক সম্বন্ধে রসতত্ত্ববিদেরা যেমন বলিয়াছেন

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে;"

মাধুর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আশা ও নিরাশা, বিশ্বাস ও সন্দেহ, লালসা ও ভয়, এই সকল বিরোধী ভাব কোনও অবস্থাতেই মাধুর্য্যকে পরিত্যাগ করে না। প্রণয়ী জনের [illegible] আলিঙ্গন-পাশবদ্ধ হইয়াও, নিরাশা, সন্দেহ, ভয়াদির একান্ত নিবৃত্তি হয় না।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি,
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা,
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা।

মাধুর্য্যের [illegible] [illegible] [illegible] ফুটে [illegible]

---

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।